মাছ

ভারত—দেশ ও দেশবাসী

মাছ

মেরি চ্যান্ডি

অনুবাদ

সুব্রত বসু



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া

ISBN 81-237-1500-5

1996 (শক 1918)

মূল্য : 43.00 টাকা
Fishes *(Bangla)*
নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি 110 016 কর্তৃক প্রকাশিত

ভূমিকা

'ভারত—দেশ ও দেশবাসী' নামে যে সিরিজটি সাধারণ শিক্ষিত মানুষকে দেশের নানা দিক সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে শুরু করা হয়েছিল, সেই সিরিজেরই অন্তর্গত এই বই। ভারতে অবিশেষজ্ঞের জন্য এ জাতীয় বইয়ের অভাব আছে, আমি সে অভাব কিছুটা পূরণের চেষ্টা করেছি।

মাছের বিষয়টি জীবতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক। তাকে জনপ্রিয় সরল অথচ তথ্যনিষ্ঠ করাই আমার লক্ষ্য। বিষয়টি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়েছি বলে এ লক্ষ্য অর্জন আমার পক্ষে খানিকটা সহজ হয়েছে। আশা করছি, সাধারণ পাঠকের কাছে বইটি বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল পরিভাষায় খুব বেশি ভারাক্রান্ত বলে মনে হবে না।

বইয়ের দুটি ভাগ। প্রথম ভাগের বিষয় মাছ, প্রাণিজগতে তার স্থান, অতীতে তার উদ্ভব ও ইতিহাস এবং জলচর জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য তার নিজস্ব গঠনগত বৈশিষ্ট্য। সন্তান প্রতিপালন ও প্রব্রজনের মতো তার কিছু স্বভাবও এতে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগ সাগর-নদীর গুরুত্বপূর্ণ মাছ ও আমাদের মৎস্যশিল্পের সমীক্ষা। মাছ থেকে মানুষের খাবার ও নানা উপকারী জিনিস পাওয়া যায়, তাই অর্থনৈতিক বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ।

বইটি মূল ইংরেজিতে প্রকাশিত হওয়ার পর ইতিমধ্যে তার পাঁচটি পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। অন্যদিকে এই সময়ে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারে সংযোজিত হয়েছে মাছ সম্বন্ধে নতুন নতুন আবিষ্কার ও নতুন নতুন তথ্য। ভারতের মৎস্যশিল্প বিকশিত হয়েছে দ্রুতগতিতে। বইয়ের বিষয়বস্তুর পরিমার্জন তাই অবশ্যপ্রয়োজনীয়। বিষ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, হাঙরের বিপদ ও তার প্রতিকার ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণালব্ধ সাম্প্রতিক ফলাফলগুলি আমি এতে সন্নিবিষ্ট করার চেষ্টা করেছি।

ভারতের মৎস্যশিল্পের বিকাশ একটি চমকপ্রদ কীর্তি, যার ব্যাপ্তি সারা উপমহাদেশ জুড়ে। মিঠে-জলের মৎস্যশিল্পে পুকুরের মাছচাষ সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করে ব্যবসায়িক সাফল্যে উপনীত হয়েছে; যন্ত্রচালিত নৌকো, আধুনিক ট্রলার ও উপকরণ প্রবর্তিত হওয়ার ফলে সামুদ্রিক মৎস্যশিল্প বিকশিত হয়ে বিদেশি জাতিগুলির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে এবং অর্জন করছে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা। আমাদের সামুদ্রিক মৎস্যশিল্পের বৃদ্ধি ও প্রসারের জটিল দিকগুলি তুলে ধরার জন্য যোগ করা হল 'আজকের মৎস্যশিল্প' নামে একটি নতুন অধ্যায়।

মেরি চ্যান্ডি

মিরান্ডা হাউস, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় — অধ্যক্ষ (অবসরপ্রাপ্ত)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর কাছে আমি মাছ, নৌকো ও সরঞ্জামের কিছু মূল ছবি ধার পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ। কিছু মাছের রঙিন ছবি তুলতে অনুমতি দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ তারাপোরভালা অ্যাকোয়ারিয়ামের কাছে।

তা ছাড়া, জুওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার এমেরিটাস প্রফেসর ডঃ এ জি কে মেনন ও তাঁর সহকর্মীরা মিঠে-জলের মৎস্যশিল্পে সাম্প্রতিক অগ্রগতির বিষয়ে অবহিত করেছেন এবং মাছের শ্রেণীবিভাগে কিছু সংশোধন করেছেন; এই সাহায্যের জন্য তাঁদের কাছেও আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। সেন্ট্রাল মেরিন ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর কিছু মূল্যবান গবেষণাপত্রের জন্য আমি কৃতজ্ঞ সংস্থার পরিচালক ডঃ পি এস বি জেমস-এর কাছে। ভারতের মৎস্যশিল্পের পর্যালোচনা ও সে বিষয়ে সাম্প্রতিকতম পরিসংখ্যানের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ রইল মেরিন প্রডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি-র প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডঃ পি ইউ ভার্গিজ-এর প্রতি।

মেরি চ্যান্ডি

সূচীপত্র

এক

কথারম্ভ ও শ্রেণীবিভাগ

মাছকে নানা জনে নানাভাবে দেখে। অনেকেই বোধ হয় তাকে সবচেয়ে ভাল চেনে খাবার হিসাবে। যারা মাছ ধরে তাদের কাছে তা জীবিকার উপায়। অল্প কিছু লোকের কাছে মাছ ধরা একটা শখ বা নেশা। মাছ কাকে বলে, কীভাবে তার সৃষ্টি হল, তা একটু খতিয়ে বোঝা দরকার।

মাছেরা জলের বাসিন্দা। বাইবেলের কাহিনীতে আমরা পড়ি, ঈশ্বর স্থল আর জল আলাদা করলেন এবং এইভাবে যে সব সমুদ্র তৈরি হল সেগুলো তিনি ভরিয়ে দিলেন নানা ধরনের জীবে। এতে বোধ হয় অবাক হওয়ার কিছু নেই যে ভিন্ন জাতীয় বেশ কিছু প্রাণীর উপরেই মাছ নামটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা যে জেলিফিশ, চিংড়িমাছ, তারামাছ ইত্যাদির কথা শুনি, প্রাণিতত্ত্ববিদের কাছে সেগুলো মোটেও মাছ নয়— যদিও মাছেদের সঙ্গেই তাদের সহাবস্থান—নদীতে, হ্রদে, সমুদ্রে।

সত্যিকারের মাছ হল লাল রক্ত-বিশিষ্ট মেরুদণ্ডী প্রাণী, যে তার সারাটা জীবন জলে কাটায়। শরীর তার সাধারণত আঁশে ঢাকা। শ্বাস নেয় ফুলকো দিয়ে। চলাফেরা করে শরীর আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে, তাতে সাহায্য করে তার পাখনা—সেগুলো তার ভারসাম্য রক্ষার অঙ্গ।

শ্রেণীবিভাগ

দেহসংস্থানের জটিলতার ক্রম অনুসারে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে পাঁচটি পৃথক শ্রেণী—মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি আর স্তন্যপায়ী। অর্থাৎ কিনা মাছ হল কর্ডাটা পর্বের (phylum Chordata) অন্তর্গত মেরুদণ্ডী উপ-পর্বের নিম্নতম শ্রেণী, যার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য :

(ক) পিঠের দিকে চাকতির মতো এক সারি হাড় দিয়ে তৈরি একটা দণ্ড, কিংবা তার আদিরূপ নোটোকর্ড (notochord)।

(খ) পিঠের দিকে নলাকার স্নায়ুগুচ্ছ, যার শেষে জটিল এক মস্তিষ্ক।

(গ) জীবনের কোনও-না-কোনও সময় মুখগহ্বরে থাকে ফুলকোর ছিদ্রপথ—যেগুলো কেবল মাছ ও উভচর শূককীটের মতো জলচর মেরুদণ্ডীদের মধ্যেই খোলা আর চালু থাকে।

মাছ যে কর্ডাটা পর্বের অংশ তার সাদামাটা শ্রেণীবিভাগ এই রকম :

উপপর্ব ১ : প্রাক্-মেরুদণ্ডী বা আদি-কর্ডাটা (Protochordata)

শ্রেণী 1—হেমিকর্ডা (Hemichorda)

শ্রেণী 2—ইউরোকর্ডা (Urochorda)

শ্রেণী 3—সেফালোকর্ডা (Cephalochorda)

উপপর্ব ২ : মেরুদণ্ডী (Vertebrata)

শ্রেণী 1—মাছ, সাইক্লোস্টোমাটা (Cyclostomata) সহ
শ্রেণী 2— উভচর
শ্রেণী 3—সরীসৃপ
শ্রেণী 4—পাখি
শ্রেণী 5— স্তন্যপায়ী

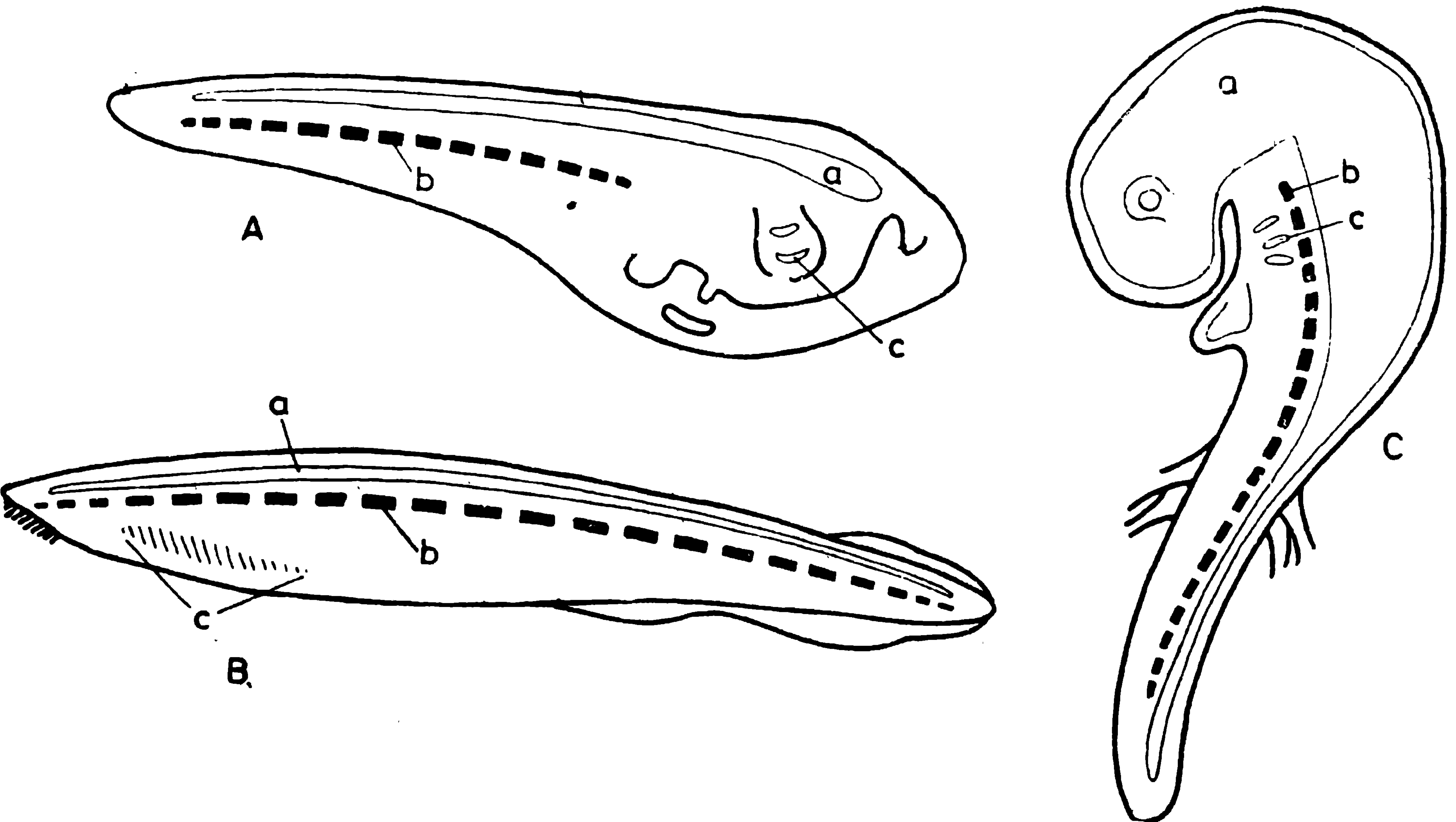
প্রাক্-মেরুদণ্ডীরা অতি আদিম এক গোষ্ঠী। এই প্রাণীরা মেরুদণ্ডীদের সব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়, তবু উপরে উল্লিখিত মূল তিনটি বৈশিষ্ট্য তাদের আছে বলে তাদের কর্ডেট (chordate) বলা হয়ে থাকে। মেরুদণ্ডী ও বিপুল সংখ্যক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যেকার যোগসূত্র এরা। এদের তাই ধরা হয় প্রান্তিক বা আদি কর্ডেট বলে, যাদের তিনটি পৃথক শ্রেণী: (i) কৃমি জাতীয় গর্ত-খোড়া প্রাণী, ওক কীট (acorn worm), ব্যালানোগ্লোসাস (Balanoglossus) ও তাদের আত্মীয়রা (হেমিকর্ডা); (ii) টিউনিকেট (tunicate) বা অ্যাস্কিডিয়ান (ascidian), চলতি কথায় সামুদ্রিক স্কুয়র্ট (ইউরোকর্ডা); এবং (iii) থুরকিনা (lancelet) বা অ্যামফিওক্সাস (সেফালোকর্ডা)।

মেরুদণ্ডী উপপর্বে উপর থেকে নীচের দিকে নামলে পাওয়া যায় যথাক্রমে স্তন্যপায়ী, পাখি, সরীসৃপ, উভচর (ব্যাং) এবং মাছ—এই পাঁচটি শ্রেণী।

অন্য মেরুদণ্ডীদের সঙ্গে মাছের তফাত কোথায়? আগেই সংক্ষেপে বলা হয়েছে, মাছ হল সম্পূর্ণ জলচর, ঠাণ্ডা রক্তের জীব, যা ফুলকোর সাহায্যে জলে-গোলা অক্সিজেন দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস চালায়। ওদের ফুসফুস নেই। পাখনা আছে, সেগুলো ওদের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং জলের মধ্য দিয়ে শরীরটাকে ঠিকমতো চালিয়ে নিতে সাহায্য করে। আঁশের রক্ষাকারী আবরণে চামড়া ঢাকা, তার উপর প্রচুর পিচ্ছিল পদার্থের আস্তরণ। মাথায় গন্ধ, দৃষ্টি ও শ্রবণের ইন্দ্রিয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়টা শুধু গন্ধেরই জন্য, তার সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নেই। চোখে পাতা নেই; কান খুলির হাড়ের তলায় লুকোনো, তার বাহ্যিক বা মধ্যবর্তী কোনও অংশ নেই। মাথায় এবং দেহের দু পাশে ছড়ানো থাকে বিশেষ ধরনের ইন্দ্রিয়, যেগুলো দিয়ে প্রাণীটি জলের স্রোত, তাপ ও চাপ এবং সম্ভবত তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গেরও হদিশ রাখতে পারে। অধিকাংশ মাছ ডিম পাড়ে, তা থেকে শূককীট বেরোয়; কোনও কোনও মাছ সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে, সেগুলো কিছুদিন মায়ের জরায়ুতে বিকাশ লাভ করে।

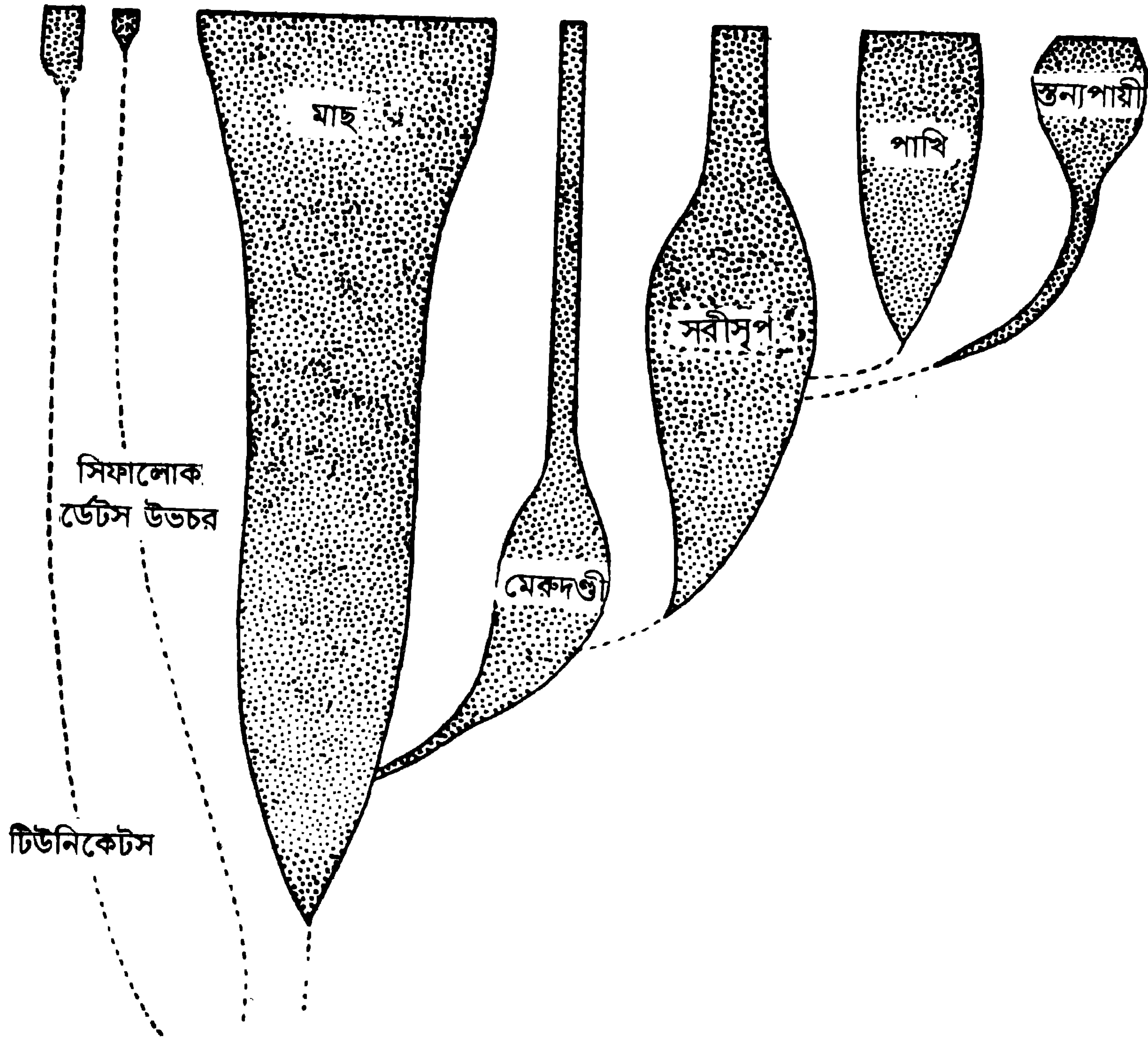
আজকের দুনিয়ার মাছেদের মোটামুটিভাবে তিনটি বড় উপশ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (ক) গোলমুখো (Cyclostome), (খ) কোমলাস্থিবিশিষ্ট (Cartilaginous) এবং (গ) অস্থিবিশিষ্ট।

বানমাছের মতো দেখতে ল্যামপ্রি (lamprey) আর হ্যাগফিশরা (hagfish) গোলমুখোদের দলভুক্ত, এরা খুব পুরোনো ও বিশিষ্ট একটি গোষ্ঠীর অবশেষ। মৎস্যকুলের সুবর্ণযুগে অর্থাৎ ডেভোনিয়ান (Devonian) নামক সুপ্রাচীন ভূতাত্ত্বিক স্তরে এদের উদ্ভব। এদের বৈশিষ্ট্য হল বাটির মতো মুখ, যা থেকে এদের 'গোলমুখো' নাম এসেছে; এদের বিলুপ্ত পূর্বপুরুষ বর্মধারী মাছেদের (Ostracoderm) মতোই এদেরও মুখে সত্যিকারের কোনও চোয়াল নেই।



চিত্র 1 : কর্ডেটদের তিন প্রতিনিধি। A—টিউনিকেট শূককীট ; B—থবকিনা ; C—মুরগির ভ্রূণ (ল্যানহ্যামের অনুসরণে)।
a—পিঠের স্নায়ুগুচ্ছ ; b—নোটোকর্ড ; c—ফুলকোর ছিদ্রপথ।

ভূতাত্ত্বিক যুগ
সিনোজোইক
ক্রেটাসিয়াস
জুরাসিক
ট্রায়াসিক
পারমিয়ান
কার্বোনিফেরাস
ডিভোনিয়ান
সিলুরিয়ান
অরডোভিসিয়ান



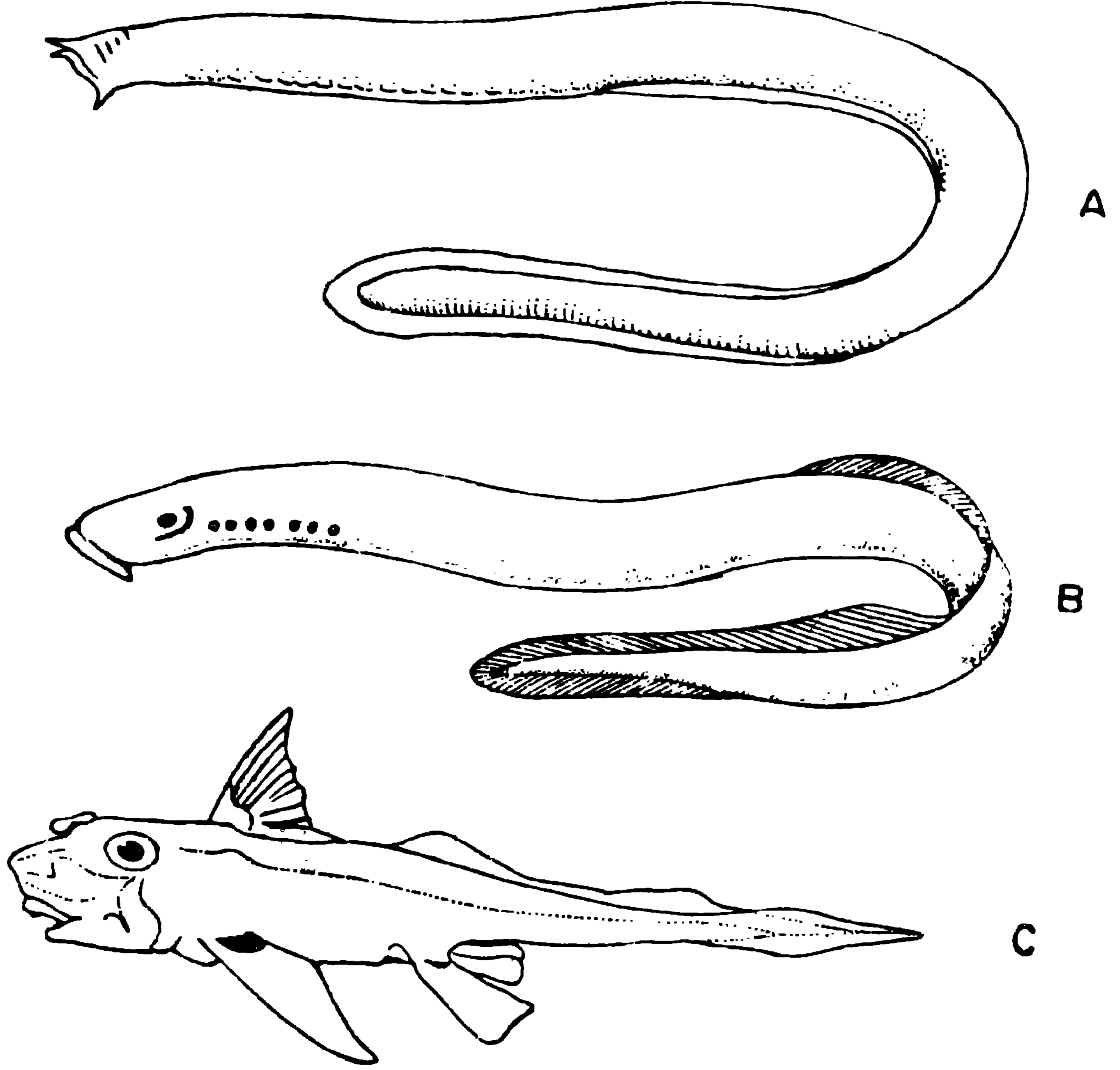
চিত্র 2 : পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্ডেটদের বিভিন্ন শ্রেণী।

ল্যামপ্রিরা এই মুখের সাহায্যে অন্য মাছের শরীরে আটকে থেকে তার রক্ত চুষে খায়। গোলমুখোদের 7 থেকে 14 জোড়া ফুলকো ; অন্যান্য মাছের ফুলকো থেকে সেগুলো খানিকটা আলাদা ধরনের—পেশির তলায় লুকোনো, এক সারি ছিদ্রপথ মারফত গলনালির সঙ্গে যুক্ত।

ল্যামপ্রিরা সমুদ্রের অধিবাসী ; উত্তর আমেরিকা, জাপান ও ইউরোপের উপকূল ধরে তারা ছড়িয়ে আছে। সবচেয়ে পরিচিত জাতটি হল সামুদ্রিক ল্যামপ্রি, পেট্রোমাইজোন (Petromyzon)। এরা সমুদ্র ছেড়ে নদীর উজান বেয়ে এসে তলদেশের বালিতে ডিম পাড়ে। নুড়িপাথর সরিয়ে বাপ-মা একটা বাসা-মতো তৈরি করে। ডিম থেকে যে শূককীট বেরোয় তা অনেক দিক দিয়েই বয়স্ক মাছের থেকে আলাদা। অ্যামোসিট (Ammocoete) নামের এই শূককীট হল চাকুর মতো আকৃতিবিশিষ্ট এক অন্ধ জীব, তার মুখের চারপাশে ঘোমটা। তিন-চার বছর তা নদীতে থাকে এবং এই সময়ের মধ্যে আকারে বাড়লেও যৌন পরিণতি লাভ করে না। শূককীট পর্যায়ের শেষে হঠাৎ তার অবয়ব ও গড়নে আসে বিপুল পরিবর্তন, সে তৈরি হয় তার পিতামাতার বাসস্থান সমুদ্রে দিয়ে যাওয়ার জন্য। অ্যামোসিট এবার পরিণত হয় তরুণ পেট্রোমাইজোনে, সে সামুদ্রিক জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় এবং মুখ দিয়ে অন্য সামুদ্রিক মাছের রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকে। জননেন্দ্রিয় বিকশিত হয় এবং কয়েক বছরের মধ্যেই পূর্ণবয়স্ক পেট্রোমাইজোন রওনা হয় মিঠে-জলের দিকে তার বিপদসঙ্কুল যাত্রায়। ডিম পাড়ার জন্য বয়স্ক মাছের এই উজানী প্রব্রজনকে বলে অ্যানাড্রোমাস (anadromous) প্রব্রজন, সামুদ্রিক ল্যামপ্রির জীবনচক্র এই রকম প্রব্রজনের বেশ ভাল দৃষ্টান্ত।

ল্যামপ্রির চোষণকারী মুখ একটা চওড়া বাটির মতো, তার গোল কানা ঘিরে রয়েছে একটা বেড়। চোয়াল নেই, তবে বাটির ভিতর দিকের দেওয়াল জুড়ে শিংজাতীয় পদার্থে তৈরি হলদে-হলদে দাঁত। পুরো বন্দোবস্তটাই একটা চমৎকার চোষণযন্ত্রের মতো, যা দিয়ে অন্য মাছের গায়ে লেগে থেকে তাদের রক্ত খেয়ে ল্যামপ্রি বেঁচে থাকতে পারে। এর একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল একটি মাত্র নাসারন্ধ্র, যা দিয়ে জল ঢোকে বা বেরোয়। প্রাণিতত্ত্ববিদদের বিশ্বাস, এটা হল জলের গুণাগুণ পরীক্ষার যন্ত্র, আর মুখ হল তলদেশ আঁকড়ে থাকার উপায়। দেহের দু পাশে, চোখের পিছনে, প্রত্যেক দিকে সাতটি করে গোলাকার ফুলকো-রন্ধ্র। চামড়া কিন্তু বর্মধারী পূর্বপুরুষদের থেকে আলাদা, আঁশ-বিহীন। ভিতরের কঙ্কালের আছে একটা বিশিষ্ট গড়নের খুলি আর ঝুড়ির মতো এক ফুলকো-কাঠামো। জোড়ায়-জোড়ায় পাখনা নেই। মধ্যক (median) পাখনা দুটো পিঠে, একটা ল্যাজে, একটা পায়ুতে। বেশ কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে, গোলমুখোরা সত্যিকারের মাছ কি না।

ল্যামপ্রিদের আত্মীয় হল মিকসিন (Myxine) ও অন্যান্য গণ (genera)-ভুক্ত হ্যাগফিশরা, যাদের সাধারণত দেখা যায় গভীর সমুদ্রে। প্রজননের জন্য এরা কখনও মিঠে-জলে পাড়ি দেয় না। ওদের পাড়া ডিমগুলো সামুদ্রিক আগাছার গায়ে লেগে থাকে, সেগুলো থেকে বাচ্চা বেরোয় বাপ-মার মতোই দেখতে। হ্যাগফিশের মুখ গোল, চোয়ালবিহীন, তবে চারপাশে সূক্ষ্ম তন্তুর বেষ্টনী। মুখের নীচের প্রান্ত-বরাবর শিংজাতীয় পদার্থের দাঁত। ওরা বাঁচে মরা মাছ খেয়ে—মাংস কুরে কুরে খেয়ে বাদ রাখে শুধু শক্ত কঙ্কাল আর বাইরের চামড়াটা।



চিত্র 3: A—মিকসিন (হ্যাগফিশ, গভীর সমুদ্রের মাছ)
B—পেট্রোমাইজোন (সামুদ্রিক ল্যামপ্রি, বানমাছের মতো দেখতে)
C—কিমেরা (রুপোলি হাঙর)

কোমলাস্থি-বিশিষ্ট মাছেদের (Chondrichthyes) দলে পড়ে হাঙর ও তার আত্মীয়রা। এদের শরীরে হাড় নেই, আজীবন এদের কঙ্কাল থাকে কোমলাস্থিময়। হাঙর আর রে (ray) জাতীয় মাছ এই গোষ্ঠীভুক্ত, মাছেদের অন্যান্য প্রধান শ্রেণীর সঙ্গে এদেরও উদ্ভব হয়েছিল ডেভোনিয়ান পর্যায়ে। তা ছাড়া আজব রুপোলি হাঙর বা Chimaera-ও এই শ্রেণীতে পড়ে। সত্যিকারের হাঙরদের থেকে এদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে, তাই তাদের

হোলোসেফালি (Holocephali) নামে আলাদা একটি উপশ্রেণীতে ফেলা হয়েছে। শিশুপ্রসূ (viviparous) হাঙরদের ডিম ডিম্বনালিতে নিষিক্ত হয় এবং ভ্রূণ জরায়ুতে বিকাশ লাভ করে। একসঙ্গে কয়েকটি ভ্রূণও বিকশিত হতে পারে। প্রতিটি ভ্রূণ তার কুসুমস্থলীর সাহায্যে জরায়ুর দেওয়ালে লেগে থাকে। এই কুসুমস্থলীর মধ্যে থাকে ভ্রূণের খাবার। কুসুমস্থলীটি ভ্রূণের পেট থেকে বেরিয়ে জরায়ুর ভিতরের দেওয়ালের গায়ে লেগে একটি অপরিণত ফুল (placenta) গঠন করে— যে ফুল অবশ্য সবচেয়ে বিকশিত আকারে দেখা যায় স্তন্যপায়ীদের মধ্যে। পূর্ণ-বিকশিত শিশু-হাঙররা দেখতে সব দিক দিয়ে বাপ-মায়ের মতোই হয়ে দাঁড়ায় এবং অবসারণী (cloaca) দিয়ে বেরিয়ে আসে। শ্রেণীটি প্রধানত সামুদ্রিক, তবে কোনও কোনও জাত অ্যামাজন, গঙ্গা আর টাইগ্রিসের মতো বিশাল বিশাল নদীর মোহনায় বাস করে এবং জোয়ারের সীমা পর্যন্ত উজিয়ে আসে।

উপরে যা যা বলা হয়েছে তা ছাড়াও কোমলাস্থি-বিশিষ্ট মাছেদের শরীরে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এদের গা আণুবীক্ষণিক দাঁতের মতো আঁশে ঢাকা। ফুলকোর ছিদ্রপথ সরাসরি বাইরের দিকে খোলা, কানকোয় ঢাকা নয়। বেশিরভাগই মাংসাশী, হিংস্র এবং বড় বড় ধারাল দাঁতে সজ্জিত। সাধারণত শিশুপ্রসূ, তবে কেউ কেউ ডিমও পাড়ে।

ভারতের আশেপাশের সমুদ্রের একটি সুপরিচিত হাঙর হল স্কলিওডন (Scoliodon), যা জীববিজ্ঞানের সব ছাত্রেরই চেনা। এরা আকারে ছোট, একে পাওয়া যায় সহজে, তাই পরীক্ষাগারের পক্ষে তা খুব সুবিধাজনক। বেশিরভাগ হাঙরের মতো এরও দেহ মূলকাকার (fusiform) ও দু পাশে চাপা, মাথা বড়। ফুলকোর ছিদ্রপথ পাঁচটি, কোনও কোনও আদিম ধরনের হাঙরের ছটি বা সাতটিও হতে পারে। বড় বড় চোখ মাথার উপরের দিকে, দু পাশে (dorso-lateral)। কোনও কোনও হাঙর আর ডগফিশের চোখের পিছন থেকে একটি ছিদ্রপথ গলবিল (pharynx) পর্যন্ত চলে গেছে। মুখ মাথার তলার দিকে, তুণ্ড (snout)-র আগা থেকে খানিকটা পিছনে। মুখের সামনের দিকের দুই কোণে দুটি নাসাপথ। মধ্যক (median) এবং জোড়-বাঁধা (paired) পাখনাগুলি ভাল রকম বিকশিত। লেজের পাখনার পর্বগুলি অসমান। পুরুষ মাছের শ্রোণীয় (pelvic) পাখনাগুলোর সঙ্গে যে খাত-কাটা এক জোড়া উপাঙ্গ থাকে সেগুলোই তার সঙ্গম-যন্ত্র। শ্রোণীয় পাখনাগুলোর গোড়ার মাঝখানে এক বড় অবসারণিক (cloacal) ছিদ্র—অর্থাৎ অন্ত্র, বৃক্ক-থেকে-আসা মূত্রনালি ও জননিনালির মিলিত নির্গমপথ।

হাঙররা হল বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় মাছ, পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলগুলিতে তাদের অনেক দেখা যায়। ভারতের চারপাশের সাগরগুলিতে হাঙর প্রচুর, পরবর্তী একটি অধ্যায়ে তাদের নাম ও বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

'রে' (ray) জাতীয় মাছেদের দেহের আকৃতি ও দেহসংস্থান হাঙরের থেকে আলাদা। উদাহরণ হিসাবে হুলওয়ালা শঙ্কর (Dasyatis) মাছের কথা ধরা যেতে পারে। তার শরীরটা গোল বা চৌকো। বুকের পাখনাগুলো বেড়ে সামনে-পিছনে প্রসারিত হয়েছে এবং মাথার সঙ্গে জুড়ে গিয়ে একটা চাকতির আকার নিয়েছে, যা চাবুকের মতো লেজটি থেকে আলাদা। পিঠের মধ্যবর্তী পাখনাগুলো লেজ পর্যন্ত চলে গেছে, সেগুলো ছোট হতে পারে, এমনকি

লুপ্তও হয়ে যেতে পারে। ফুলকোর ছিদ্রপথ শরীরের নীচের দিকে। স্বভাবে রে জাতীয় মাছ তলদেশচারী, চিংড়ি শামুক ইত্যাদি ছোটখাট প্রাণীদের খেয়ে বাঁচে। মুখ ছোট, দেহের তলার দিকে। চোয়ালে আণুবীক্ষণিক দাঁত ফুটপাতের টালির মতো সাজানো। এদের অধিকাংশই হাঙরের মতো শিশুপ্রসূ, তবে কেউ কেউ শিংজাতীয় পদার্থের বিশেষভাবে তৈরি থলেতে ডিম পাড়ে। হুলওয়ালা শঙ্কর মাছ যে হুলের জন্য বিখ্যাত তা হল 1-2 ইঞ্চি লম্বা খাঁজকাটা এক টুকরো হাড়, তার দু পাশের নালিতে বিষের গ্রন্থি সাজানো। পায়ে চাপা পড়লে মাছ তা-ই দিয়ে মারে সাংঘাতিক ঘাই, যাতে কখনও-কখনও মৃত্যুও হতে পারে।

অদ্ভুত চেহারার জন্য রুপোলি হাঙরকে চলতি কথায় রাজা হেরিং বা ভুতুড়ে মাছও (spookfish) বলে। ইউরোপ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল, উত্তমাশা অন্তরীপ ও ভারত মহাসাগরে এদের পাওয়া যায়। শরীরটা হাঙরের মতোই, তবে তার বিশাল আঁটো মাথা আর ছোট মুখ হাঙরের বেলচাকৃতি চাপা মাথা আর চওড়া মুখের থেকে একেবারেই আলাদা। মুখের চারপাশে ঠোঁটের মতো ভাঁজ। ফুলকো থেকে বাইরের দিকে একটাই ছিদ্রপথ, তার কারণ অনেকটা অস্থিবিশিষ্ট মাছের মতোই এদের ক্ষেত্রেও একটা চামড়ার ভাঁজ বা কানকো হাইঅয়ড আর্চ (hyoid arch) থেকে পিছন দিকে প্রসারিত হয়ে ফুলকোর আসল ছিদ্রপথগুলো ঢেকে রেখেছে। বায়ুরন্ধ্র বা স্পাইর‍্যাকল (Spiracle) নেই। পায়ু এবং মূত্রজননালি আলাদা, অর্থাৎ অবসারণীও নেই।

পিঠের দিকে দুটো পাখনা ; তলার দিকে একটা, ছোট। লেজটা এক লম্বা চাবুকের মতো বাড়ানো। বুক ও শ্রোণীয় পাখনাগুলো বড়। পুরুষ মাছে শ্রোণীয় পাখনাগুলোর সঙ্গেই থাকে আঁকড়ে ধরার অঙ্গ। এমন একটা অঙ্গ মাথাতেও থাকে, যার উদ্দেশ্য এখনও বোঝা যায়নি। দাঁতগুলো অদ্ভুত—শক্ত, ধারাল কিনারাওয়ালা এবড়ো-খেবড়ো ফলকের মতো।

প্রশান্ত মহাসাগরের রুপোলি হাঙরের প্রজনন ও বিকাশ নিয়ে গবেষণা করেছেন বিখ্যাত মার্কিন প্রাণিতত্ত্ববিদ ব্যাশফোর্ড ডিন। এই হাঙরগুলো সারা বছর জুড়ে ডিম পাড়ে। ডিমগুলো জরায়ুতে নিষিক্ত হয় এবং বড়, ভারী বাদামি থলের মধ্যে করে বাইরে বেরিয়ে আসে। প্রতিটি থলে জরায়ুর ভিতরের দেওয়ালে লেগে থাকে—দেখতে ব্যাঙাচির মতো, তুণ্ড (snout) ধড় এবং খাপসমেত লেজও আছে। থলেগুলোকে প্রায়ই জরায়ুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে থাকতে দেখা যায়। পাড়ার পর সেগুলো পাথর বা সামুদ্রিক আগাছার গায়ে লেগে যায়। তারই মধ্যে ভ্রূণের বিকাশ ঘটে 9–12 মাস ধরে।

অস্থিবিশিষ্ট মাছ (Osteichthyes) বলে তাদেরই যাদের কঙ্কালের প্রধান উপাদান হাড়, কোমলাস্থিময় মাছ আর গোলমুখো মাছের মতো কোমলাস্থি নয়। এরা অনেক দিক দিয়েই একটি উন্নততর গোষ্ঠী এবং এদের তিনটি প্রধান জাত— গুলি-পাখনা (Crossopterygia), ফুসফুস মাছ (Dipnoi) এবং আধুনিক পূর্ণাস্থি (Teleostei) মাছ।

কিছুদিন আগে অবধিও গুলি-পাখনাদের একটি বিলুপ্ত গোষ্ঠী বলে ভাবা হত। 1938 সালে পূর্ব আফ্রিকার কাছে মোজাম্বিক উপসাগরে সিলাকান্থ (coelacanth, *Latimeria chalumnae)* জাতের একটি অদ্ভুত মাছ আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে গুলি-পাখনা সংক্রান্ত গবেষণায় নতুন পথ খুলে গেছে। সুপ্রাচীন ও অতীব আগ্রহজনক একটি গোষ্ঠীর একমাত্র

জীবিত বংশধর হওয়ায় এই মাছের শরীর তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করেছেন বড় বড় বিজ্ঞানীরা। স্বাভাবিক অবস্থায় তার বাস ও প্রজননপ্রণালী পর্যবেক্ষণেরও চেষ্টা হয়েছে।

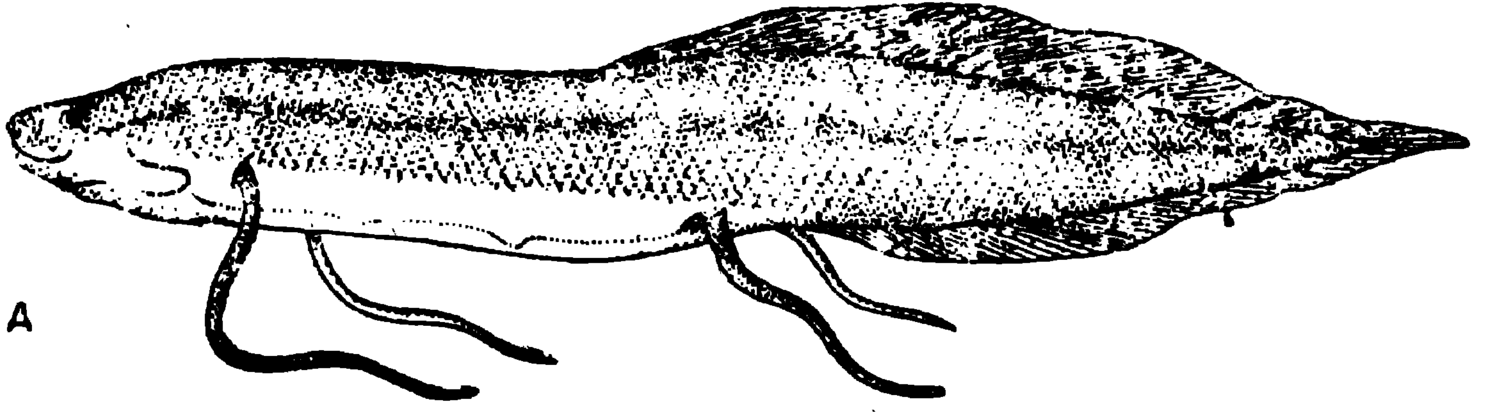
গুলি-পাখনা মাছেদের বৈশিষ্ট্য হল তাদের বুক আর শ্রোণীয় পাখনার গোড়ায় বড়সড় মাংসপেশির গুলি, যা থেকে ওদের এই নাম হয়েছে। ওদের লেজের পাখনাও বিশেষ ধরনের। তিনটি পর্ব তার। এরা ডেভোনিয়ান পর্যায়ের জলাভূমিতে বাস করত এবং এদের দেহে ফুসফুসের অনুরূপ শ্বাসযন্ত্র দেখা দিয়েছিল বলে বিশ্বাস। রিপিডিস্টিয়ান (rhipidistian) নামক সবচেয়ে আদিম গুলি-পাখনা মাছের দাঁত বৈশিষ্ট্যময়, এনামেল (enamel) কুঁচকে তৈরি হয়েছে জটিল সব নকশা। আশ্চর্যের বিষয়, ল্যাবিরিন্থোডোন্ট (Labyrinthodont) নামক প্রথম উভচররাও এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের কারণে গুলি-পাখনাদের ভাবা হয়েছে উভচরদের সম্ভাব্য পূর্বপুরুষ বলে। এই মতের আরও সমর্থন মেলে জোড়-ধরা পাখনাগুলির প্রকৃতি ও গড়নে—সেগুলো ডাঙার মেরুদণ্ডীদের হাত-পায়ের পূর্বাভাস—এবং গুলি-পাখনাদের দেহে ফুসফুসের উপস্থিতিতে।

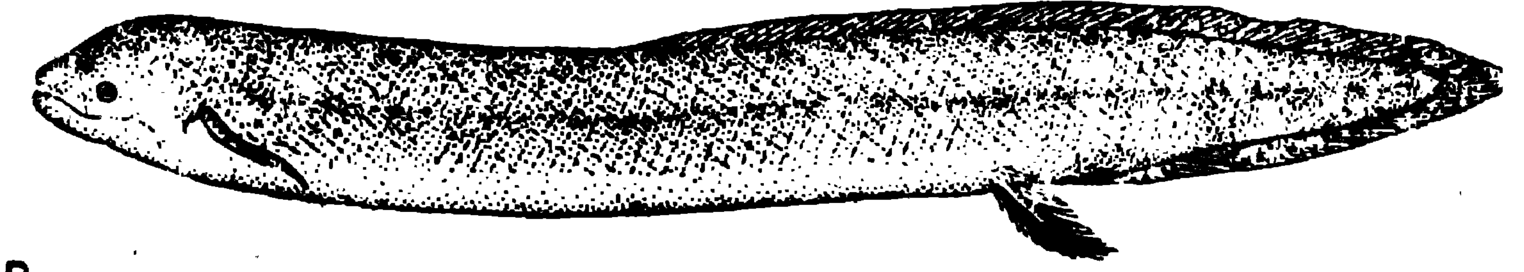
সিলকান্থরা হল গুলি-পাখনাদের আরেকটি উপবিভাগ, ল্যাটিমেরিয়া (Latimeria) যার অন্তর্ভুক্ত। ডেভোনিয়ান পর্যায়ে তাদের সংখ্যা ছিল সুপ্রচুর, এবং তারা ছিল মিঠে-জলের অধিবাসী। এদের একটা গোষ্ঠী নদী-নালা ছেড়ে সমুদ্রে নেমে গেল। অক্সিজেন-সমৃদ্ধ সমুদ্রের জলে ফুসফুস অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ায় তা ছোট হতে হতে অস্থীভূত (calcified) হয়ে গেল। সিলাকান্থ ও রিপিডিস্টিয়ানদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে ল্যাটিমেরিয়া আবিষ্কারে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, আশা জেগেছিল যে তা থেকে ডাঙার মেরুদণ্ডীদের, এমনকি হয় তো মানুষের, উদ্ভবের কোনও সূত্র পাওয়া যাবে। তবে বিশেষজ্ঞের চোখে তা নেহাতই অদ্ভুত এক মাছ, ডাঙার প্রথম মেরুদণ্ডীদেরও বংশধারায় সরাসরি পড়ে না। অবশ্য তার দেহসংস্থান খুবই খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে এবং তাতে ধরা পড়েছে পুরনো বিলুপ্ত স্থল-মেরুদণ্ডীদের সঙ্গে তার হৃৎপিণ্ড আর মস্তিষ্কের মিল। 1939-এর পর থেকে জীবতত্ত্ববিদেরা বেশ চেষ্টা করেছেন আরও ল্যাটিমেরিয়া মাছ ধরতে এবং তাদের চালচলন পর্যবেক্ষণ করতে। মাছটি ফুট-পাঁচেক লম্বা, ওজন প্রায় 127 পাউন্ড।

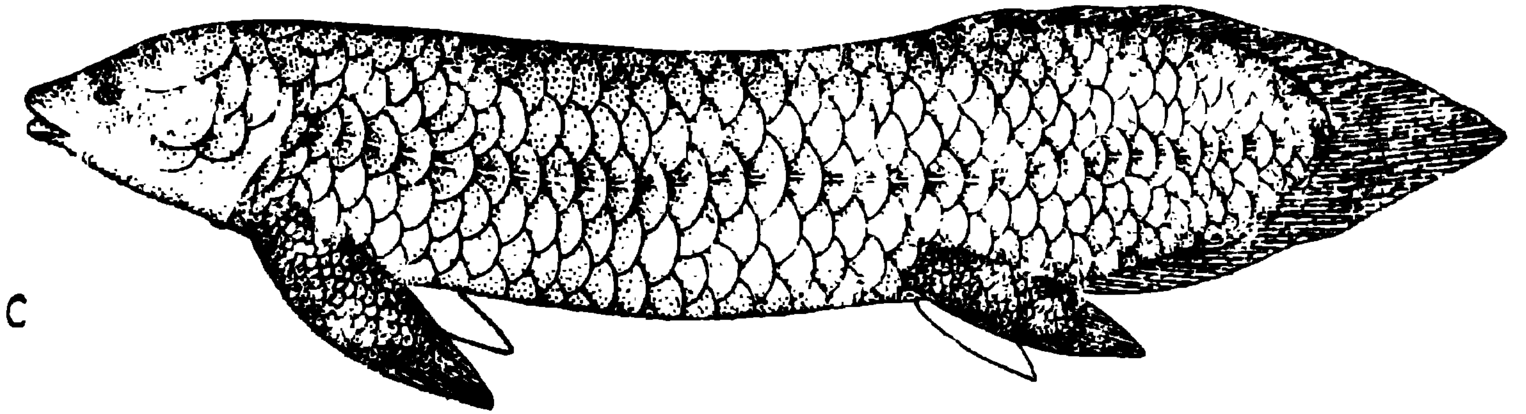
ফুসফুস মাছ (Dipnoi) নামক আরেকটি কৌতূহলজনক গোষ্ঠী গুলি-পাখনাদের আত্মীয়। মাছেরা সাধারণত ফুলকো দিয়ে জলে-গোলা অক্সিজেন টেনে শ্বাসপ্রশ্বাস চালায় ; কিন্তু ফুসফুস মাছেদের মতো কারও কারও দেহে ফুসফুস জাতীয় প্রত্যঙ্গ গড়ে উঠেছে, যার সাহায্যে তারা বায়ুমণ্ডল থেকেই অক্সিজেন টানতে পারে। ফুসফুস মাছ বর্তমানে দেখা যায় অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার কোনও কোনও অঞ্চলে।

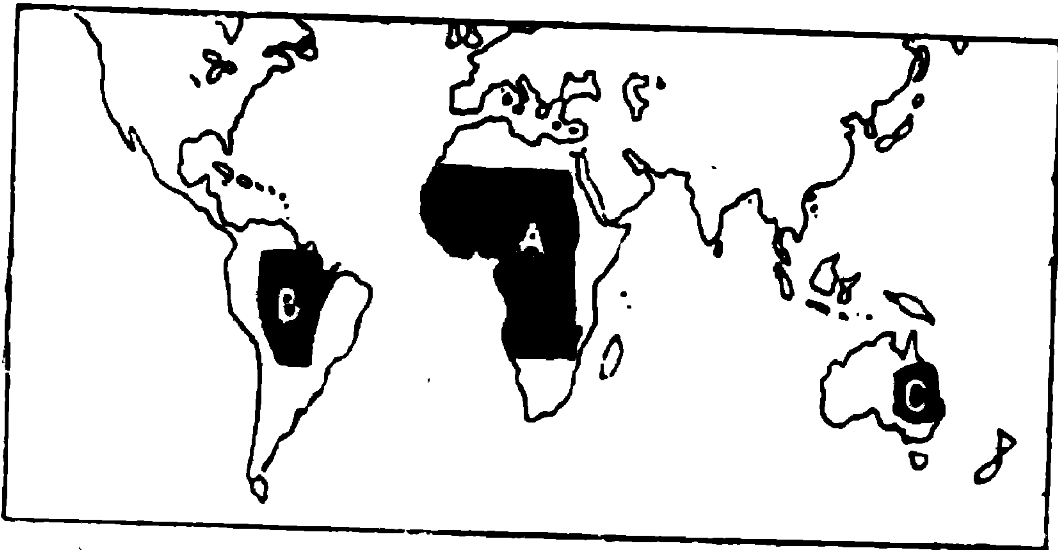
অস্ট্রেলিয়ার ফুসফুস মাছ এপিসেরাটোডাস (Epiceratodus) আজকাল পাওয়া যায় কুইন্সল্যান্ডের নদীগুলোতে। এরা অগভীর জলে বা জলভরা গর্তে বাস করে এবং শ্বাস নিতে উপরে ভেসে ওঠে। খাদ্য হিসাবে এরা মূল্যবান, চলাফেরা ধীর হওয়াতে সহজে ওদের ধরাও যায়। এদের বিলুপ্তির ভয়ে অস্ট্রেলীয় সরকার এদের ধরা বা মারা নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করেছে।

আফ্রিকার ফুসফুস মাছ প্রোটপটেরাস (Protopterus) পাওয়া যায় ওই মহাদেশের বিস্তীর্ণ









চিত্র 4: ফুসফুস মাছ ও তাদের ভৌগোলিক বণ্টন (নরম্যান অনুসরণে)

A—প্রোটপটেরাস; B—লেপিডোসাইরেন; C—এপিসেরাটোডাস

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল জুড়ে। এরা যে সব জলায় থাকে সেগুলো দারুণ গ্রীষ্মে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে শুকিয়ে যায়। খরা পাড়ি দিতে এরা কাদায় গর্ত খুঁড়ে সাময়িক বাসা বানায় এবং বর্ষা পর্যন্ত তাতে ঘুমিয়ে কাটায়। এই সময়টা এরা বেঁচে থাকে শরীরে জমা চর্বির সাহায্যে এবং শ্বাস নেয় গর্তের ছাদের ফুটো দিয়ে।

দক্ষিণ আমেরিকায় ফুসফুস মাছ লেপিডোসাইরেন (Lepidosiren) অ্যামাজন নদীর শাখাপ্রশাখার অধিবাসী। চেহারা ও আচার-আচরণে আফ্রিকার ফুসফুস মাছের সঙ্গে এর খুব মিল।

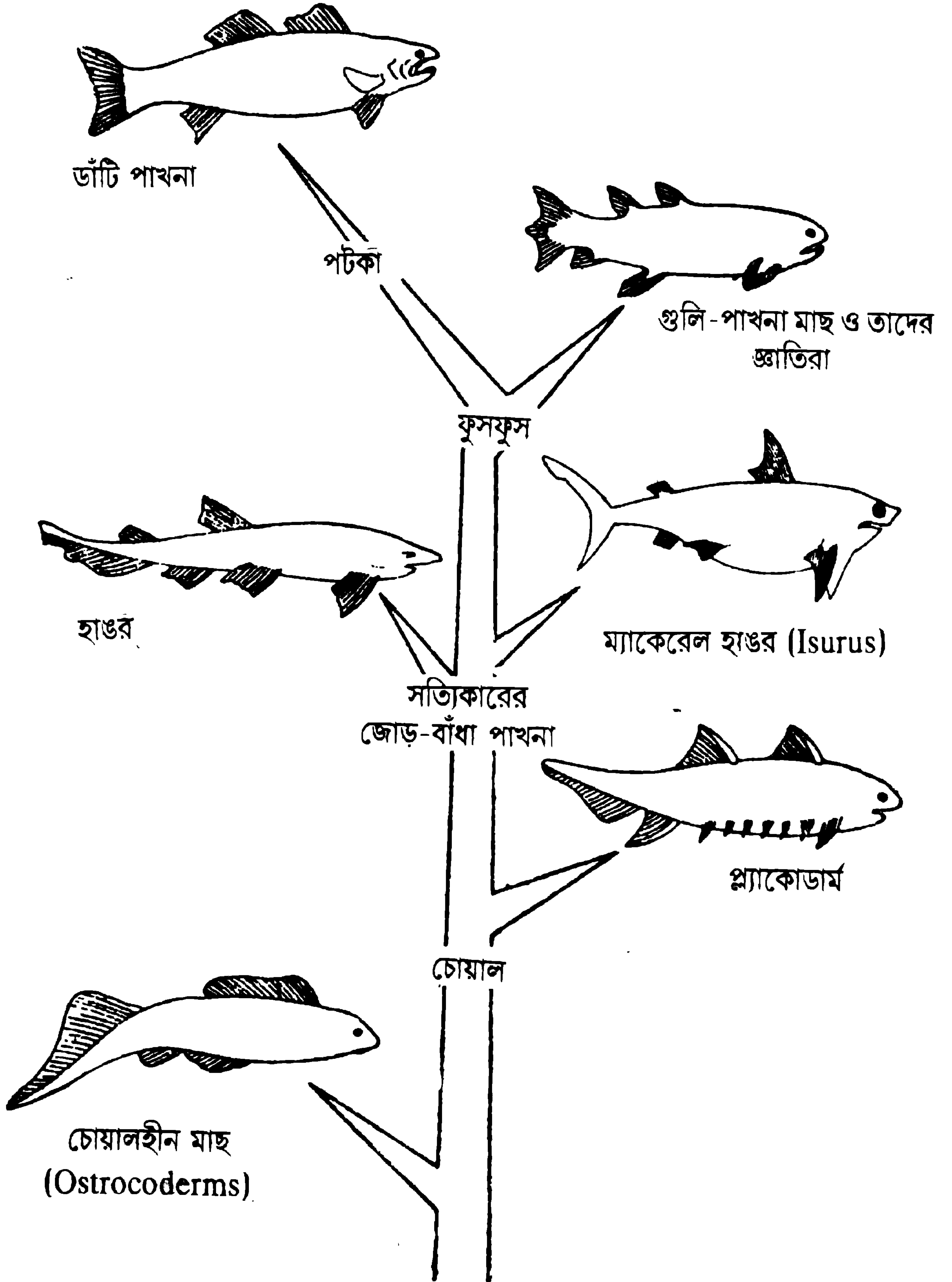
অস্থিবিশিষ্ট (Osteichthye) মাছেরও উদ্ভব ডেভোনিয়ান পর্যায়ে। তবে এদের আধুনিক রূপের সঙ্গে আদি রূপের বেশ তফাত ছিল। অস্থিবিশিষ্ট মাছের এই আদি রূপগুলিকে একসঙ্গে নাম দেওয়া হয়েছে গ্যানয়ড (Ganoid) মাছ। এদের শরীর ঢাকা থাকত চকচকে, মোটা, চৌকোনা গ্যানয়ড আঁশে। চোয়াল বড়, দাঁত ধারালো, কঙ্কাল অংশত কোমলাস্থিময়।

এদের বর্তমান প্রতিনিধি হল রাশিয়ার স্টার্জন (Acipenser), মিসিসিপি নদীর নিম্নভাগের ডানা-মাছ (paddle-fish, Polyodon) এবং উত্তর আমেরিকার গারপাইক মাছ (garpike, Lepidosteus)। স্টার্জন হল রাশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য ও বাণিজ্যিক মাছ। এরই ডিম জরিয়ে তৈরি হয় বিখ্যাত ক্যাভিয়ার। পটকা থেকে তৈরি হয় সুরা শোধনের জন্য চমৎকার আঠালো আইজিংগ্লাস (isinglass)। গারপাইকের বৈশিষ্ট্য হল তার তরোয়ালের মতো ঠোঁট, তাতে শক্ত দাঁত। আঁশগুলো গ্যানয়ড, চৌকো এবং মোটা।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আফ্রিকার 'বিচ্যর' (Polypterus) মাছেরও চকচকে হীরকাকৃতি আঁশের বর্ম আছে। তার মাথা একটা হাড়ের ঢালে ঢাকা, পিঠের পাখনাগুলো বহু উপ-পাখনায় ভাগ করা। এই পলিপটেরিনি গোষ্ঠীতে আর একটি মাত্র গণ আছে— পশ্চিম আফ্রিকার অধিবাসী ক্যালাময়কথাই (Calamoichthye), যাদের শরীর বানমাছের মতো লম্বা। এই দুই জাতের জোড়-বাঁধা পাখনাগুলো দাঁড়ের মতো— স্পষ্ট মজবুত পেশির গোড়া থেকে ছড়িয়ে পড়েছে পাখনার ডাঁটিগুলো, যা জীবাশ্মীভূত গুলি-পাখনাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। এক সময় গুলি-পাখনাদের সঙ্গেই শ্রেণীভুক্ত করা হত এদের। তবে আজকাল গোষ্ঠী দুটির নানা গুরুত্বপূর্ণ গঠনগত পার্থক্যের জন্য বিশেষজ্ঞরা ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং পলিপটেরিনি মাছদের আদি গ্যানয়ড বলেই ধরতে চান।

আধুনিক অস্থিবিশিষ্ট মাছদের পূর্ণাস্থি (Teleostei) দলে ফেলা হয়— অর্থাৎ তাদের ভিতরকার কঙ্কালটি পুরোপুরি অস্থিময়, কোমলাস্থির লেশমাত্র নেই। পূর্ণাস্থি মাছেদের উদ্ভব হয়েছিল ক্রেটেশাস পর্যায়ে, মোটামুটিভাবে 6 থেকে 12 কোটি বছর আগে। এই গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হল : পাতলা, গোল, পরস্পরের উপর চাপানো (overlapping) আঁশ ; ভাগ ভাগ করা ডাঁটি দিয়ে গড়া পাখার আকারের পাখনা ; সমান পর্ববিশিষ্ট লেজের পাখনা ; জলস্থৈতিক (hydrostatic) পটকা বা বায়ুস্থলী।

গোলমুখো মাছ, হাঙর আর ফুসফুস মাছ মৎস্যরাজ্যের অতি প্রাচীন, বিচিত্র ও আকর্ষণীয় অধিবাসী। তবে এরা আজকের মৎস্যকুলের অতি ক্ষুদ্র অংশ, বর্তমান যুগের মাছেদের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই পূর্ণাস্থি। অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এই পূর্ণাস্থি গোষ্ঠী বাস করে নদীতে, হ্রদে. মোহনায় ও সমুদ্রে।



চিত্র 5: মাছের বিবর্তনের ছক ও অভিযোজনের প্রধান প্রধান ধাপ (ল্যানহাম-এর অনুসরণে)

এই সমৃদ্ধ ও বহুব্যাপ্ত গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ অতি বিতর্কিত বিষয়, কোনও দুজন বিশেষজ্ঞও বোধ হয় একমত নন। তবে বেশিরভাগ প্রাণিতত্ত্ববিদ তাদের ভাগ করেন 80 বা তার বেশি প্রধান দলে বা বর্গে (order)। এখানে তিন-চারটি প্রধান বর্গ আলোচনা করলেই চলবে—বেশিরভাগ চেনাজানা মাছই ওই কটি বর্গে পড়ে। বর্গগুলি হল :

আইসোস্পনডিলি (Isospondyli) বর্গ (Clupeiforme)
অস্টারিওফাইজি (Ostariophysi) বর্গ (Cypriniforme)
অ্যাকান্থোপটেরিজিয়াই (Acanthopterigii) বর্গ (Perciforme, ইত্যাদি)
হেটেরোসোমাটা (Heterosomata) বর্গ (প্লিউরোনেকটি ফর্ম)।

আইসোস্পনডিলি বর্গের মধ্যে পড়ে ক্লিউপিড মাছেরা, যেমন সার্ডিন, হেরিং, ভারতের বিখ্যাত ইলিশ ও চানোস। এই ক্লিউপিড মাছেদের সারা পৃথিবীতেই পাওয়া যায়, বড় বড় ঝাঁক বেঁধে থাকে এরা। খাবার হিসাবে এদের কদর খুব, তাই ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে এদের বাণিজ্যিক গুরুত্ব আছে। মেরুদণ্ড, পাখনা আর পটকার গড়নে এরা এতই আদিম যে বিশেষজ্ঞরা এদের আধুনিক পূর্ণাস্থি মাছের পূর্বপুরুষ রূপে দেখে থাকেন। আইসোস্পনডিল মাছেদের মধ্যে অনেক ভাগ, বিপুল বৈচিত্র্য তাদের দেহের গড়নে, তুণ্ডে, মুখ ও তৎসংলগ্ন চোয়াল ও দাঁতে (অর্থাৎ কিনা খাদ্যাভ্যাসেও)।

অস্টারিওফাইজি বর্গের বেশিরভাগ মাছ মিঠে-জলে বাস করে। এইসব মাছের একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হল তাদের ওয়েবারীয় যন্ত্রটি (Weberian apparatus)—চারটি ছোট হাড়ের শৃঙ্খল পটকায় আগা আর অভ্যন্তীণ কানের পিছনকে যুক্ত করে রেখেছে। এই যন্ত্রের কী কাজ? কোনও কোনও বিজ্ঞানীর ধারণা, এটা জলের স্রোতের হদিশ নিয়ে তা আরও জোরালো আকারে কানে পৌঁছে দেয়। অন্যেরা মনে করেন, এর প্রধান কাজ শব্দ নয়, চাপের পরিবহণ। তবে বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল ফন ফ্রিশ ও তাঁর দলের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে কার্প-জাতীয় ও ক্যাটফিশ-জাতীয় মাছের শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণতর। হাড়ের কলকব্জাটা হল পাঁজর, স্নায়ুতোরণ (neural arch) এবং প্রথম চার কশেরুকা-কেন্দ্রের (centra of vertebra) রূপান্তর।

এই বর্গে দুটি উপ-বর্গ— সাইপ্রিনিড (Cyprinid) বা কার্প এবং সিলুরিড (Silurid) বা ক্যাটফিশ। কার্পদের মধ্যে পড়ে রুই-কাতলা ও লোচ, যারা একান্তভাবেই মিঠে-জলের বাসিন্দা। বাড়িতে যে অতিপরিচিত গোল্ড ফিশ পোষা হয়, তা-ও একটা ভাল দৃষ্টান্ত। এই জাতের মাছ ভারতে প্রচুর—রুই, মৃগেল, মহাশোল এই সব নাম তো ঘরে ঘরে ফেরে। সিলুরিড জাতীয় মাছ (লম্বা শুঁড় বা গোঁফের জন্য যাদের ইংরেজিতে ক্যাটফিশ বলে) নদী ও হ্রদে থাকে, এদের আঁশ নেই। সমুদ্রে খুব কমই দেখা যায় এদের। আড়, মুল্লি প্রভৃতি মাছও এই দলেরই। এগুলি খেতে ভালই, তবে স্বাদগন্ধ কার্পদের মতো নয়। তা ছাড়া আঁশবিহীন মাছ খাওয়ার বিরুদ্ধে কিছু লোকের সংস্কারও আছে। ইহুদি ধর্মে এদের খাওয়া বারণ। এইসব মাছ শিকারি ও মাংসাশী, তবে এরা নোংরা খায় বলে যে বিশ্বাস প্রচলিত সেটা অতিশয়োক্তি। এই গোষ্ঠীর কোনও কোনও জাত বেশ বড় হয়। ধরার পক্ষে চমৎকার

মাছ বোয়াল আর পাঙাশ।

অ্যাকানথোপটেরিজিয়াই বা কাঁটাওয়ালা পাখনার মাছেদেরও অনেক ভাগ, সেগুলোর মধ্যে পার্চ (perch) ও তার জ্ঞাতিগুষ্টিরা অতিবিশিষ্ট একটি দল, প্রধানত সামুদ্রিক। সমুদ্রের গভীর ও অগভীর জল, রং-বেরঙের প্রবালবেষ্টনী এবং উন্মুক্ত মহাসাগরে এদের প্রাধান্য।

পার্চদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। সবচেয়ে চোখে পড়ে এদের পাখনার সূচের মতো চোখা কাঁটাগুলো। পটকাটি পুরোপুরি বন্ধ একটি থলি (physoclistic), তৎসহ নানা অতিরিক্ত কলকব্জা, যেমন rete mirabile নামক জটিল ও আশ্চর্য রক্তজালক (blood capillary)-এর সঙ্গে সংলগ্ন গ্যাস-গ্রন্থিগুলি। আঁশ পাতলা, পরস্পরের উপর চাপানো এবং গোলাকার। কোনও কোনও জাতের আঁশের ধারটা চিরুনির মতো দাঁত-কাটা। এই ধরনের আঁশকে বলে চিরনদাঁতি বা টেনয়ড (ctenoid)। শ্রোণীয় পাখনাগুলি থাকে বুকে, এতে বন্ধ পটকাওয়ালা মাছেদের ভারসাম্য রাখতে সুবিধা হয়। সমুদ্রের অধিকাংশ বাণিজ্যিক মাছ—যেমন সেরানিড (Serranid), লুটিয়ানিড (Lutianid), ভেটকি (বাংলায় Lates calcarifer), ম্যাকেরেল, টিউনা, মালেট, ক্যারাঙ্গিড ইত্যাদি— অ্যাকানথোপটেরিজিয়াইদেরই প্রকারভেদ।

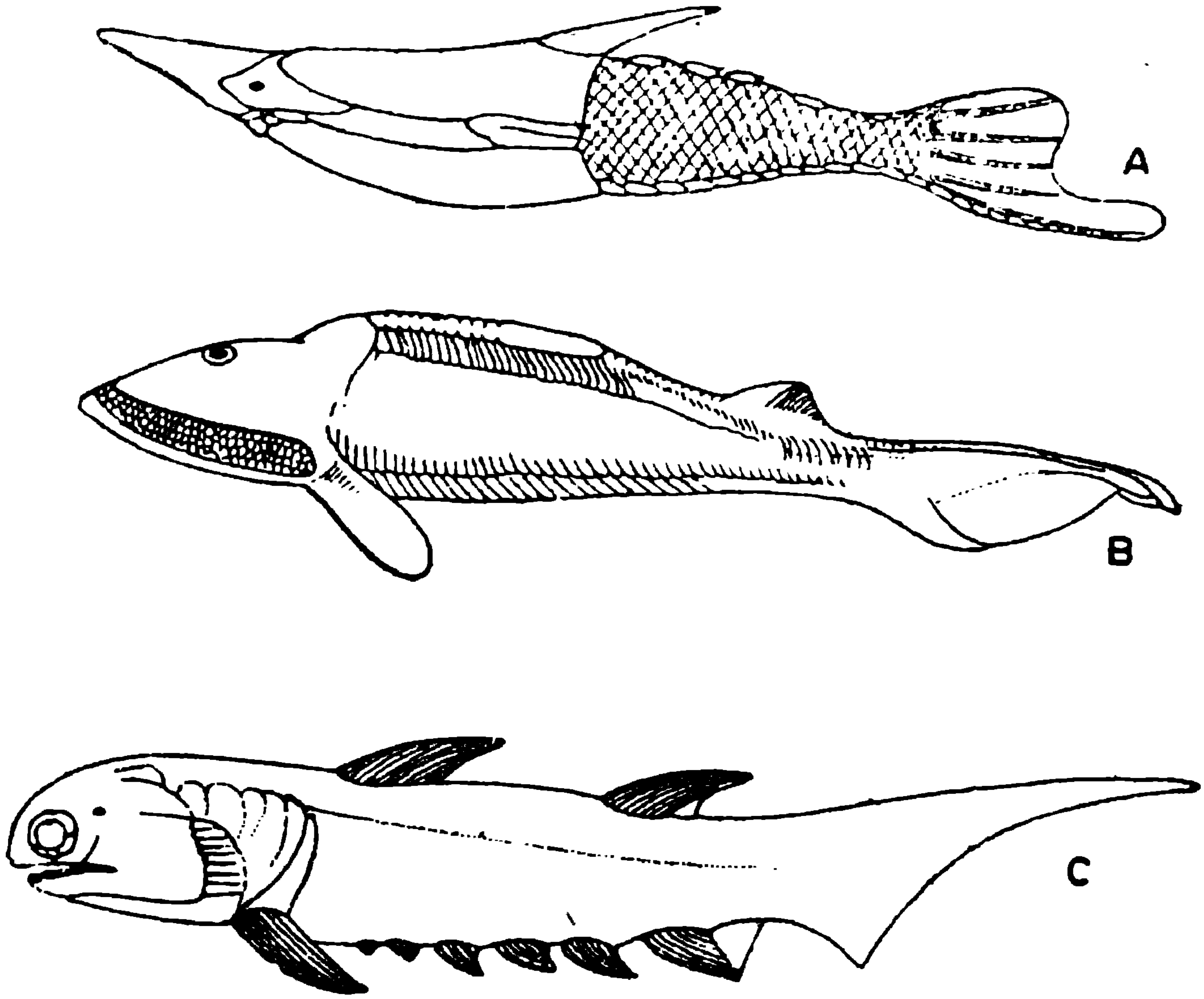
হেটেরোসোমাটা হল শ-দুয়েক প্রজাতির এক অতিবিশিষ্ট গোষ্ঠী, যাদের সাধারণত ডাকা হয় পাতা মাছ (flat-fish বা tongue-fish) বলে। এরা মন্থর ও স্থাণু স্বভাবের, তলদেশের জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এদের মাথা প্রতিসাম্য (symmetry) হারিয়েছে, অত্যন্ত চ্যাপটা হয়ে গেছে শরীর। পাখনায় কাঁটা নেই। পটকাও লোপ পেয়েছে। এই দলে পড়ে ফ্লাউন্ডার, সোল, হ্যালিবাট প্রভৃতি বাণিজ্যিক মাছ— সেগুলো আমাদের দেশের চেয়ে পাশ্চাত্যেই বেশি পরিচিত।

জীবাশ্মীভূত মাছ (পুরাকালের মাছ)

মাটির তলায় পোঁতা অতীত প্রাণের নিদর্শনগুলোর সম্বন্ধে না জানলে আমরা বর্তমান যুগের প্রাণীদেরও বুঝতে পারব না। ভূবিদ্যা এবং প্রত্নবিদ্যা জীবাশ্মের অর্থ বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। বিখ্যাত ব্রিটিশ প্রত্নবিদ স্যার চার্লস লিয়েলের সংজ্ঞা অনুযায়ী জীবাশ্ম হল 'প্রাকৃতিক উপায়ে প্রোথিত ও সংরক্ষিত প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহ বা দেহের নিদর্শন।' প্রতিটি জীবাশ্ম কোনও জীবন্ত বস্তুর পূর্বপুরুষ অথবা কোনও লুপ্ত ধারার প্রতিভূ। হাক্সলির ভাষায় 'জীবাশ্ম হল জীবনপাত্রে ইতস্তত ভাসমান শৈবালদল ; হোক অসম্পূর্ণ, তবু সেটাই অতীত কাহিনীর সবচেয়ে মোক্ষম প্রমাণ।'

জীবাশ্ম পরীক্ষার সাহায্যে আমরা পাথরের স্তরগুলোর পারম্পর্য ধরতে পারি। এক-একটি জীবগোষ্ঠীর উদ্ভবের সম্ভাব্য সময়, অস্তিত্বকাল এবং বিবর্তনের হার জানাটাও বাঞ্ছনীয়। এগুলো সন্ধান করার বেশ কটি নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার বিজ্ঞানীদের আছে। একটি হল তেজস্ক্রিয়তার তত্ত্ব। ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের মতো মৌলগুলি যে-হারে ভাঙে, আমাদের জানা কোনও অবস্থার দ্বারা তা প্রভাবিত হয় না। ইউরেনিয়াম থেকে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ধীরে-হ্রাসমান হারে রশ্মি বিকীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে সীসায় পরিণত করে। এই সীসার ভর মাপা হল বিশেষ স্তর বা পাথরের বয়স হিসাব করার একটি উপায়।

অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician) পর্যায়ের পাথর থেকে মাছের যে প্রাচীনতম জীবাশ্ম বেরিয়েছে তা 40 কোটি বছর বা তারও বেশি পুরোনো। এই প্রাচীন গোষ্ঠীগুলো হল অস্ট্রাকোডার্ম (Ostracoderm), অর্থাৎ বর্মধারী প্রাগৈতিহাসিক মাছ। নামেই বোঝা যায়, ওদের দেহ ঢাকা ছিল ভারী হাড়ের বর্মে। তা ছাড়া চোয়াল ছিল না। ফুলকোগুলো থাকত গলপথ থেকে বেরিয়ে-থাকা এক সারি থলের মধ্যে, তাদের প্রত্যেকের বাইরের দিকে একটা গোল ছিদ্রপথ। আগে গোলমুখো গোষ্ঠীর যে ল্যামপ্রি আর হ্যাগফিশের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্যগুলি টিকে আছে। বিলুপ্ত বর্মধারী মাছ আর বর্তমান যুগের গোলমুখো মাছ তাই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। দুইয়ের মধ্যে জীবাশ্মের কোনও যোগসূত্র আজও না মিললেও প্রাণিতত্ত্ববিদরা তাদের অ্যাগনাথা (Agnatha) নামক শ্রেণীতে ফেলেছেন।



চিত্র 6: জীবাশ্মীভূত বর্মধারী মাছ। A—টেরাসপিস (Pteraspix): B—সেফালাসপিস (Cephalaspis); C—অ্যাকানথোড (Acanthode).

সেফালাসপিস Cephalaspis) হল এদের একটি পরিচিত জাত, ঢালের মতো একটি বর্মে তার মাথা-বুক ঢাকা। মাথায় দুটি বা তার বেশি দাগ—যেমন কোনও প্রত্যঙ্গ ছিল সেখানে,

প্রথম-প্রথম ভাবা হত কোনও বৈদ্যুতিক প্রত্যঙ্গ। আজকালকার মত হল, সেগুলো হয় তো ছিল কানের সঙ্গে যুক্ত কোনও বিশিষ্ট গ্রাহকযন্ত্র—জলস্রোতের হদিশ নেওয়ার স্নায়বিক প্রত্যঙ্গ। এদের অধিকাংশ জাত ও আত্মীয়রা ছিল সিলুরিয়ান ও ডেভোনিয়ান পর্যায়ের অলস-স্বভাব ও মন্থরগতি তলদেশবাসীর দল।

এই গণটির সঙ্গে প্রায়ই দেখা যায় টেরাসপিসদের (Pteraspis)। এদের দেহ মূলকাকার (fusiform); মাথা-ধড় এক সারি ফলকে মোড়া ; যদিও এদের জোড়-বাঁধা পাখনা ছিল না, ছিল শুধু মধ্যক (mediam) পাখনা, তবু অনুমান করা হয় যে এরা ছিল আরও সক্রিয় ও দ্রুতগতি মাছ।

উপরে উল্লিখিত দু-রকম বর্মধারী মাছের থেকে আলাদা হল অ্যানাসপিড (Anaspid) মাছ, যাদের প্রতিভূ হল ব্যর্কেনিয়া (Birkenia)। উপবৃত্তাকার দেহ, দুই পর্ব বিশিষ্ট বড়সড় লেজের পাখনা, জোড়-বাঁধা পাখনা এই ইঙ্গিত দেয় যে দেহ-সংগঠন উন্নত হয়েছে এবং বিচরণমাধ্যম জলের উপর অর্জিত হয়েছে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ।

এই বর্মধারী মাছেরাই হল প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী। শরীরের পেশি ওদের দেহটাকে চালাতে সাহায্য করত, তবে সাধারণত ওদের ভারসাম্য ও দিক নিয়ন্ত্রণের পাখনা থাকত না। গোল চোয়ালবিহীন মুখটা ছিল আণুবীক্ষণিক জীব আহার করার উপযোগী আদিম এক যন্ত্র।

প্ল্যাকোডার্ম (Placoderm) অর্থাৎ ফলক-ত্বক বিশিষ্ট মাছেরা (এরাও বর্ম-আঁটা) হল জীবাশ্মীভূত মাছেদের দ্বিতীয় বড় গোষ্ঠী। এরা ডেভোনিয়ান পর্যায়ে সংখ্যাবহুল ছিল, কার্বনিফেরাস (Carboniferous) পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। মাছের বিবর্তনে প্ল্যাকোডার্মরা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী কেন না এদের মধ্যেই প্রথম সত্যিকারের কামড়ানোর উপযোগী চোয়ালের উদ্ভব হয়েছিল, যার দরুন বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল মেরুদণ্ডীদের সাফল্যের ইতিহাসে।

অ্যাগনাথান (Agnathan) মাছেদের পর্যায়ক্রমিক ফুলকোছিদ্রগুলি ছিল কোমলাস্থি বা অস্থির দণ্ডে স্থাপিত, দণ্ডগুলি ইংরেজি V-এর মতো, মাঝখানে কব্জা দিয়ে জোড়া, খোলা মুখগুলো সামনের দিকে। মুখের দুই কিনারায় ফুলকোর খিলানগুলো শ্বাসপ্রশ্বাসের থেকে আহারক্রিয়ার সঙ্গেই বেশি জড়িত হয়ে পড়ল, তাই পরবর্তী ফুলকো-দণ্ডগুলোর চেয়ে এই খিলান উঠল বেশি বড় ও শক্ত হয়ে। তার উপরের অংশটা রূপান্তরিত হল উপরের চোয়ালে, তলারটা তলার চোয়ালে। সেই সঙ্গে মুখও বড় হল। পেশি বিকশিত হল, গড়ে উঠল বড় বড় জীবকে আক্রমণ করার মতো কার্যকর একটি দংশনযন্ত্র। চোয়ালের উপরকার চামড়া দাঁতে রূপান্তরিত হল বলে বিশ্বাস, তাতে আরও সুবিধা হল শিকার ধরে ছিঁড়ে ফেলার। এইভাবে চোয়াল উদ্ভাবনকারী প্ল্যাকোডার্মরা উৎখাত করে দিল বেঢপ, জবুথবু চোয়ালহীন মাছদের।

প্ল্যাকোডার্মদেরই ধরা হয় হাঙর ও অস্থিবিশিষ্ট মাছদের পূর্বপুরুষ বলে। এদের বেলায় শুধু ফুলকোর প্রথম খিলান-জোড়াটাই চোয়ালের বিবর্তনে অংশ নিয়েছিল। হাঙররা আরও এক ধাপ এগোল। তাদের ফুলকোর দ্বিতীয় খিলানেও আগ্রহজনক পরিবর্তন দেখা দিল। তা এগিয়ে এসে সামনের ফুলকো-ছিদ্রটাকে আংশিকভাবে ঢেকে দিল, বাকি রাখল স্পাইর‍্যাকল (spiracle) নামে একটা ছোট পথ। তার উপরাংশ পরিবর্তিত হল খুলির সঙ্গে চোয়াল জুড়ে

রাখার অবলম্বনে। সেটা অগ্রগতি নিঃসন্দেহে, কারণ তাতে, বাড়ল চোয়ালের নড়াচড়ার স্বাধীনতা।

প্ল্যাকোডার্মদের একটি উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী হল অ্যাকানথোডিয়ান (Acanthodian) বা তথাকথিত 'শিঙি হাঙর' (spiny shark), উচ্চ-সিলুরিয়ান থেকে পার্মিয়ান (Permian) পর্যায় অবধি যাদের অস্তিত্ব। এদের ছোট সুঠাম শরীর, বুকে ও শ্রোণীতে জোড়-বাঁধা পাখনা, মাঝখানে কারও কারও তিন বা চার, কখনও পাঁচ জোড়া অতিরিক্ত পাখনা। প্রতিটি পাখনায়, কোনও ডাঁটি না থাকলেও, সামনের দিকে থাকত শক্ত একটা কাঁটা বা শিঙের অবলম্বন, যা বাড়িয়ে দিত পাখনাগুলোর ভারসাম্য ও দিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। জোড়-বাঁধা পাখনাগুলো ছাড়াও পিঠে থাকত একটি বা দুটি মধ্যক পাখনা, এবং পেটে বা পায়ুর কাছে আরোকটি—সবগুলোই শিংওয়ালা। লেজের পাখনাটি দুই অসম-পর্ববিশিষ্ট (heterocercal), ঠিক হাঙরের মতো। চামড়াও অনেকটা হাঙরের মতোই ছোট ছোট দাঁতে ঢাকা। অতএব বলা চলে যে, মূলকাকার দেহ, নমনীয় বহিত্বকের আবরণ এবং পূর্ণসংখ্যক পাখনা নিয়ে অ্যাকানথোডিয়ানদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়েই মাছ তার আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করল। ফলে অ্যাকানথোডিয়ানদের দেখা যেতে পারে পরবর্তী চোয়ালবিশিষ্ট মাছেদের পূর্বপুরুষ হিসাবে।

জীবাশ্মীভূত হাঙর

আগের অংশে যে প্ল্যাকোডার্মদের বর্ণনা করা হল, ডেভোনিয়ান পর্যায়ে তারা বর্মধারী মাছেদের পাশাপাশি বাস করত। চোয়াল, সুগঠিত পাখনা এবং হ্রাসপ্রাপ্ত বহিঃকঙ্কালের কারণে প্ল্যাকোডার্মরাই ছিল উন্নততর। ডেভোনিয়ান পর্যায়ের শেষে অস্ট্রাকোডের্মরা লুপ্ত হয়ে গেল, প্ল্যাকোডার্মদের অগ্রগতি চলল আরও 10 কোটি বছর ধরে। তারপর পার্মিয়ান পর্যায়ে লুপ্ত হল তারাও।

হাঙররাও ডেভোনিয়ান পর্যায়ের প্রথম দিককার চোয়ালবিশিষ্ট মাছেদের অন্যতম। তাদের প্রথম উদ্ভব অস্পষ্ট। সিলুরিয়ান ও ডেভোনিয়ান পাথরের মধ্যে পাওয়া ছোট, শক্ত, ত্রিদন্তীদের দাঁত 'কনোডন্ট' (conodont)-কে কোনও কোনও প্রত্নবিদ আদি হাঙরের বলে মনে করেছেন।

সবচেয়ে পুরনো যে হাঙরের কথা জানা গেছে তা হল ক্ল্যাডোসেলেক (Cladoselache), প্রায় 30 কোটি বছর আগে ডেভোনিয়ান পর্যায়ের শেষ দিকে বাস করত। ফুট তিনেক লম্বা মাছটির ছিল চমৎকার সুঠাম শরীর, স্পষ্ট একজোড়া বক্ষীয় পাখনা যেন আধুনিক উড়োজাহাজের দুটি ডানা। জোড়-বাঁধা পাখনাগুলোর বেশ বড়সড় গোড়া, সরল ডাঁটির কাঠামো। লেজের অসম পর্ববিশিষ্ট (heterocercal) পাখনা খানিকটা পরিবর্তিত— দু পাশে দুটি সুস্পষ্ট চামড়ার ভাঁজ, সম্ভবত দ্রুত চলাফেরার সহায়ক।

পার্মিয়ান পর্যায়ে এই প্রাচীন ক্ল্যাডোসেলেকরা অবলুপ্ত হয়ে যায়। তাদের জায়গা নেয় উন্নততর হাঙররা, যাদের অন্যতম হল সুপরিচিত হাইবোডাস (Hybodus)। আসলে এই হাঙরদের উদ্ভব হয়েছিল ডেভোনিয়ান পর্যায়ে, এরা টিকে ছিল প্যালিওজোইক (Palaeozoic) ও পুরো মেসোজোইক (Mesozoic) যুগের কার্বনিফেরাস ও পার্মিয়ান পর্যায় অবধি, তারপর তারা লোপ পায়। হাইবোডাস হাঙর ছিল প্রায় সাড়ে সাত ফুট লম্বা, শরীর সুষম, পাখনা

বড়। পুরুষদের শ্রোণীয় পাখনার সঙ্গে থাকত বন্ধনযন্ত্র (clasper)—প্রত্যঙ্গটি স্ত্রীর দেহে প্রবেশ করতে সক্ষম। নিষেক ছিল আভ্যন্তরীণ—যে-বৈশিষ্ট্য সব পরবর্তী হাঙরেও বিদ্যমান। দাঁত ছিল ছোট ছোট ও ভোঁতা, এই হাঙর সর্বভুক (omnivorous) ছিল বলেই বিশ্বাস। আধুনিক যুগের পোর্ট জ্যাকসন হাঙরের (Port Jackson shark, Heterodontus) সঙ্গে এই বিলুপ্ত হাঙরদের খুব মিল, সিনোজোইক (Coenozoic) যুগে হাঙর ছিল প্রচুর সংখ্যায় আর নানা রকমের। বিবর্তনের তিনটি স্পষ্ট ধারা লক্ষ করা যায়—স্কাইলয়ড (Scylloid), যে দলে পড়ে বড় আকারের হাঙর, বাঘা হাঙর, তিমি, নীল হাঙর, ইত্যাদি ; স্কোয়ালয়ড (Squaloid), যে দলে পড়ে ছোট ডগফিশ, স্কোয়ালাস ইত্যাদি ; এবং শঙ্করজাতীয় পিঠে-পেটে চ্যাপ্টা, তলদেশবাসী জাত, যারা তাদের বেড়ে-যাওয়া বক্ষীয় পাখনা নেড়ে চলাফেরা করত।

রে-জাতীয় মাছ সেলকিয়ানদের (Selachian) একটি শাখা। খুব সম্ভব এদের উদ্ভব হয়েছিল জুরাসিক (Jurassic) পর্যায়ে। আজকের নয়-দশটি ভিন্ন ভিন্ন গোত্র এই দলে পড়ে, গোত্রগুলোর মধ্যে নানা গঠনগত তফাত। চ্যাপ্টা শরীরে একটা চাকতি আর একটা লেজ। পাঁচটি ফুলকো-ছিদ্রই তলার দিকে, চোখ উপরে। প্রত্যেক চোখের পিছনে একটা ছিদ্র, যার নাম স্পাইর‍্যাকল, এক কালের সক্রিয় ফুলকোছিদ্রের লুপ্তাবশেষ। স্পাইর‍্যাকল এখন নতুন কাজে লাগে। তলদেশবাসী হওয়ায় এরা শ্বাস নেওয়ার জন্য মুখ দিয়ে জল টানে না, পাছে কাদা-বালিতে ও পথ বন্ধ হয়ে যায়, টানে স্পাইর‍্যাকল দিয়ে। বুকের পাখনা বিরাট চওড়া হয়ে গিয়েছে, সেগুলোই এই গোষ্ঠীর চলাফেরার প্রধান অঙ্গ। দাঁত ছোট ছোট, কখনও কখনও আণুবীক্ষণিক, গায়ে-গায়ে লাগিয়ে সাজানো। এদের খাদ্য চিংড়ি-কাঁকড়া-শামুক জাতীয় প্রাণী এবং ছোট ছোট অস্থিবিশিষ্ট মাছ।

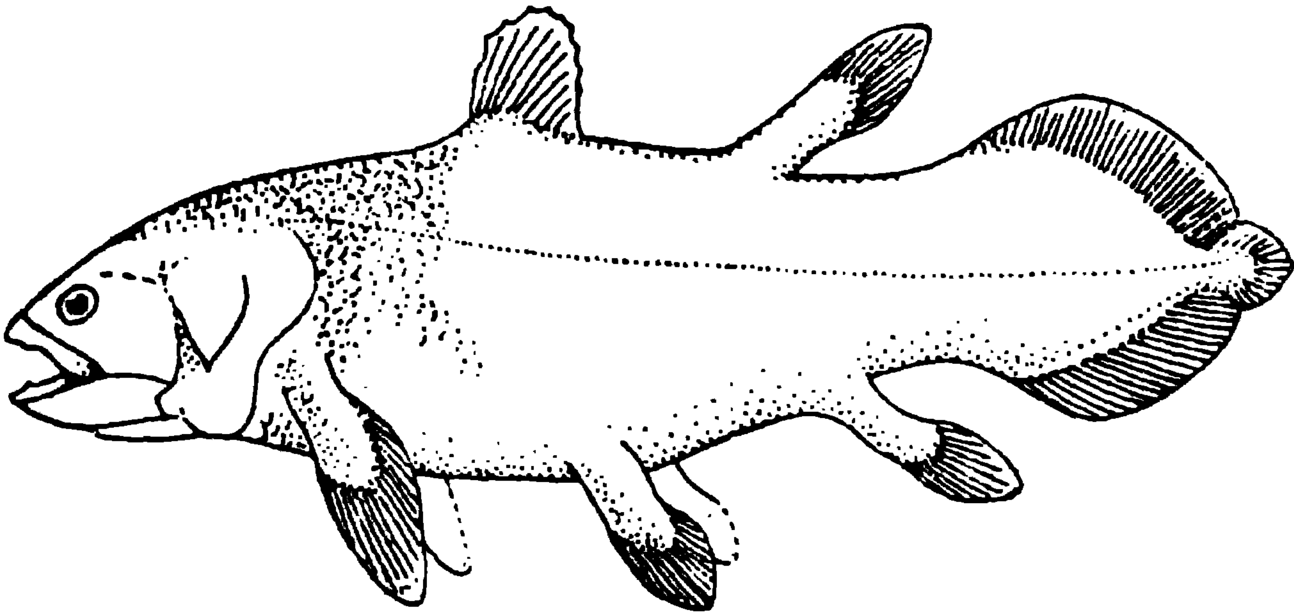
রুপোলি হাঙরদের আধুনিক প্রতিনিধি হল কিমেরা (Chimaera), ক্যালোরিংকাস (Callorhynchus) আর হ্যারিওটা (Hariotta)— এরা সকলেই গভীর সমুদ্রের মাছ, ট্রায়াসিক (Triassic) পর্যায়ে আদিমতম কোমলাস্থিবিশিষ্ট মাছেদের থেকে উদ্ভূত একটি শাখা। 6–12 কোটি বছর আগে ক্রেটেশাস পর্যায়ে ছিল এদের বোলবোলাও। এদের জীবাশ্মের সবচেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত হল নিম্ন কার্বনিফেরাস পর্যায়ের হেলোডাস (Helodus), যাদের দেহে হাঙরের মতো বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মাথা বড় ও বিশেষ গড়নের, শরীর সরু হয়ে শেষে সুতোর মতো হয়ে গেছে। চামড়া মসৃণ, ছোট ছোট প্ল্যাকয়ড দাঁত মিলিয়ে গেছে। উপরের চোয়াল খুলির সঙ্গে জোড়া। চোয়ালে কটি মাত্র বেঁটে ভোঁতা দাঁত। এই দাঁতগুলির নকশা এমনই বিশিষ্ট যে তা থেকে বিজ্ঞানীরা সহজেই মাছের জাত বলে দিতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে সেগুলোই কিমেরা গোষ্ঠীর মাছেদের রেখে যাওয়া একমাত্র নিদর্শন।

ফুসফুস মাছ (Dipnoans)

ফুসফুস মাছেদের প্রাচীতম নিদর্শন হল ডেভোনিয়ান পর্যায়ের ডিপটেরাস (Dipterus)। তার দুটো পিঠের পাখনা, লেজের পাখনা অসমপর্বী। মাথাটা এনামেলের আস্তরণ-দেওয়া অনেক ছোট ছোট হাড়ে ঢাকা। আঁশ মোটা, চৌকোনা, কসমিন (cosmine) নামে এক রকমের রাসায়নিক পদার্থে তৈরি, তাই এ আঁশকে বলে কসময়ড (cosmoid)। অস্টিওলেপিস

(Osteolepis) নামক আদিমতম গুলি-পাখনার সঙ্গে এ মাছের মিল ছিল। ফ্যানেরোপ্লিউরন (Phaneropleuron), স্কাউমেনেসিয়া (Scaumenacea) ও সেরাটোডাস (Ceratodus) জাতীয় মাছেদের জীবাশ্ম থেকে বোঝা যায়, ফুসফুস মাছ যুগ যুগ ধরে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ধারায় অগ্রসর হয়ে এসেছে। সেরাটোডাসের থেকে তার প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ ডিপটেরাসের চেহারা ও গড়ন আলাদা। সেরাটোডাসের পিঠের মধ্যক পাখনা দুটি জুড়ে গিয়ে একটা ঝালর তৈরি হয়েছে। আঁশ পাতলা হয়েছে, দেহটা হয়েছে সমান নলের মতো। এই গণটি একদা দুনিয়া-জুড়ে থাকলেও ট্রায়াসিক (Triassic) পর্যায়ের শেষে লুপ্ত হয়ে যায় এবং তার জায়গায় আসে অনেকটা তারই মতো দেখতে অস্ট্রেলিয়ার নিওসেরাটোডাস (Neoceratodus)।

গুলি-পাখনাদের সবচেয়ে পরিচিত প্রতিভূ হল অস্টিওলেপিস। এর বুক ও শ্রোণীয় পাখনায় পূর্ববর্ণিত ল্যাটিমেরিয়ার মতো সুস্পষ্ট মাংসের গুলি। আঁশ কসময়ড, দাঁত ল্যাবিরিন্থোডোন্ট। জোড়-বাঁধা পাখনা ও খুলির কঙ্কালের সঙ্গেও ল্যাবিরিন্থোডোন্টিয়া শ্রেণীর মিল— এ সব থেকে বোধ হয় এই মতই সমর্থিত হয় যে, অস্টিওলেপিডদের থেকেই উভচরদের উদ্ভব। গুলি-পাখনাদের আরেকটি সুপ্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠী হল সিলাকান্থরা, ল্যাটিমেরিয়া যাদের একমাত্র জীবিত বংশধর।



চিত্র 7 : ল্যাটিমেরিয়া (সিলাকান্থ মাছ)

অস্থিবিশিষ্ট মাছেদের মধ্যে যাদের সবচেয়ে প্রাচীন জীবাশ্ম পাওয়া যায় তারা হল প্যালিওনিসিড (Palaeoniscid) নামে বর্মধারী মাছেদের একটি গোত্র। নিম্ন-ডেভোনিয়ান পর্যায়ে এদের উদ্ভব, তার পর কার্বনিফেরাস ও পার্মিয়ান পর্যায় জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এরা শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয় জুরাসিক পর্যায়ের শেষের দিকে। এই গোষ্ঠীর মধ্যমণি হল প্যালিওনিসকাস (Palaeoniscus)— একটু লম্বাটে ধরনের মাছ, মূলকাকার দেহ সরু হয়ে গেছে লক্ষণীয় একটি অসমপর্বী (heterocercal) লেজে ও একটিমাত্র পিঠের পাখনায়। ধড় আর লেজ আগাগোড়া মোটা চৌকোনা গ্যানয়ড আঁশের বহিঃকঙ্কালে মোড়া, মাথা ঢাকা এক সারি ফলকে। বড়

মুখ, চোয়ালে ধারাল, চোখা দাঁত। শরীরের গড়ন, পাখনা আর দাঁতের ধরন থেকে মনে হয় অস্থিবিশিষ্ট মাছেদের এই আদিম পূর্বপুরুষটি ছিল দক্ষ সাঁতারু এবং শিকারি।

পার্মিয়ান পর্যায়ের শেষ দিকে এই আদিম অস্থিবিশিষ্ট মাছেরা কমে যাচ্ছিল, এগিয়ে আসছিল নতুন নতুন জাত। আমাদের আধুনিক মাছেদের অধিকাংশই এই শেষোক্তদের বংশধর বলে এখন বিশ্বাস করা হয়। এদের একটি ভাল দৃষ্টান্ত হল ট্রায়াসিক ও জুরাসিক পর্যায়ের সেমিওনোটিডি (Semionotidae) গোত্রভুক্ত লেপিডোটাস (Lepidotus)। সেমিওনোটিডরা শক্তসমর্থ মাছ, লেজের দিকে বেঁটে। লেজের পাখনা সমপর্বী (hemocercal)। খুব সম্ভবত মন্থর সাঁতারু ছিল এরা। ছোট মুখ এবং পেষক (molar) ধরনের দাঁত থেকে বোঝা যায় এদের খাদ্য ছিল শামুক ও বাগদা-চিংড়ি জাতীয় প্রাণী। এদের সমৃদ্ধির যুগে এরা বেশ কটি বংশধরের জন্ম দিয়েছিল, তাদের অধিকাংশই ক্রেটেশাস (Cretaceous) পর্যায়ে লুপ্ত হয়ে যায়, শুধু অ্যামিয়া (Amia) আর লেপিডোস্টিয়াস (Lepidosteus) বা গারপাইক (garpike) উত্তর আমেরিকায় টিকে আছে আজও।

সেমিওনোটিডদের সর্বশেষ প্রশাখা হল ফলিডোফোরিড (Pholidophorid) নামে সার্ডিন-গোছের এক রকম মাছ। এদের ভাবা হয় লেপটোলেপিড (Leptolepid)-দের পূর্বসূরি বলে, যাদের সঙ্গে আবার আজকের সার্ডিন, হেরিং আর অ্যাংকোভিদের (anchovies) দারুণ মিল। এই শেষোক্ত গোষ্ঠীর মাছেদের, এবং তাদের সঙ্গে নোটোপটেরিড (Notopterid), কাইরোসেন্ট্রিড (Chirocentrid), স্যামন এবং আফ্রিকার মরমিরিড প্রভৃতি কিছু আজব ধরনের গোষ্ঠীকে একত্রে ক্লিউপিফর্ম (Clupeiforme) বা আইসোস্পন্ডিলি (Isospondyli) বর্গভুক্ত করা হয়েছে। ক্রেটেশাস পর্যায় ছিল এই বর্গের একটি সন্ধিক্ষণ— এই সময়েই এরা দ্রুত বিবর্তিত হয়ে জন্ম দেয় বহু সংখ্যক নতুন গোষ্ঠীর, যারা এখন পূর্ণাস্থি বংশ বৃক্ষের (teleostean tree) গোড়ায় রয়েছে। পূর্ণাস্থিদের সম্প্রসারণের চরম ফল বলে ধরা হয় পার্চ ও তার জ্ঞাতিদের, ক্রেটেশাস পর্যায়ের শেষভাগের আগে এদের আবির্ভাব হয়নি। পরবর্তী ইওসিন (Eocene) ভূতাত্ত্বিক পর্যায়ে এসে তবে ম্যাকেরেল, টিউনা, কাঁকড়া-বিছে মাছ (scorpion fish), চোষক মাছ (sucker fish), ফাইল মাছ (file fish), অ্যাংলার (angler), কফার মাছ (coffer fish) প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বর্গের উদ্ভব ঘটল।

মাছের উদ্ভব

প্রাণের উদ্ভব যে সমুদ্রে তা মেনে নেওয়া হয়েছে। প্রোটোপ্লাজম নামে সেই রহস্যময় আশ্চর্য বস্তুটি যে কীভাবে তৈরি হয়েছিল তা কেউ বলতে পারে না। সমুদ্রের উষ্ণ স্বল্পালোকিত জলের তাপ, চাপ ও লবণাক্ততার অজানা মাত্রা নিশ্চয় জুগিয়েছিল জড় থেকে জীবনের উদ্ভবের অপরিহার্য শর্তাবলি। প্রথম জীবন্ত বস্তু হয় তো ছিল ব্যাকটিরিয়া ও অ্যামিবার মতো সরল আণুবীক্ষণিক জীব। বছর যত গড়িয়ে গেল— লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি বছর— প্রাণের রূপগুলি জটিলতর হতে হতে জন্ম নিল প্রথমে সরল বহুকোষী জীব এবং তারপরে জেলিফিশ, কৃমি, চিংড়ি ও কাঁকড়া, শামুক ও স্লাগ এবং তারামাছ প্রভৃতি উন্নততর

দেহসংগঠনবিশিষ্ট অমেরুদণ্ডী প্রাণী। তারপর আবির্ভাব হল এক নতুন গোষ্ঠীর—সামুদ্রিক স্কুয়র্ট ও লান্সলেটদের মতো প্রাথমিক ও আদিম মেরুদণ্ডী প্রাণীর। সমুদ্রই ছিল এই নাটকের রঙ্গমঞ্চ। জলস্রোতের চাপে সুঠাম ও ক্রমশ-সরু হওয়া দেহ নিয়ে মাছ এসেছিল সিলুরিয়ান বা সম্ভবত অর্ডোভিসিয়ান পর্যায়ের নদীতে। পাথরের খাঁজে রয়ে গেছে তার প্রমাণ। তা ছাড়া বাড়তি জল নিষ্কাশন ও নাইট্রোজেন-ঘটিত বিষাক্ত পদার্থ বর্জনের অঙ্গ বৃক্ক-ও ইঙ্গিত করে, মিঠে জলই ছিল প্রথম মেরুদণ্ডীদের পরিমণ্ডল।

মাছেদের লম্বা ইতিহাস। ওদের প্রথম উদ্ভব প্রায় 43 কোটি বছর আগে। এই দীর্ঘ সময়ে তারা সব রকমের জলীয় পরিমণ্ডলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। নদীনালায়, হ্রদে, মোহনায় ওরা সবচেয়ে বহুলদৃষ্ট জীব। ওরা চরে বেড়ায় খোলা সমুদ্রে, মহাসাগরের অন্ধকার গভীরে। পর্বতের তুমুল স্রোতধারা বেয়ে ওরা উঠে গেছে, ঢুকেছে গুহা আর ফাটলের জলে। মাছের বিবর্তনের ইতিহাস এক মোহনীয় কাহিনী, অভিযান আর সাফল্যে ঠাসা, তবে বিপর্যয়-পরাজয়ও তাতে আছে। বর্তমান যুগে মাছের 25,000 জীবন্ত প্রজাতির হিসাব পাওয়া গেছে। সংখ্যায় ওরা পতঙ্গের পরেই এবং স্তন্যপায়ী পাখি সরীসৃপ ও উভচর মিলিয়ে সব মেরুদণ্ডীর চেয়ে সংখ্যায় বেশি।

কবে, কোথায়, কীভাবে মাছেদের উদ্ভব হয়েছিল ? জীববিদ্যা এই ধরনের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে বৈজ্ঞানিক কায়দায় —ভূবিদ্যা (পৃথিবীর ইতিহাস), প্রত্নবিদ্যা (জীবাশ্মের ইতিহাস), প্রাণীদের দেহসংস্থান-বিদ্যা ও ভ্রূণবিদ্যা ইত্যাদি নানা উৎস থেকে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে।

প্রথমে চোখ ফেরানো যাক 40-50 কোটি বছর আগেকার ক্যামব্রিয়ান (Cambrian) পর্যায়ের পৃথিবীর দিকে। জেলিফিশ, প্রবালকীট, চিংড়ি, ট্রাইলোবাইট (trilobite) প্রভৃতি বিপুলসংখ্যক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দেখা পাই আমরা। মাছের কোনও পাত্তা নেই, এমনকি কোনও আদিম কর্ডেটেরও না। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে, খুব সম্ভব মাছের জন্ম তখনও হয়নি। অর্ডোভিসিয়ান নামক পরবর্তী ভূতাত্ত্বিক পর্যায়ে, 30-40 কোটি বছর আগে, হদিশ মেলে প্রথম মাছের। টেরাসপিস ও সেফালেসপিস জাতীয় সুপরিচিত মাছের বর্মের মতো হাড়ের টুকরো-টাকরা থেকে বিশ্বাস করা যায়, এই পর্যায়ে কঙ্কাল-বিশিষ্ট এবং হয়তো আরও কিছু সুসংগঠিত ব্যবস্থা-সমন্বিত, আদি মেরুদণ্ডীদের একটি গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল। জীবাশ্ম থেকে এর বেশি কিছু জানা যায় না। এই পূর্বসূরিরা কারা, ঠিক কীভাবে তাদের বিবর্তন ঘটেছিল— এই সব প্রশ্ন অনিশ্চিয়তায় ঘেরা। জবাব দিতে গেলে আমাদের যেতে হয় বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার কাছে।

আমরা আগেই দেখেছি, মাছের স্থান কর্ডাটা পর্বে— অ্যামফিওক্সাস (Amphioxus) থেকে স্তন্যপায়ী পর্যন্ত যত প্রাণীর পিঠে একটা শক্ত অবলম্বন বা 'কর্ড' আছে তারা সকলেই এ পর্বের অন্তর্ভুক্ত। মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী— এই পাঁচটি উন্নততর শ্রেণীতে পিঠের অবলম্বন তথা নোটোকর্ড (notochord) রূপান্তরিত হয়েছে একাধিক চাকতির সারিতে এবং তার সঙ্গে স্নায়ু-তোরণের (neural arch) মতো অন্যান্য কঙ্কালাংশ যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে মেরুদণ্ড। তাই এরাই হল মেরুদণ্ডী প্রাণী। অ্যামফিওক্সাস (লান্সলেট,

lancelet), অ্যাস্কিডিয়ান (Ascidian) বা সামুদ্রিক স্কুয়র্ট (Sea-squirt) এবং ব্যালানোগ্লোসিড (Balanoglossid) বা ওক-কীট (acord worm) ইত্যাদির মতো নিম্নতর কর্ডেটদের মধ্যেই খুঁজতে হবে সম্ভাব্য পূর্বপুরুষ। স্পষ্টত অ্যামফিওক্সাসই হল মাছের সবচেয়ে কাছাকাছি, কর্ডেট দেহসংস্থানের সব কটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও তার আছে, যেমন—একটি আলাদা মাথা, পিঠে একটি নমনীয় 'কর্ড', শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য একটি ছিদ্রযুক্ত গলবিল (pharynx), স্পন্দিত হৃৎপিণ্ড সমন্বিত রক্তসংবহন-তন্ত্র, শিরা-ধমনী এবং পাখনার সরু খাঁজ। মাছের উদ্ভবের জন্য দেহ সংগঠনের আরও কিছু প্রয়োজনীয় উন্নতিও সাধিত হয়েছে, বলা চলে। প্রথম এবং প্রধান হল, নোটোকর্ডের রূপান্তর স্বাধীন ও সচল চাকতিতে-গড়া মেরুদণ্ডে। দ্বিতীয়টি হল, লাল রক্তের উদ্ভব— যে লাল পদার্থ অক্সিজেন গ্রহণকে সুচারু ও উন্নত করে। খুব সম্ভবত, সব কোষে বিদ্যমান সাইটোক্রোম (cytochrome) নামক লৌহঘটিত বর্ণহীন পদার্থটির হিমোগ্লোবিন-এ (haemoglobin) রূপান্তরের মাধ্যমেই এটা ঘটেছিল। তৃতীয়টি হল, ফুলকো-ছিদ্র ও তার আনুষঙ্গিক দেহাংশ থেকে জলে গ্যাসীয় পদার্থ বিনিময়ের একটি কার্যকর ব্যবস্থার সৃষ্টি। চতুর্থটি হল, পাখনার খাঁজগুলো থেকে মধ্যক পাখনার গঠন ও তার সঙ্গে জোড়-বাঁধা পাখনার যুক্ত-হওয়া। অতএব মাছের বিবর্তন ছিল ক্রমিক। এই অনুমানকে সমর্থন করার মতো মধ্যবর্তী রূপের অস্তিত্ব আছে কি? স্কটল্যান্ডে ফ্যাময়টিয়াস (Famoytius) নামক সিলুরিয়ান পাথরে সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি অতি আদিম কর্ডেটের জীবাশ্ম সম্ভবত একাধারে প্রাক্-মেরুদণ্ডী প্রাণীর বংশধর এবং ব্র্যাংকিস্টোমা (অ্যাম্ফিওক্সাস)-র পূর্বপুরুষেরও নিকট আত্মীয় (নিউথ, 1949)।

দুই

মাছের শারীরস্থান ও গঠনগত অভিযোজন

প্রাণিজগৎ সমীক্ষা করলে দেখা যায়, কতকগুলি পর্বের প্রাণীরা প্রথমত সমুদ্র বা নদীর বাসিন্দা। এককোষী আদিপ্রাণী (protozoa), স্পঞ্জ, সিলেনটেরেট (coelenterate), পতঙ্গ ও কিছু অ্যারাকনিড (Arachnid) বাদে অন্যান্য সন্ধিপদ (arthropod), খোলকবিশিষ্ট বা কম্বোজ (Molluse), কণ্টকত্বক (Echinoderm), আদি-কর্ডেট (Protochordate) এবং মাছ—এরা সবাই জলচর। বাতাসের চেয়ে ভারী জল তার বাসিন্দাদের জন্য কিছু কিছু সমস্যা সৃষ্টি করে—যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস, বাইরে থেকে দেহে এবং দেহ থেকে বাইরে জল ও লবণের যাওয়া-আসা নিয়ন্ত্রণ, নিমজ্জনাঙ্ক (sinking factor) এবং স্থিতিসাম্য (stability) রক্ষা। তবে আর কোনও প্রাণীই তরল মাধ্যমে জীবনধারণের জন্য নিজেকে মাছের চেয়ে বেশি খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি।

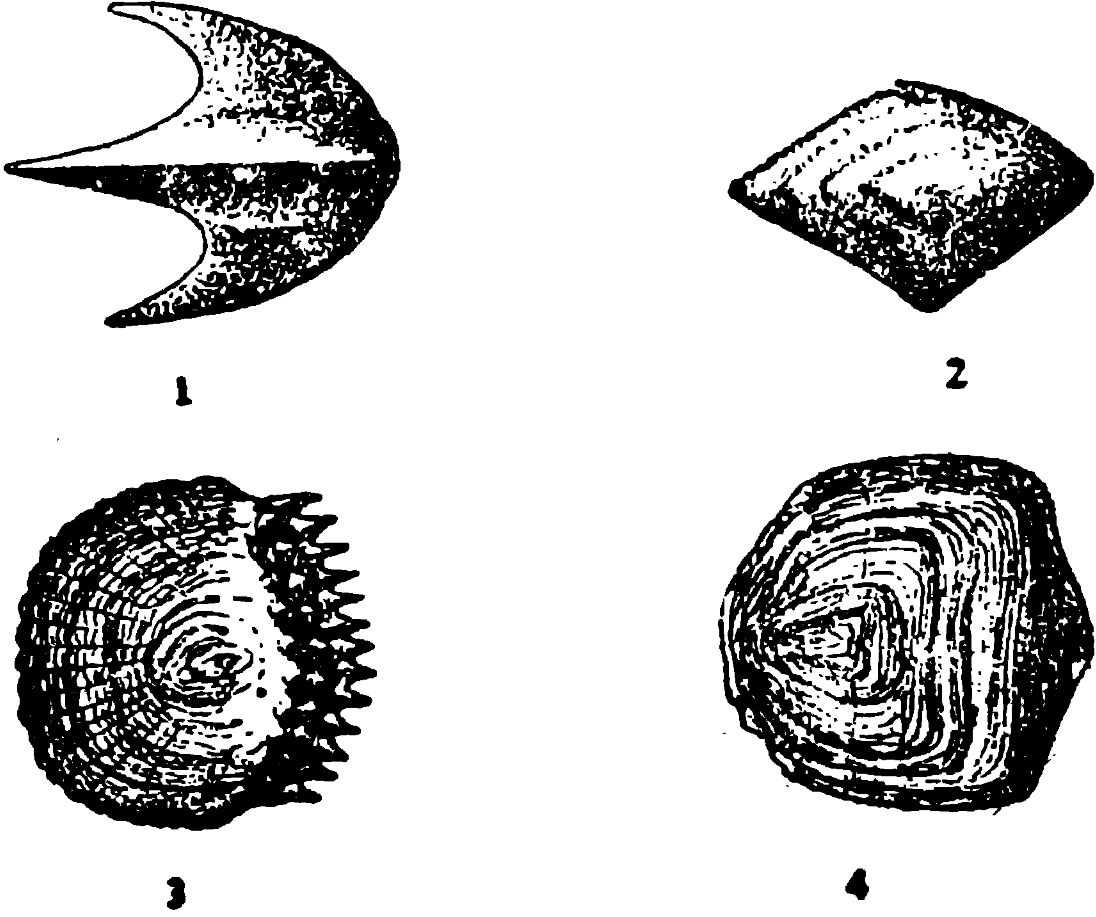
সরল থুরকিনা বা লান্সলেটেরা (Amphioxus) মাছের আদিরূপের হদিশ দেয়। এদের মূলকাকার, দু প্রান্তে সরু ও দু পাশে সুষম (bilaterally symmetrical) শরীরটাকে চালায় দেহপেশির পর-পর বিন্যস্ত গুচ্ছগুলি। কর্ডেট-দেহের গঠন নিখুঁত হয়ে উঠেছে মাছে। মাছের শরীরের আকার ও গড়ন তাই অযৌক্তিক নয়, জলীয় পরিমণ্ডলের টানাপোড়েনেই তা বিবর্তিত হয়েছে।

উপরের কথাগুলির দৃষ্টান্ত হিসাবে হাঙর বা ম্যাকেরেলের মতো কোনও দ্রুত-সাঁতারু মাছকে নেওয়া যেতে পারে। দেহ মূলকাকার বা চুরুটের মতো, প্রস্থচ্ছেদ (cross-section) বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার। মাথার দিকটা মোটা, দেহটা মাঝামাঝি থেকে ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে গেছে সরু লেজ অবধি। অর্থাৎ দেহরেখা মোটের উপর মসৃণ ও সুডৌল, সম্মুখগতিতে বাধা সৃষ্টি করার মতো কোনও বিভাজন, অসমানতা বা বাড়তি কিছু তাতে নেই। বুলেটের আকারের মাথা, চোখা তুণ্ড, আঁটসাট চোয়াল আর কানকো, দু পাশে দুটি পাতাবিহীন চোখ—সবই সাবলীল ও দ্রুত সাঁতারের উপযোগী।

মাছের চামড়ায় জলচর-জীবনের উপযোগী বেশ কিছু অভিযোজন ঘটেছে। তাতে প্রচুর শ্লেষ্মা-গ্রন্থি, সেগুলো থেকে অনবরত রস নিঃসৃত হয়ে চামড়াকে পিচ্ছিল করে রাখে। ফলে শরীরের সঙ্গে জলের ঘর্ষণ কমে, রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে একটা রক্ষাবরণও হয়।

মাছেদের একটি বৈশিষ্ট্য হল আঁশ, যা চামড়ার নিম্নস্তর (dermis) ও উপরিস্তর (epidermis)-এর মিলিত সৃষ্টি। সরীসৃপের আঁশ পুরোপুরিই বহিশ্চর্মজাত, এখানেই মাছের আঁশের সঙ্গে তার তফাত। আজকালকার অস্থিবিশিষ্ট মাছেদের আঁশ পাতলা, গোল ও পরস্পরের উপর চাপানো, ফলে সেগুলো সাঁতারে প্রায় কোনও বাধাই সৃষ্টি করে না। এই ধরনের আঁশকে বলে সাইক্লয়ড (cycloid), অথবা তাতে আণুবীক্ষণিক চিরুনির মতো দাঁত থাকলে

বলে টেনয়ড (ctenoid)। হাঙরের আঁশ প্ল্যাকয়ড (placoid)— সেগুলো খুব ছোট ছোট দাঁতের আকারের কাঁটার মতো, কেবলমাত্র অণুবীক্ষণেই সেগুলোকে দেখা যায়। একটি লক্ষণীয় ও আগ্রহজনক বিষয় হল, মাছের আদিমতম পূর্বপুরুষরা— অর্থাৎ অস্ট্রাকোডার্ম ও প্ল্যাকোডার্ম নামক তথাকথিত বর্মধারী মাছেরা— আগাগোড়া মোড়া থাকত হাড়ের এক



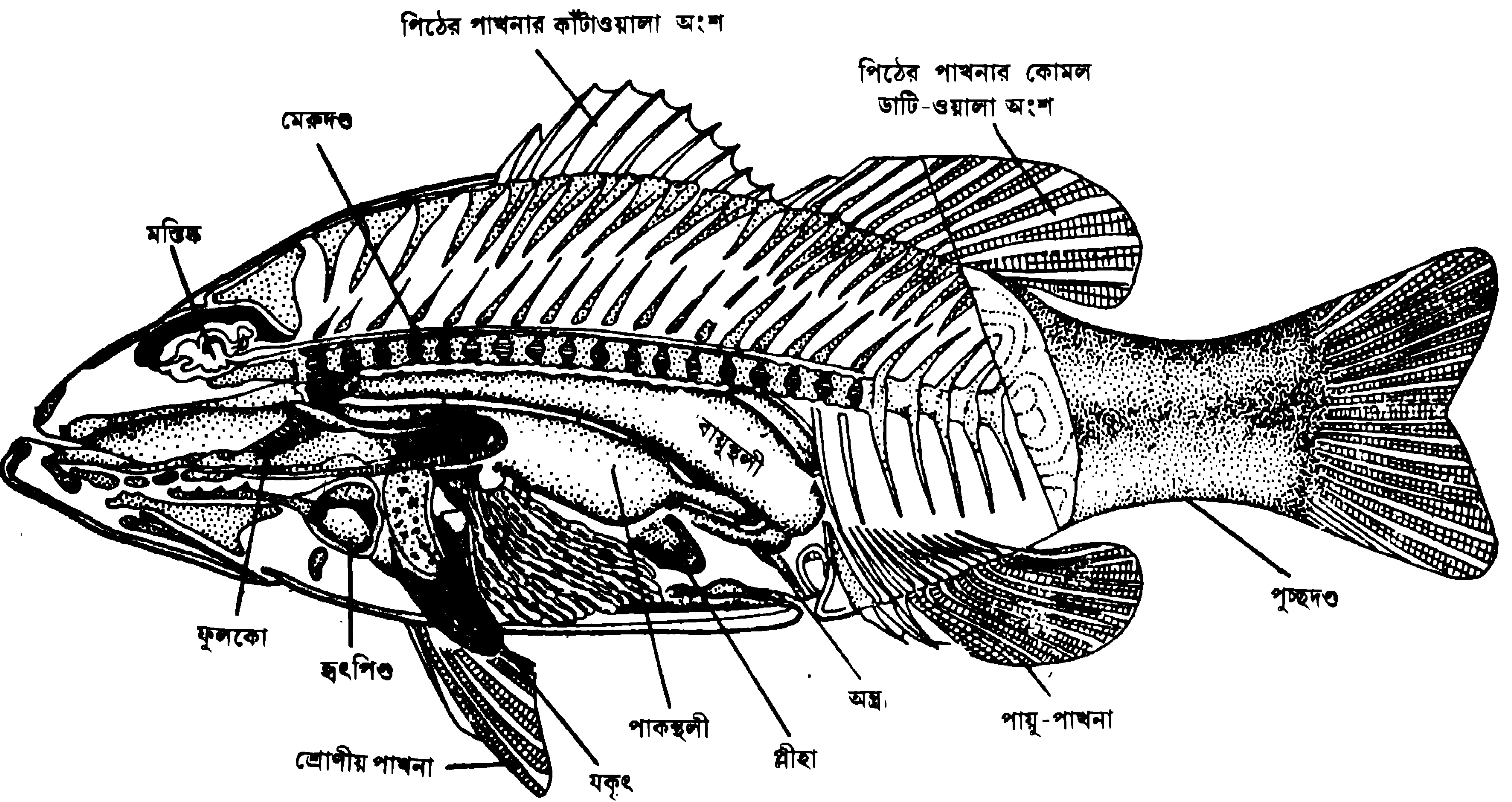
চিত্র 8 : 1— প্ল্যাকয়ড আঁশ 2—গ্যানয়ড আঁশ 3—টেনয়ড আঁশ 4—সাইক্লয়ড আঁশ

ভারী বহিঃকঙ্কালে। অ্যাকনথোডি। (Acanthodi) নামে প্ল্যাকোডার্মদের এক জবরদস্ত গোষ্ঠীর চামড়ায় ছিল মোজাইকের কায়দায় সাজানো গ্যানয়ড আঁশের বর্ম। এই কঠিন বহিঃকঙ্কাল মাছটির চলাফেরাকে ব্যাহত করত, নইলে এই মাছ সফলভাবে জীবনধারণের জন্য অতি-প্রয়োজনীয় দেহাকৃতি, পাখনা ইত্যাদি বাকি সব বৈশিষ্ট্যই অর্জন করেছিল। আধুনিক পূর্ণাস্থি মাছের উদ্ভবের গোড়া অবধি টিকে ছিল এই ধরনের ভারী আঁশ।

গারপাইক (Lepidosteus)-এর মতো কোনও কোনও বিরল মাছে এখনও গ্যানয়ড আঁশ দেখা যায়। আধুনিক কায়দার আঁশের উদ্ভব এবং আবদ্ধ পটকার সফল বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আঁশও পাতলা হয়ে গেল, গঠিত হল নমনীয় অস্থিজাতীয় পদার্থে।

পাখনা মাছের দেহের এমনই বিশিষ্ট অংশ যে এই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পাখনাওয়ালা প্রাণীও বলা চলে। পাখনাগুলো নেহাতই চামড়ার ভাঁজ, তার ভিতরে কঙ্কাল বা মাংসপেশি থাকতে পারে আবার না-ও পারে। কোনও কোনও পাখনা শুধু স্নেহ-তন্তুতে (fatty tissue) তৈরি।

অধিকাংশ জলচর জীবেরই পাখনা অবশ্যপ্রয়োজনীয়, তার উদ্ভব হয়েছে জলে ভারসাম্য রাখার তাগিদে। ব্যাঙের শূক, এমনকি তিমি ও শুশুকের মতো যেসব ডাঙার প্রাণী ফের জলে ফিরে গিয়েছিল, তাদের সবারই দাঁড়ের মতো প্রত্যঙ্গ আছে, যেগুলো পাখনার কাজ করে।



চিত্র 9: অস্থিবিশিষ্ট মাছের আভ্যন্তরীণ শারীরস্থান (ল্যাগলারের অনুসরণে)

কর্ডেট-এর আদিরূপ অ্যামফিওক্সাস (Amphioxus)-এ একটি ঢেউ-তোলা ঝিল্লি পাখনার কাজ চালাতো। মাছেদের আদিমতম পূর্বপুরুষ বর্মধারী জাতেরা আরও এক ধাপ এগিয়ে ছিল। তাদের ছিল লেজ ও পিঠের সুগঠিত পাখনা। হাঙর আর অস্থিবিশিষ্ট মাছে বুক আর শ্রোণীয় জোড়-বাঁধা পাখনাগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজের অঙ্গ হয়ে উঠল।

চলমান জিনিসের উপর জলের প্রভাব দেখানোর জন্য ফ্রান্সের এক বিজ্ঞানী কিছুদিন আগে খুব সরল একটি পরীক্ষা করেছিলেন। প্ল্যাস্টিসিনের মডেল তৈরি করে নানা গতিবেগে তিনি ওগুলোকে টেনে নিয়ে গেলেন জলের মধ্য দিয়ে। দীর্ঘ পরীক্ষার পর দেখা গেল, মডেলগুলির গড়ন বদলে মাছের মতো হয়ে গেছে। তবে ওদের ভাসমান অবস্থায় ছেড়ে দিলে ওরা উল্টে যেতে চাইত। তিনি আবিষ্কার করলেন যে কৃত্রিম 'তলি' (reel) লাগিয়ে দিলে মডেলগুলোর ভারসাম্য বজায় থাকে। অনুরূপভাবে, এ থেকে বোঝা যায়, প্রকৃতিও তৈরি করেছিল এক সার কীলকাকৃতি (wedge-shaped) তলি—অর্থাৎ দেহের কিনারায় মধ্যক পাখনা এবং তার পর পেটের দিকে জোড়-বাঁধা পাখনা। এই জোড়-বাঁধা বক্ষীয় ও শ্রোণীয় পাখনাগুলির সাহায্যে মাছ জলে ভারসাম্য বজায় রেখে থাকতে পারে।

মাছের পাখনার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তার মূলকাকার দেহের বিবর্তনে লেজের পাখনার তাৎপর্যই সবচেয়ে বেশি। এটাই প্রথমে গড়ে উঠেছিল মেরুদণ্ডের পিছন-প্রান্ত ঘিরে এবং ভারী মাথার ডুবে-যাওয়া ঠেকা দিতে সাহায্য করতে—যেমন হাঙরের বেলায়।

হাঙরের লেজের পাখনা লম্বা, ক্রমশ-সংকীর্ণ, তার উপরদিকের ও তলার দিকেই অংশদুটি অসমান (অসমপর্বী)। পূর্ণাস্থি মাছেদের দীর্ঘ ইতিহাসে ক্রমে ক্রমে অংশদুটি সমান ও প্রতিসম (symmetrical) হয়ে উঠেছে (সমপর্বী)। ধারণা করা হয়েছে যে এই পরিবর্তন ঘটেছিল নিয়ন্ত্রণযোগ্য বায়ুস্থলী বা পটকার বিকাশের সঙ্গে। লেজের পাখনা উত্তোলন বল (lift force) জোগানোর দায় থেকে রেহাই পেল, তার কাজ হল শুধু সম্মুখগতিতে সাহায্য করা—জলের আলোড়ন (turbulence) কমিয়ে পুরো সাঁতারের কাজটাকে সহজ করে দেওয়া।

লেজের পাখনার কয়েকটি আগ্রহজনক রূপভেদ আছে। অপেক্ষাকৃত সাধারণ রূপটি হল গোল বা চৌকোনা ও খানিকটা চেরা— যে রকম পাখনা দেখা যায় অধিকাংশ মাছে, যেমন কার্প, সার্ডিন, ট্রাউট ইত্যাদিতে। এই ধরনটা জোরালো সঞ্চালনের উপযোগী—ক্ষিপ্রগতিতে শিকার ধরতে, শত্রুর কাছ থেকে পালাতে কিংবা তীব্র স্রোত পাড়ি দিতে খুব কাজে লাগে।

দ্বিতীয় প্রকারটি হল ম্যাকেরেলের অর্ধচন্দ্রাকার পাখনা—এর চওড়া সাপটের গুণে মাছ জলের উপরিভাগে খুব জোরে চলতে পারে। পূর্ণাস্থি মাছেদের বিশাল গোষ্ঠীতে নানা ধরনের কিছু মধ্যবর্তী রূপ আছে।

অস্থিবিশিষ্ট ও কোমলাস্থিবিশিষ্ট, দু ধরনের আধুনিক মাছেই চলাফেরা ও ভারসাম্য রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল জোড়-বাঁধা পাখনাগুলো। বুকের পাখনাগুলোই স্পষ্ট ও বড়, সামনের দিকে থেকে তারা দেহটা ভাসিয়ে রাখতে সহায়তা করে। এটা বিশেষভাবে সত্য হাঙরদের বেলায়, কারণ তাদের বায়ুস্থলী নেই। হাঙর ও তার জ্ঞাতিদের মধ্যে তাই ভারসাম্য রক্ষিত

হয় জলস্থৈতিক (hydrostatic) বায়ুস্থলীর বদলে দু পাশে ছড়ানো পাখনার সাহায্যে।

অস্থিবিশিষ্ট মাছের বক্ষীয় পাখনা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিকল্পনায় রচিত। পাখনার চ্যাটালো অংশটা পাতলা, নমনীয় এবং পাখার মতো নরম ডাঁটির উপর গঠিত হওয়ায় পাখনার সঞ্চালন খুব ক্ষিপ্র, যা বেগ থামাতে ও দিক নিয়ন্ত্রণ করতে কাজে লাগে। যখন দরকার নেই তখন পাখনা দেহের পাশে গুটিয়ে রেখে গতির বাধা কমানো যায়।

শ্রোণীয় পাখনাগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট, দরকার পড়লে বাড়তি উত্তোলক যন্ত্রের কাজ করে। এগুলো থাকে বুকের পাখনার বেশ পিছনে, আদিম জাতগুলোয় সাধারণত শরীরের প্রায় মাঝামাঝি। উন্নততর বর্গগুলোয় বায়ুস্থলীটা হয়ে উঠেছে ভারসাম্য-রক্ষার আবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য অঙ্গ এবং এদের শ্রোণীয় পাখনাগুলো থাকে আরও সামনে— বুকের কাছাকাছি, এমনকি কখনও কখনও গলায়।

পিঠ ও পায়ুর পাখনাগুলো মধ্যক ধরনের। পিঠ আর পেটের মধ্যরেখা বরাবর চামড়ার মধ্যক ভাঁজের রূপে এদের উদ্ভব এবং একসার সরল ডাঁটি এদের অবলম্বন। জোড়া-বাঁধা পাখনার সঙ্গে এদের তফাত এই যে এদের কোনও বেষ্টনী বা খিলানের আকারের অবলম্বন নেই। পিঠের পাখনা আগে একটানা ছিল, এখন তা সামনের ও পিছনের দুটি অংশে ভাগ হয়ে গেছে, মাঝখানে ফাঁক। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কেবল একটা অংশ টিকে আছে— সাধারণত সামনেরটা। এক-এক প্রজাতিতে তার এক-এক গড়ন ও আকার হয়। পায়ু-পাখনার নামেই বোঝা যায় তা পায়ুর কাছে অবস্থিত, সর্বদাই শ্রোণীর পিছনে। পাখনাগুলোর মধ্যে এর তাৎপর্যই সবচেয়ে কম, কোনও কোনও গোত্রের মাছে তা থাকেই না। যখন থাকে তা নানা গড়ন ও আকারের হতে পারে।

পিঠ ও পায়ুর পাখনাগুলো মাছকে কাত হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

পাখনার প্রকারভেদ এবং কীভাবে সেগুলো মাছকে ভারসাম্য রাখতে ও সাঁতার কাটতে সাহায্য করে তা খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল। এবার কিছু আগ্রহজনক রূপান্তর পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। একটি দেখা যায় উড়ুক্কু মাছে (Exocoetidae), এদের বিশাল বক্ষীয় পাখনাগুলো ডানার কাজ করে। খোলা সাগরে এই মাছ প্রায়ই দেখা যায়— জল ছেড়ে বাতাসে লাফিয়ে উঠে 'ডানা' মেলে মহানন্দে ভেসে চলেছে। হিসাব করে দেখা গেছে, উড়ুক্কু মাছ সেকেন্ডে দশ থেকে কুড়ি মিটার গতিতে 200-400 মিটার পেরোতে পারে।

পাহাড়ি নদী-ঝর্নার কোনও কোনও মাছে বুকের পাখনাগুলি চোষকযন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে মাছকে পাথরের গায়ে লেগে থাকতে সাহায্য করে। বোর্নিয়ার চোষক মাছে (Gastromyzon) তো এমনকি শ্রোণীয় পাখনাও রূপান্তরিত হয়ে গেছে। বুক আর শ্রোণীর পাখনাগুলো বড় হয়ে একসঙ্গে জুড়ে তৈরি করেছে উপবৃত্তাকার একটা চাকতি। গ্রীষ্মমণ্ডলের জোয়ার-জলে যে সব 'কাদা-লাফানে' (mudskipper, Periophthalmus) দেখা যায় তাদের স্বভাব হল তীরে উঠে হেঁটে বা লফিয়ে বেড়ানো। বুকের পাখনায় পরিবর্তন ঘটেছে, প্রত্যেকটি একটি পেশল বাহুর ডগায় জুড়ে দেখতে হয়েছে ডাঙার প্রাণীর হাত-পায়ের মতো। সুতো-পাখনাদের

(threadfin, Polynemus) বুকের পাখনায় 4 থেকে 8টি লম্বা সুতো— আসলে সেগুলো পাখনার ভিতরের ডাঁটি, আলাদা আলাদা হয়ে লম্বা হয়ে গেছে। সুতোগুলো স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

পিঠের পাখনার এক কৌতূহলজনক রূপান্তর দেখা যায় রেমোরার (Echeneidae) দেহে। তার পিঠের পাখনার একাংশ একটি উপবৃত্তাকার চাকতির আকার ধারণ করে, তাতে আড়াআড়ি দু সারি ফলক। এই চাকতির সাহায্যে মাছটি যে কোনও চ্যাপটা জায়গায় আটকে যেতে পারে। অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছটি হঠাৎ ছিটকে গিয়ে ওই চাকতির সাহায্যে সেঁটে যায়, তারপর আবার সাঁতার কাটতে থাকে অবলীলায়—দেখে খুব মজা লাগে।

সেরাটয়ডিয়স (Ceratoideus) শ্রেণীর 'ছিপ-শিকারি' মাছের তুণ্ডে অবস্থিত কাঁটাওয়ালা পিঠ পাখনার প্রথম ডাঁটিটা রূপান্তরিত হয়েছে ছিপসুতো আর টোপে। এদের একটি প্রজাতির (Lasiognathus saccostomia) পিঠের পাখনায় ডাটির গোড়াটা একটা মজবুত দণ্ডে পরিণত হয়েছে; তারপর সরু এক সুতো, তাতে একটা আলোর বাতি এবং এক সারি বাঁকানো শক্ত হুক।

কখনও অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছ লক্ষ করে দেখেছেন ? কখনও ভেবেছেন, তার এত অনায়াস ও সাবলীল ভঙ্গিটি কীভাবে সম্ভব হচ্ছে ? এমন স্বচ্ছন্দ নিপুণতার সঙ্গে সে চলাফেরা করে কী করে ? জবাব পেতে গেলে বুঝতে হবে তার বাইরের ও ভিতরের শারীরস্থান (anatomy)।

তার শরীরের গড়ন আর তার পাখনার বিশ্লেষণ তো পুরোপুরি করা হল। এবার আমরা দেখব তার একটি অসাধারণ অঙ্গের দিকে, মাছের দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত তার বায়ুস্থলী বা পটকার দিকে। জল বায়ুর চেয়ে ভারী এবং তাতে যে প্রাণী বাস করে তাকেই ভেসে থাকার নিয়মনীতি রপ্ত করে নিতে হয়। অনেক জলচর জীবই চেষ্টা করেছে সমস্যাটির সমাধান করতে। সিলেনটেরাটা পর্বভুক্ত কোনও কোনও নিম্নস্তরের প্রাণীর— যেমন পর্তুগিজ ম্যান-অব-ওয়র এবং তার পরপিটা (Porpita) ও ভেলেলার (Vellela) মতো জ্ঞাতিদের—একটা গ্যাসভরা প্রকোষ্ঠ থাকে একবারে উপরের দিকে। এমনকি কিছু কিছু সামুদ্রিক শ্যাওলারও গোল-গোল বাতাসের থলি থাকে, যেগুলো তাদের ভেসে থাকতে সাহায্য করে।

বেশিরভাগ মাছে যে ধরনের পটকার উদ্ভব হয়েছে তা লুকোনো থাকে দেহগহ্বরের উপরের দিকে, মেরুদণ্ড এবং অন্ত্র ও অন্যান্য প্রত্যঙ্গের মাঝখানে—ভাসিয়ে রাখার অঙ্গের সেটাই ঠিক জায়গা। বায়ুস্থলীটা হল রুপোলি-সাদা রঙের বাতাস ভরা একটা থলি, চলতি কথায় যাকে বলে পটকা। ভিতরের বাতাস অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনেরই মিশ্রণ, তবে তা যে বায়ুমণ্ডলের সমান অনুপাতে হবে এমন কোনও কথা নেই। তাই কেউ কেউ একে গ্যাস-স্থলীও বলেন।

বিলুপ্ত বর্মধারী মাছে এবং গোলমুখো, হাঙর ও রে জাতীয় মাছে বায়ুস্থলী অনুপস্থিত। ফুসফুস মাছে এবং আধুনিক অস্থিবিশিষ্ট মাছে কোনও-না-কোনও রূপে তাকে দেখা যায়। গড়ন, আকার, প্রকোষ্ঠের সংখ্যা, উপবৃদ্ধি (outgrowth) ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের প্রচুর তারতম্য দেখা যায় এই প্রত্যঙ্গটিতে।

বায়ুস্থলী কাজ করে কীভাবে? যে মাছের মোট আয়তনকে বাড়িয়ে দেয়। এমন আদর্শ বায়ুস্থলী-বিশিষ্ট মাছ জলে যে কোনও গভীরতায় ভেসে থাকতে পারবে। জলস্থিতি-বিদ্যার নিয়ম খাটিয়ে সহজেই বের করা যায় বায়ুস্থলীর আয়তন কত হলে তা জলে মাছের ওজনকে ঠেকা দিতে পারবে। অনেক মিঠে-জলের মাছে বায়ুস্থলীর আয়তন হয় মাছের আয়তনের প্রায় 7%, যদিও সমুদ্রের আরও ভারী লবণ-জলে তা 5% হলেই চলে।

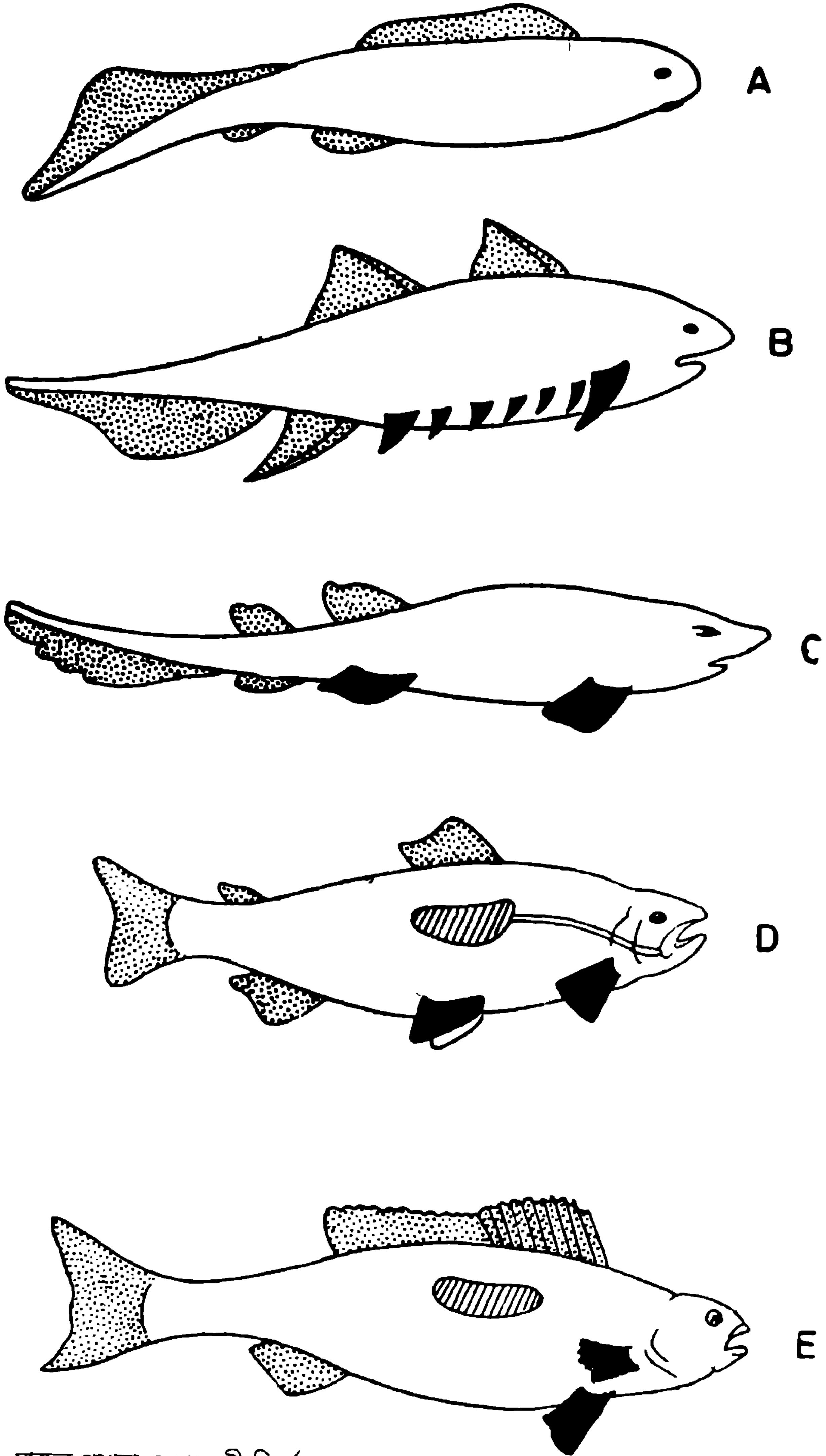
প্লবতা (buoyancy) বজায় রাখতে গেলে বায়ুস্থলী নিয়ন্ত্রণযোগ্য হওয়া দরকার। কীভাবে তা কাজ করে? ধরা যাক একটি মাছ কোনও বিশেষ গভীরতা থেকে নীচের দিকে চলেছে। জলের গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে তার চাপ মাছের শরীরের উপর এবং ভিতরের বায়ুস্থলীর উপর, ফলে কমছে বায়ুস্থলীর আয়তন এবং বদলে যাচ্ছে মাছের আপেক্ষিক গুরুত্ব। অর্থাৎ মাছ যত গভীরে নামে তত বাড়ে জলের মধ্যে তার আপাত-ওজন। মাছ যখন উপরের দিকে যায় তখন কী হয়? জলের গভীরতা কমার সঙ্গে সঙ্গে তার চাপও কমে, বায়ুস্থলী প্রসারিত হয়ে মাছের আপেক্ষিক গুরুত্বকে নিয়ে আসে 1-এ।

আর নিয়ন্ত্রণের কায়দাটা কি? সেটা হল বায়ুস্থলীতে গ্যাস ঢোকানো বা তা থেকে গ্যাস বের করা। এই গ্যাস সাধারণত বায়ুর মতোই অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণ, যদিও কখনও-কখনও অক্সিজেনের মাত্রা বেশি থাকতে পারে, এবং তা চালাচালি করা যেতে পারে তিনটি উপায়ের যে কোনও একটিতে। প্রথমত, সবচেয়ে আদিম বায়ুস্থলীতে একটা বায়ুনালী অন্ননালীর সঙ্গে যুক্ত থাকে, যা দিয়ে মাছ বাতাস গেলে বা বের করে দেয়। এই প্রণালীটা নেহাতই অমার্জিত, কারণ বায়ুস্থলী ভরতে মাছকে প্রত্যেকবার উপারে উঠে আসতে হয়। এই ধরনের বায়ুস্থলীকে বলে ফিজোস্টোমাস (physostomous) এবং এর দেখা মেলে কার্প, ক্যাটফিশ ও ক্লিউপিড জাতীয় নিম্নতর শ্রেণীর মাছে।

দ্বিতীয় ধরনটি পাওয়া যায় বানমাছে— মাছ উপরে না উঠে জলের তলায় থেকেই অক্সিজেন যোগ করতে পারে। ফুলকো দিয়ে টেনে-নেওয়া জলে-গোলা অক্সিজেন রক্তধারার সঙ্গে পটকার গায়ের জালকগুচ্ছে (লাল গ্রন্থি, retia mirabile) চলে আসে ও সেখান থেকে পটকার ভিতরে নিঃসৃত হয়। এর একটা সুবিধা স্পষ্ট ওঠানামার জন্য মাছ তার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে অনেক সূক্ষ্মভাবে। বাড়তি গ্যাস বেরিয়ে যেতে পারে বায়ুনালি দিয়ে। বারে বারে মাছকে আর উপরে উঠে আসতে হয় না।

বেশিরভাগ মাছের বায়ুস্থলী তৃতীয় ধরনের—আবদ্ধ বা ফিজোক্লিস্টাস (physoclistous) বা উন্নত বায়ুস্থলী। এতে লাল গ্রন্থি বা retia mirabile ছাড়াও অক্সিজেন নিঃসরণের জন্য একটি গ্যাস-গ্রন্থি থাকে—সব মিলিয়ে বায়ুস্থলীর সামনের দিকে তৈরি হয় জটিল এক ব্যবস্থা। তা ছাড়া পিছনের দিকে থাকে 'ওভাল' (oval) নামে আরেকটি রক্তজালিকার গুচ্ছ যা গ্যাস বের করে দেয়। ওভাল-এর চারদিকে থাকে স্ফিংটার (sphincter) পেশির বেষ্টনী তার মুখ খোলার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য। ফলে বায়ুনালী অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং বিকাশের প্রথম দিকেই বাদ পড়ে যায়।

ফিজোক্লিস্টার বায়ুস্থলীকে নিখুঁত বলে মনে হলেও তার কিছু অসুবিধা আছে। লাল গ্রন্থি আর ওভাল যে হারে অক্সিজেন গ্রহণ ও বর্জন করে তা এতই মন্থর যে মাছ যদি গভীর



চিত্র 10: মাছের পাখনা ও বায়ুস্থলী বিবর্তন

A—অস্ট্রাকোডাম পর্যায় B—প্ল্যাকোডার্ম পর্যায় C—হাঙর পর্যায় D—আদি ডাঁটি-পাখনা পর্যায় (সার্ডিন) E—উন্নত ডাটি-পাখনা পর্যায় (পার্চ) (ল্যানহ্যাম-এর অনুসরণে)

জল থেকে খুব তাড়াতাড়ি উঠে আসে তা হলে গ্যাস বেরোতে দেরি হওয়ার কারণে বায়ুস্থলী ফুলে ওঠে ও মাছ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে; কেবল পাখনা ও পেশির চেষ্টাতেই ভারসাম্য আবার ফিরে পেতে পারে সে। মাছ যদি আরও উপরে উঠতে চায়, তবে পেট চিৎ করে নিয়ে উপরে ভেসে আসে। ফিজোস্টোমাস বায়ুস্থলীর বেলায় মাছ বায়ুনালী দিয়ে তাড়াতাড়ি হাওয়া বের করে দিতে পারে।

বায়ুস্থলীর কিছু আগ্রহজনক রূপান্তর সংক্ষেপে দেখা যেতে পারে। ক্লিউপিড, কার্প ও ক্যাটফিশ জাতীয় মাছে তা শুনতে সাহায্য করে। শব্দতরঙ্গ মাছের শরীরে লাগলে প্রথমে যায় বায়ুস্থলীতে, উপরোক্ত মাছগুলিতে তার সঙ্গে কানের যোগাযোগ থাকে। ক্লিউপিডদের মধ্যে বায়ুস্থলীর সামনের অংশ লম্বা হয়ে একটা বন্ধ থলের আকার নিয়েছে—সেটা হয় কানের ঝিল্লির (capsule) কাছাকাছি লেগে থাকে নয়তো কানের পেরি-লিম্ফ্যাটিক (peri-lymphatic) স্থানে ঢুকে অন্তঃকর্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। কার্প ও ক্যাটফিশদের প্রথম চারটি বা পাঁচটি কশেরুকা রূপান্তরিত হয় 'ওয়েবারিয়ান অসিকল' (Weberian ossicle) নামে একটি হাড়ের শৃঙ্খলে, যার সামনের দিক অন্তঃকর্ণের সঙ্গে এবং পিছনের দিক বায়ুস্থলীর গায়ে যুক্ত। স্তন্যপায়ীদের কানের অসিকলের মতো এরাও শব্দতরঙ্গ বহনে সাহায্য করে।

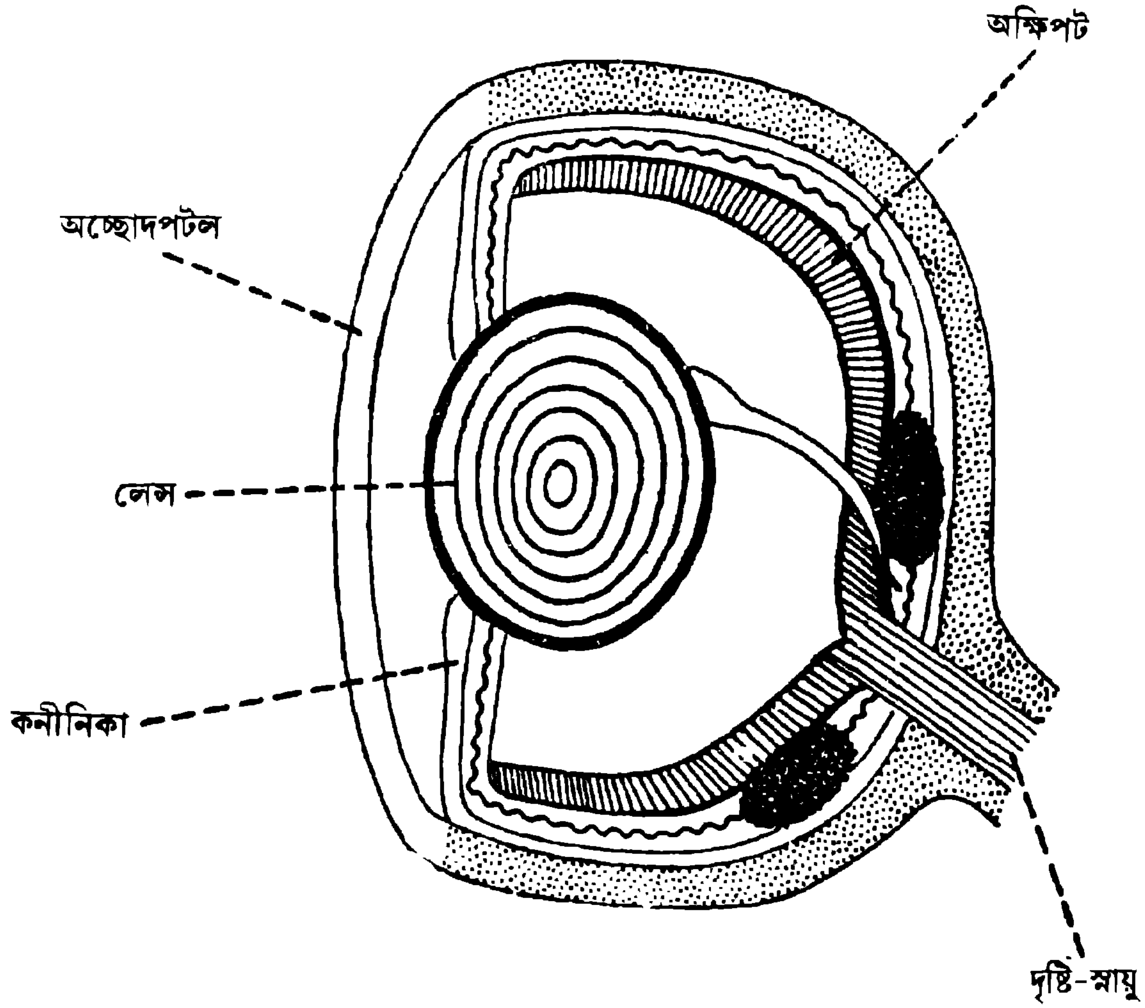
আরেকটি আগ্রহজনক রূপান্তর দেখা যায় শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য বায়ুস্থলীর ব্যবহারে। মাছেরা সাধারণত ফুলকো দিয়েই শ্বাস নেয়, তবে গরমকালে যখন জল নোংরা হয়ে যায় এবং তাতে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায় তখন কোনও কোনও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রজাতিতে হাওয়া থেকে অক্সিজেন নেওয়ার বিশেষ প্রত্যঙ্গ গজিয়ে ওঠে। এই ধরনের প্রত্যঙ্গের অন্যতম হল বায়ুস্থলী থেকে উদ্ভুত খাঁটি ফুসফুস-জাতীয় প্রত্যঙ্গ। আফ্রিকার ফুসফুস-মাছ প্রোটপটেরাস (Protopterus) ও দক্ষিণ আমেরিকার লেপিডোসাইরেন (Lepidosiren) ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার ফুসফুস-মাছ সেরাটোডাস (Ceratodus) হল এর সবচেয়ে পরিচিত দৃষ্টান্ত।

লক্ষ করার বিষয় হল—হাঙর, রে-জাতীয় মাছ আর ল্যামপ্রিদের বায়ুস্থলী নেই। ডেভোনিয়ান পর্যায় সবচেয়ে শুষ্ক ও উষর ভূতাত্ত্বিক পর্যায়গুলির অন্যতম; বিশ্বাস করা হয়, ওই পর্যায়েই উচ্চতর মেরুদণ্ডীদের অন্ননালী-সদৃশ ফুসফুস থেকে এক জোড়া থলের মতো উপবৃদ্ধির আকারে বায়ুস্থলীর উদ্ভব ঘটেছিল মিঠে-জলের মাছেদের শ্বাসক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য। শ্বাসপ্রশ্বাসই ছিল খুব সম্ভবত এর আদত কাজ। পরে যখন মাছেরা সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ল, তখন এই জোড়-বাঁধা প্রত্যঙ্গটি পিঠের দিকে মাঝামাঝি সরে এসে জলস্থৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করল।

তিন

মাছের জ্ঞানেন্দ্রিয়

অ্যামফিওক্সাস তথা Acrania অর্থাৎ 'মুণ্ডহীন জীব'দের মতো নিম্নস্তরের প্রাণীদের উপর মাছেদের সাফল্য এবং প্রথম মেরুদণ্ডী হিসাবে তাদের প্রাধান্যের কারণ হল তাদের দেহে বৃহৎ ও জটিল মস্তিষ্কসমেত একটি মুণ্ডের উদ্ভব ও সেখানকার 'প্রবেশপথ' স্বরূপ সুবিন্যস্ত কটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিকাশ। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি হল চোখ, কান আর নাক। স্পর্শেন্দ্রিয়ও খুবই বিকশিত। এ সব ছাড়াও তাদের চামড়ায় আছে একান্তভাবে জলচর জীবনের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো বিশেষ কিছু জ্ঞানেন্দ্রিয়।



চিত্র 11 : মাছের চোখ

দর্শনেন্দ্রিয়

সাধারণ লোকের কাছে মাছের সবচেয়ে লক্ষণীয় জ্ঞানেন্দ্রিয় হল তার চোখ—মাথার দু পাশে অবস্থিত সুস্পষ্ট, গোল বা ডিম্বাকার দুটি অঙ্গ। মাছের চোখ একেবারেই মেরুদণ্ডীর চোখ, তাই আমাদের চোখের সঙ্গে তার মিল আছে।

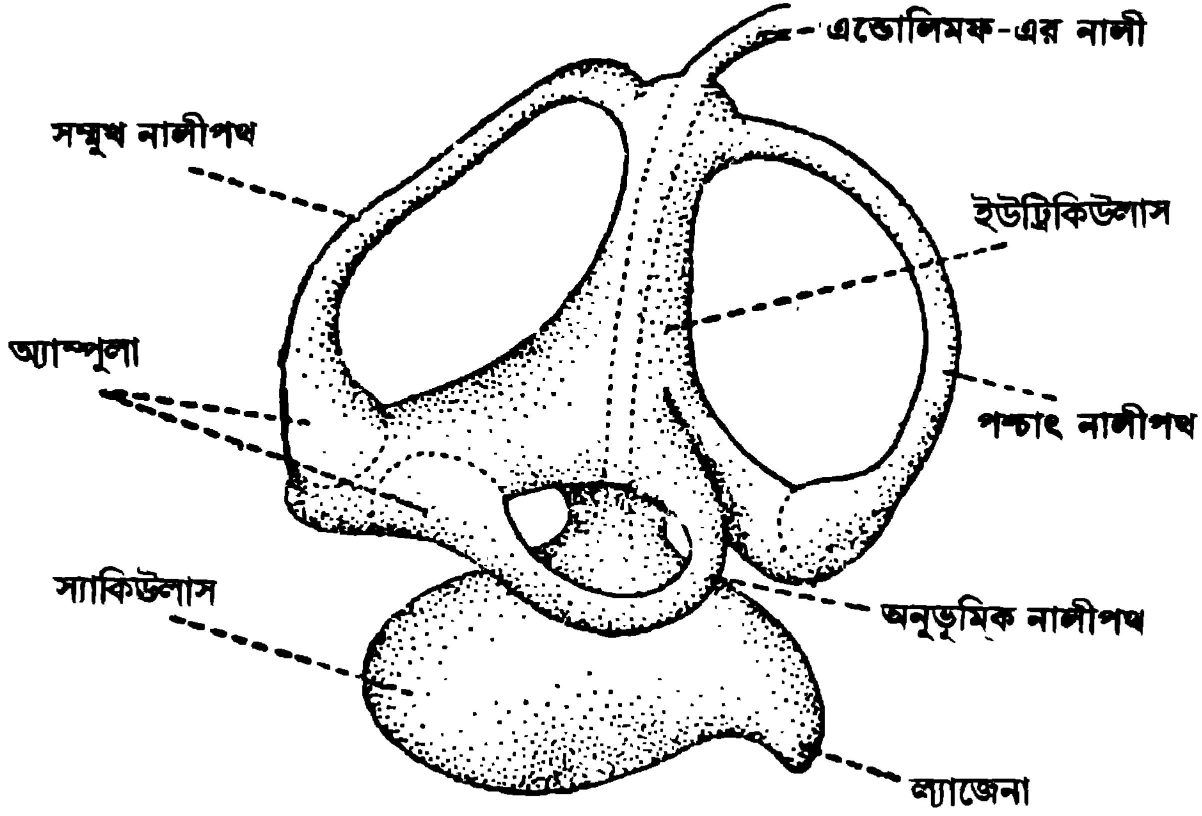
মাছের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল জলের তলায় দেখতে পারা এবং সেই কারণে তার চোখে সামান্য কিছু পার্থক্য আছে। লেন্স গোল, চ্যাপটা বা অবতল (concave) নয়; আর তার কনীনিকার পরদার সংকোচনক্ষমতা বিশেষ নেই। ফোকাস করার প্রণালীতেই প্রধান তফাত। স্তন্যপায়ীর চোখ ফোকাস করে লেন্সের বক্রতা হেরফের করে, আর মাছের চোখে ক্যামেরার কায়দায় কমে-বাড়ে লেন্স আর অচ্ছোদপটলের দূরত্ব। উচ্চতর মেরুদণ্ডীদের মতো দৃষ্টি যুগ্মনেত্র (binocular) নয়, একনেত্র (monocular)। মাছের চোখের আরও বৈশিষ্ট্য হল, তাতে চোখের ঢাকনা, পাতা আর অশ্রুগ্রন্থি নেই। কোনও কোনও হাঙরের চোখে একটা পাতলা চামড়ার ভাঁজ বা উপপল্লব (nictitating membrane) থাকে, যেটা তারা অক্ষিগোলকের উপর টেনে দিতে পারে। কোনও অস্থিবিশিষ্ট মাছের অক্ষিগোলকের কিনারাটা বেড়ে একটা মোটা অথচ স্বচ্ছ ঢাকনায় (adipose lid) পরিণত হয়। অক্ষিপট গঠিত দণ্ড আর শঙ্কুতে এবং কিছু কোমলাস্থিবিশিষ্ট জাত বাদ দিলে তা যে বর্ণসচেতন, নানা রঙের টোপ ব্যবহার করে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

মাছের চোখের কিছু আগ্রহজনক রূপান্তর এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকার অ্যানাব্লেপস (Anableps) মাছের চোখ মাথার উপরে উঁচিয়ে থাকে। একটা কালো রেখায় চোখ আড়াআড়ি ভাগ করা—উপরের অংশ বাতাসে দেখার উপযোগী, তলার অংশ জলে। ম্যুজিল কর্স্যুলা (Mugil Corsula) নামে উত্তর ভারতীয় এক রকম নদীর মাছেরও মনে হয় দ্বৈত দৃষ্টি আছে। মুখ জলের উপরিতলের সঙ্গে সমানভাবে রেখে, চোখদুটো উপরে জাগিয়ে এদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। মাটির তলা বা গুহার জলের বাসিন্দা যে সব মাছ, তাদের দেখার ক্ষমতা চলে গেছে, কারও কারও তো চোখই আর নেই। লক্ষ করার বিষয় হল, বাচ্চারা চোখ নিয়েই জন্মায়, সে চোখ তারপর অকেজো হয়ে যায়।

শ্রবণেন্দ্রিয়

মাছের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, তার বহিঃকর্ণ ও মধ্যকর্ণ নেই, শুধু অন্তঃকর্ণ বা ঝিল্লিপথটাই পূর্ণ-বিকশিত। মার্কিন জীবতত্ত্ববিদ পার্কারের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মাছ তার স্বজাতির শব্দ চিনতে পারে এবং বাতাসের চেয়ে জলের মধ্য দিয়ে আসা শব্দই বেশি স্পষ্টভাবে ধরতে পারে।

অন্তঃকর্ণের দুই অংশ: (1) একটি তরল পদার্থে ভরা থলে, যা আবার ইউট্রিকিউলাস (utriculus) ও স্যাকিউলাস (sacculus) এই দুই ভাগে বিভক্ত; ইউট্রিকিউলাসে তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালীপথ গিয়ে মিলেছে; (2) ইউট্রিকিউলাস থেকে বেরিয়েছে তার সঙ্গে যুক্ত স্যাকিউলাস, যার বন্ধ ডাইভার্টিকিউলাম (diverticulum)-এর নাম ল্যাজেনা (lagena)।



চিত্র 12: মাছের কান

স্তন্যপায়ীদের যা বৈশিষ্ট্য, সেই কক্লিয়া (cochlea) মাছেদের নেই। ইউট্রিকিউলাস আর তিন অর্ধবৃত্তাকার নালিপথ মিলে ভারসাম্যের অঙ্গ আর স্যাকিউলাস-ল্যাজেনা হল শোনার। চুনা পদার্থে কণা জমে তৈরি হওয়া ওটোলিথ (otolith) নামে পাথর বেশিরভাগ মাছের কানেই থাকে। পূর্ণাস্থি মাছে এই পাথরের সংখ্যা সাধারণত তিন—স্যাকিউলাসের পাথরকে বলে স্যাজিটা (sagitta), ল্যাজেনারটিকে অ্যাস্টেরিসকাস (asteriscus) আর ইউট্রিকিউলাসেরটিকে ল্যাপিলাস (lapillus)। হাঙর আর রে-জাতীয় মাছে ওটোলিথগুলো ছোট অসমান পাথরের সমাহার। ওটোলিথ ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে বলে বিশ্বাস —ঠিক স্ট্যাটোসিস্ট (statocyst) যে কাজটি করে কুচোচিংড়ি ও জেলিফিশের ক্ষেত্রে।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়

মাছের ঘ্রাণেন্দ্রিয় বাটির মতো সরল এক জোড়া অঙ্গ, উচ্চতর প্রাণীদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মতো তার সঙ্গে মুখের কোনও যোগাযোগ নেই। ইন্দ্রিয়টির একটি প্রকোষ্ঠ থাকতে পারে, যেমন হাঙর ও রে-জাতীয় মাছে; অথবা একটি পর্দা (septum) দিয়ে আলাদা-করা দুটি প্রকোষ্ঠ, যেমন পূর্ণাস্থি মাছে। প্রকোষ্ঠের ভিতরের দিকের দেওয়ালে শ্লৈষ্মিক এপিথেলিয়াম

(mucous epithelium) কয়েকটি ভাঁজ নিয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে, এটাই হল ঘ্রাণের জায়গা। ঘ্রাণস্থলীতে (olfactory sac) অবস্থিত ভালভগুলি রাসায়নিক কণাবাহী জলের আসা-যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে। মাছের শ্বাসক্রিয়ায় এই নাকের কোনও ভূমিকা নেই।

গোলমুখোদের একটি পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য হল শরীরের উপরের দিকে একটিমাত্র মধ্যক নাসারন্ধ্র—ল্যামপ্রির ক্ষেত্রে তা একটি বন্ধ নাসাস্থলীর (nasal sac) সঙ্গে যুক্ত। তবে হ্যাগফিশের নাসাস্থলীর একটি ছিদ্রপথ আছে তার মুখের তালুতে।

মাছের ঘ্রাণশক্তি যে বেশ তীক্ষ্ণ তা অনেক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। হাঙরের খ্যাতি তো তার তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির জন্য—তা দিয়ে দূর থেকে সে তার শিকার খুঁজে নিতে পারে। অন্ধ হাঙরকে নিয়ে পরীক্ষায় দেখা গেছে, শুধু গন্ধের সাহায্যেই সে খাবার খুঁজে পেতে সক্ষম। স্যামনের ঘ্রাণশক্তি বিস্ময়কর। ডিম পাড়তে সে যখন সমুদ্র থেকে মিঠে-জলে ফিরে আসে তখন কোন্ নদীতে সে জন্মেছিল তা চিনে নিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের ডাঃ হ্যাসলার 'স্যামনের ঘর চেনার প্রবৃত্তি' নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন, তাঁর মতে স্যামন তার ঘ্রাণশক্তির জোরেই তার জন্মের নদীনালাটি খুঁজে পায়।

দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণের ইন্দ্রিয় ছাড়াও স্বাদ ও স্পর্শের ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ করা যায়।

স্বাদের ইন্দ্রিয় সাধারণত থাকে জিভে, কিন্তু মাছেদের সত্যিকারের জিভ নেই। হাঙরের মতো কোনও কোনও মাছের কানকোর কঙ্কালে একটা মোচার আকারের বাড়তি অংশ থাকে, যা মুখের ঝিল্লির আশ্রয়স্বরূপ এবং যা দেখতে অনেকটা জিভের মতো। মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, ঠোঁট এবং শুঁড়ে থাকে বিশেষ সংবেদনশীল কোষের পুঞ্জ—এগুলো স্বাদ-কোরক (taste bud), যা দিয়ে স্বাদের ইন্দ্রিয় গঠিত।

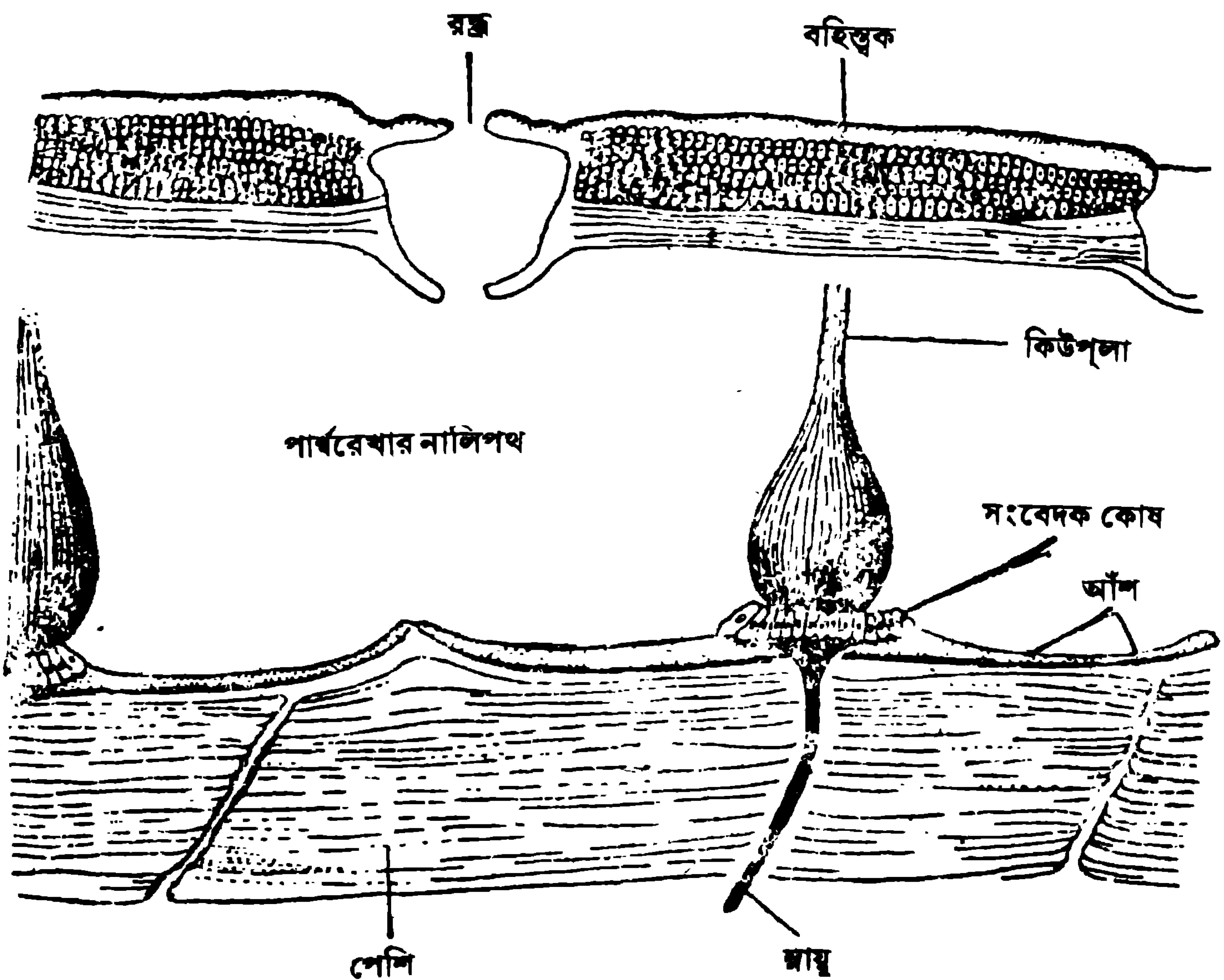
স্পর্শের ইন্দ্রিয় অত্যন্ত বিকশিত। গোঁফের মতো দেখতে শুঁড়গুলিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তবে মুখ আর তুণ্ডের চারপাশের চামড়াও স্পর্শচেতন। শুঁড় সব মাছে থাকবে এমন অবশ্য কথা নেই। ক্যাটফিশ জাতীয় মাছে, কিছু কিছু কার্পে এবং পূর্ণাস্থি মাছের আরও কয়েকটি বর্গে শুঁড় চোখে পড়ার মতো। তবে তারতম্যও প্রচুর—লম্বা বা বেঁটে, গোল বা চ্যাপটা, মসৃণ বা খরখরে। এগুলো থাকে মুখে, মাথার তলার দিকে এবং থুতনির কাছে। ক্যাটফিশদের মধ্যেই শুঁড়ের সবচেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত মেলে। দুই থেকে আটটি লম্বা গোঁফের মতো শুঁড় থেকেই এই জাতের মাছের ইংরেজি নাম হয়েছে ক্যাটফিশ। কোনও কোনও কার্পেরও শুঁড় থাকে, তবে তা খাটো ও সংখ্যায় কম। মহাসাগর ও গভীর সমুদ্রের মাছের শুঁড় অদ্ভুত আকার নেয়। সেগুলো অনেক লম্বা হতে পারে—মাছের দৈর্ঘ্যের প্রায় দেড়গুণ—এবং দেখতে লাগে ছিপসুতোর মতো। অনেক শুঁড়ের আবার নানা শাখাপ্রশাখা, দেখে মনে হয় যেন থুতনিতে লেগে-থাকা আগাছা। বিশিষ্ট ধরনের স্পর্শেন্দ্রিয়ের একটি লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত দেখা যায় 'সুতো-পাখনা' (threadfin, Polynemid) নামক গোষ্ঠীর সামুদ্রিক মাছগুলিতে। বুকের পাখনার পর্দা থাকে যে সব ডাঁটির উপর সেগুলো থেকে সামনের কয়েকটা ডাঁটি আলাদা হয়ে লম্বা সুতোর আকার নিয়েছে। ভারতীয় সুতো-পাখনাদের একটি জাতে বুকের পাখনার এই তন্তু সংখ্যায় বেশি, দৈর্ঘ্যেও গোটা মাছের চেয়ে বড়, দেখে তপস্বীর দাড়ির কথা মনে পড়ে বলে জাতটার চলতি নাম 'তপসে মাছ'।

অনেকটা মুখের স্বাদ-কোরকের মতোই স্পর্শেন্দ্রিয়েরও আসল অংশ হল বিশেষ সংবেদী (sense) কোষের পুঞ্জ।

ত্বকের বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয়

1. পার্শ্বরেখার জ্ঞানেন্দ্রিয় (Lateral line sense organs)

মাছের জীবন-পরিবেশের একটা সমস্যা হল জলের গুরুত্ব, চাপ ও স্রোতের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। মাছেদের একটি বিশেষ ধরনের ইন্দ্রিয় আছে যা, উভচরদের জলবাসী শূক-পর্যায় এবং জলের স্থায়ী বাসিন্দা কিছু বয়স্ক উভচর বাদ দিলে, প্রাণিজগতের আর কোথাও দেখা যায় না। সেটা হল রাইট (Wright)-এর নিউরোমাস্ট (neuromast)



চিত্র 13: অস্থিবিশিষ্ট মাছের পার্শ্বরেখা-ব্যবস্থায় নিউরোমাস্ট সমূহ (Grasse-এর অনুসরণে)

ইন্দ্রিয়ের পার্শ্বরেখা-ব্যবস্থা। এটা লক্ষ করার বিষয় যে প্রাচীনতম জীবাশ্মীভূত মাছেদের দেহেও এইসব ইন্দ্রিয়ের নিদর্শন দেখা যায়। তা থেকে বোঝা যায়, মাছের প্রথম উদ্ভবের সময় থেকেই তার ত্বকে জলীয় পরিমণ্ডলের উপযোগী বিশেষ গ্রাহক-ইন্দ্রিয় গড়ে উঠেছিল।

পার্শ্বরেখা-ব্যবস্থা হল শরীরের প্রত্যেক পাশের মাঝামাঝি চামড়ায় লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত একটি নালিপথ। কোনও কোনও অস্থিবিশিষ্ট মাছে এটাকে খালি চোখে দেখা যায় একটা পেন্সিলের দাগের মতো। সামনের দিকে, ফুলকোর কাছাকাছি, প্রত্যেকটি নালিপথ

আবার সূক্ষ্মতর নালিতে ভাগ হয়ে মাথার উপরে, পাশে ও তলায় এক সুনির্দিষ্ট জটিল নকশা তৈরি করে। নালিপথগুলির উৎপত্তি বহিস্ত্বকের কোষে, সেইসব কোষেই ওগুলো নিহিত থাকে। অধিকাংশ আদিম ধরনের মাছে নালিপথগুলো নেহাতই খোলা খাতের মতো; উন্নততর জাতে ওগুলো ঢাকা থাকে ত্বকের বহিঃস্তরের গভীরে। রে-জাতীয় যে সব কোমলাস্থিবিশিষ্ট মাছের আঁশ নেই তাদের পার্শ্বরেখা-ব্যবস্থা সহজেই দেখা যায়। ওদের জ্ঞাতি হাঙরদের বেলায় তা দেখতে হয় ধারাল ছুরি দিয়ে সাবধানে চামড়া সরিয়ে। পূর্ণাস্থি মাছেদের পার্শ্বরেখার নালিগুলির মধ্যে ধড়ের প্রধান দুটি নালি দেখা যায়, কিন্তু মাথার উপরকার নালিগুলি চামড়ায়-গজানো হাড়ে ঢাকা পড়ে গেছে। সব নালিই শ্লেষ্মায় ভরা, যার দরুন প্রথম দিককার জীবতত্ত্ববিদরা এগুলিকে নিছক শ্লৈষ্মিক নালি বলেই ভাবতেন। পরে ত্বকের আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় অনেকটা স্বাদ-কোরকের মতো কোষপুঞ্জের অস্তিত্ব ধরা পড়ল এবং আবিষ্কারকের নামে তাদের নাম হল রাইট-এর নিউরোমাস্ট ইন্দ্রিয়। এই নিউরোমাস্ট ইন্দ্রিয়গুলি নালি বরাবর নিয়মিত ব্যবধানে সাজানো এবং শ্লেষ্মায় সিঞ্চিত। এদের মধ্যে দু ধরনের কোষ থাকে; প্রথমত, বিশেষ ধরনের চর্মীয় গ্রাহক কোষ, এবং দ্বিতীয়ত, সাহায্যকারী কোষ। নিউরোমাস্টগুলো সপ্তম, নবম ও দশম করোটিক (cranial) স্নায়ুর সঙ্গে যুক্ত।

প্রধান পার্শ্বনালি ও মাথার উপনালি থেকে মাঝে মাঝে ছোট ছোট খাড়া দণ্ড বেরিয়েছে, যেগুলোর সূক্ষ্ম রন্ধ্র বাইরের দিকে খোলা। হাঙর ও রে-জাতীয় মাছে এগুলো সহজেই দেখা যায়। বিশ্বাস করা হয়, চারপাশের জল থেকে নিম্ন কম্পাঙ্কের স্পন্দন মাছের শরীরে লেগে শ্লেষ্মায় চাপ দেয় এবং নিউরোমাস্ট ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ করে তোলে। এই অভিঘাত স্নায়ু বেয়ে চলে যায় মস্তিষ্কে।

এই পার্শ্বরেখা-ব্যবস্থা কী কী বিশেষ কাজ করে? অনেক জীবতত্ত্ববিদ এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। কেবল জলচর মেরুদণ্ডীদের মধ্যেই তা দেখা যায় বলে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে, তা প্রাণীটির সঙ্গে জলীয় মাধ্যমের যোগাযোগ সাধনের উপায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই ইন্দ্রিয়গুলি তাপ, শব্দ, আলো, রাসায়নিক কণা, বিদ্যুৎ, লবণাক্ততা কিংবা সাধারণ জলচাপ বা তীব্র স্রোতে উত্তেজিত হয় না। একটিমাত্র উদ্দীপনায় তারা সাড়া দেয়, তা হল 'নিম্ন কম্পাঙ্কের স্পন্দন'। ডাচ প্রাণিতত্ত্ববিদ ডিইক্রাফ (Dijkraff) পরে অতি সূক্ষ্ম অসিলোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে তা প্রমাণ করেছেন। গত একশো বছরের পরীক্ষার ফলাফল থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে এই ইন্দ্রিয়গুলো নিম্ন কম্পাঙ্কের জলস্রোত টের পেতে সাহায্য করে এবং সেগুলো 'রিও-গ্রাহক' (rheo-receptor) ধরনের ইন্দ্রিয়। অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহে বা কোনও জিনিসের জলে পড়ার ফলে জলের উপরিতলে যে ঢেউ ওঠে তার স্পন্দন এই পার্শ্বরেখা-ব্যবস্থাকে সচকিত করে তোলে। জলের মধ্যে নড়াচড়া টের পাওয়ার এই ইন্দ্রিয় যে কেবল মাছেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য তাতে সন্দেহ নেই। এর ফলে মাছ অর্জন করেছে এক ধরনের 'জলেন্দ্রিয়'।

2. লোরেনৎসিনির অ্যাম্পুলা (Ampullae of Lorenzini)

লোরেনৎসিনির অ্যাম্পুলা গঠনে ও তন্ত্রগত বৈশিষ্ট্যে পার্শ্বরেখা-ব্যবস্থার নিউরোমাস্ট ইন্দ্রিয়গুলোর মতোই। অ্যাম্পুলা হল কমলার আকারের একটি অঙ্গ, তার ছয় থেকে আটটি

অংশ এবং একটি লম্বা বা খাটো নালি যার রন্ধ্র-মুখ বাইরের দিকে। কয়েক শো অ্যাম্পুলা একসঙ্গে জোট বেঁধে থাকে। হুলওয়ালা শঙ্করজাতীয় রে মাছে (Desyatis) মাথার তিনটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে এই রকম জোট দেখা যায়—(ক) চোখের উপরে, (খ) মুখের সামনে, (গ) ফুলকোর সামনে। হাঙরদের মধ্যে—যেমন স্কলিওডন (Scoliadon)-এ—শুধু দুটো জোট দেখা যায়, চোখের উপরে ও মুখের সামনে। অ্যাম্পুলাগুলো সপ্তম করোটিক স্নায়ুর সঙ্গে যুক্ত।

অ্যাম্পুলার নালিপথ শ্লেষ্মায় ভরা। এদের কাজ বিজ্ঞানীরা অনেক কাল বুঝতে পারেননি। এদের গঠন ও স্নায়ু-যোগাযোগ পার্শ্বরেখা-ব্যবস্থার মতো হওয়ায় আন্দাজ করা হত ওদের কাজও একই রকমের। ওদের কাজ যে অন্য কিছু হতে পারে, শারীরতত্ত্ববিদদের মনে এ সম্ভাবনা জাগে 1936 সাল নাগাদ। স্যান্ড (Sand) ও লোয়েনস্টাইন (Lowenstein) নামে দুই ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হাঙর আর রে-জাতীয় মাছেদের উপর অসিলোগ্রাফ নিয়ে তাড়িত-শারীরবৃত্তীয় (electro-physiological) পরীক্ষা চালান। প্রথম প্রথম তাঁরা অ্যাম্পুলার নালিতে এক স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দোবদ্ধ সক্রিয়তা লক্ষ করলেন। পরে তাঁরা মাছগুলোর উপর নানা ধরনের অভিঘাত প্রয়োগ করলেন। যেমন চাপ, লবণাক্ততা, জলপ্রবাহ, তাপ, শৈত্য, বিদ্যুৎপ্রবাহ ইত্যাদি। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে তাঁরা দেখলেন, এই ইন্দ্রিয়গুলো তাপমাত্রার তারতম্যে সাড়া দেয়। তবে আশ্চর্যের বিষয়, তাপে তাদের সক্রিয়তা কমে, শৈত্যে বাড়ে। তা ছাড়া তারা সবচেয়ে সজাগ 3°C থেকে 25°C তাপমাত্রার মধ্যে। ফলে তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, ইন্দ্রিয়গুলি তাপ-গ্রাহক যন্ত্র।

পরবর্তী বিজ্ঞানীরা এ সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এত গভীরে নিহিত ইন্দ্রিয় দিয়ে মাছের মতো ঠাণ্ডা রক্তের একটি প্রাণীর কী প্রয়োজন তাপ-নিয়ন্ত্রণ কিংবা তাপ-চেতনায় ? মারে (Murray) ও ডিইক্রাফ (Dijkraff) ১৯৬৭-তে আবার কিছু কোমলাস্থিবিশিষ্ট বা ইল্যাজমোব্র্যাংক (Elasmobranch) মাছ নিয়ে পরীক্ষা চালালেন। মাছগুলোর উপর প্রয়োগ করলেন নানা তীব্রতার বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা। পর্যবেক্ষণ থেকে তাঁদের বিশ্বাস হল, অ্যাম্পুলাগুলো অত্যন্ত বিদ্যুৎ-সচেতন—ফলে কাছাকাছি অন্য কোনও মাছের হৃৎস্পন্দনও ওরা টের পায়। তাপ বা শৈত্যের প্রতিক্রিয়া নেহাতই এর পার্শ্বফল।

1976 সাল নাগাদ সোভিয়েত রাশিয়ার পাভলভ ইনস্টিটিউটের এক দল রুশ বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখালেন যে মাছ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করার সময় পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রে যে রকম পরিবর্তন হয় সেই রকম চৌম্বকক্ষেত্রে পরিবর্তনেও লোরেনৎসিনির অ্যাম্পুলাগুলো সাড়া দেয়। সেই সাড়ার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থেকে মনে হয়, কার্যকর উদ্দীপনাটি হল মাছের শরীরের আড়াআড়ি চৌম্বকপ্রবাহে সৃষ্ট তড়িৎচৌম্বক বল। চৌম্বক উত্তরদিকের সঙ্গে যদি কেবল একটি বিশেষ কোণে কোনও কোনও গ্রাহক সাড়া দেয় তা হলে সেই বাড়তি দিক-চেতনার অর্থ, অন্তত তত্ত্বগতভাবে এই যে, মাছ তার দেহনিহিত কম্পাসটিকে দিক-নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করতে পারে। (New Scientist, মে ১৯৭৬)

মোটের উপর, লোরেনৎসিনির অ্যাম্পুলাগুলি চারপাশের মাধ্যমে তাপমাত্রা, জলস্রোত, বিদ্যুৎ এবং সম্ভবত চৌম্বক প্রবাহের তারতম্যে সাড়া দেয়। এই সব গবেষণালব্ধ তথ্য যে

আশ্চর্য সত্যের নির্দেশ দেয় তা এই যে, ত্বকের গভীরে নিহিত এবং পশ্চাৎ-মস্তিষ্ক (medulla oblongata) থেকে উদ্ভূত স্নায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত এই ইন্দ্রিয়গুলি জটিল চরিত্রের। কেবল কোমলাস্থি- বিশিষ্ট মাছে তাদের দেখা যায়, এটা আরও আশ্চর্যের কথা। এই ধরনের মাছের উদ্ভব যদি পূর্ণাস্থি মাছের আগে হয়ে থাকে তা হলে পৃথিবীর ইতিহাসের ডেভোনিয়ান পর্যায়ের অন্ধকার জলরাশিতে এই ইন্দ্রিয়গুলির বিশিষ্ট কোনও ভূমিকা ছিল।

3. কোটরেন্দ্রিয় (Pit Organs)

কোমলাস্থিবিশিষ্ট মাছেদের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ দ্বিতীয় ধরনের চর্মীয় জ্ঞানেন্দ্রিয়কে কোটরেন্দ্রিয় বলা চলে। হাঙরদের চামড়া ছোট ছোট প্ল্যাকয়ড আঁশে মোড়া, তাদের কোটরেন্দ্রিয়গুলি থাকে চামড়ার উপরিস্তর বা এপিথেলিয়াম (epithelium)-এ অগভীর গোল গর্তে, আঁশের খুদে খুদে দাঁত দিয়ে ঢাকা। এই ইন্দ্রিয়গুলোকে দেখা যায় মাথার উপরে ও তলার দিকে। রে-জাতীয় মাছের চামড়া আঁশবিহীন, এদের কোটরেন্দ্রিয়গুলি খালি চোখে পরিষ্কার দেখা যায়—চাকতির মতো শরীরের পিঠের দিকে মেরুদণ্ডের দু পাশে ফুলকোর কাছ থেকে লেজের মাঝামাঝি পর্যন্ত পর পর সাজানো। পেটের দিকে কোনও কোটরেন্দ্রিয় থাকে না।

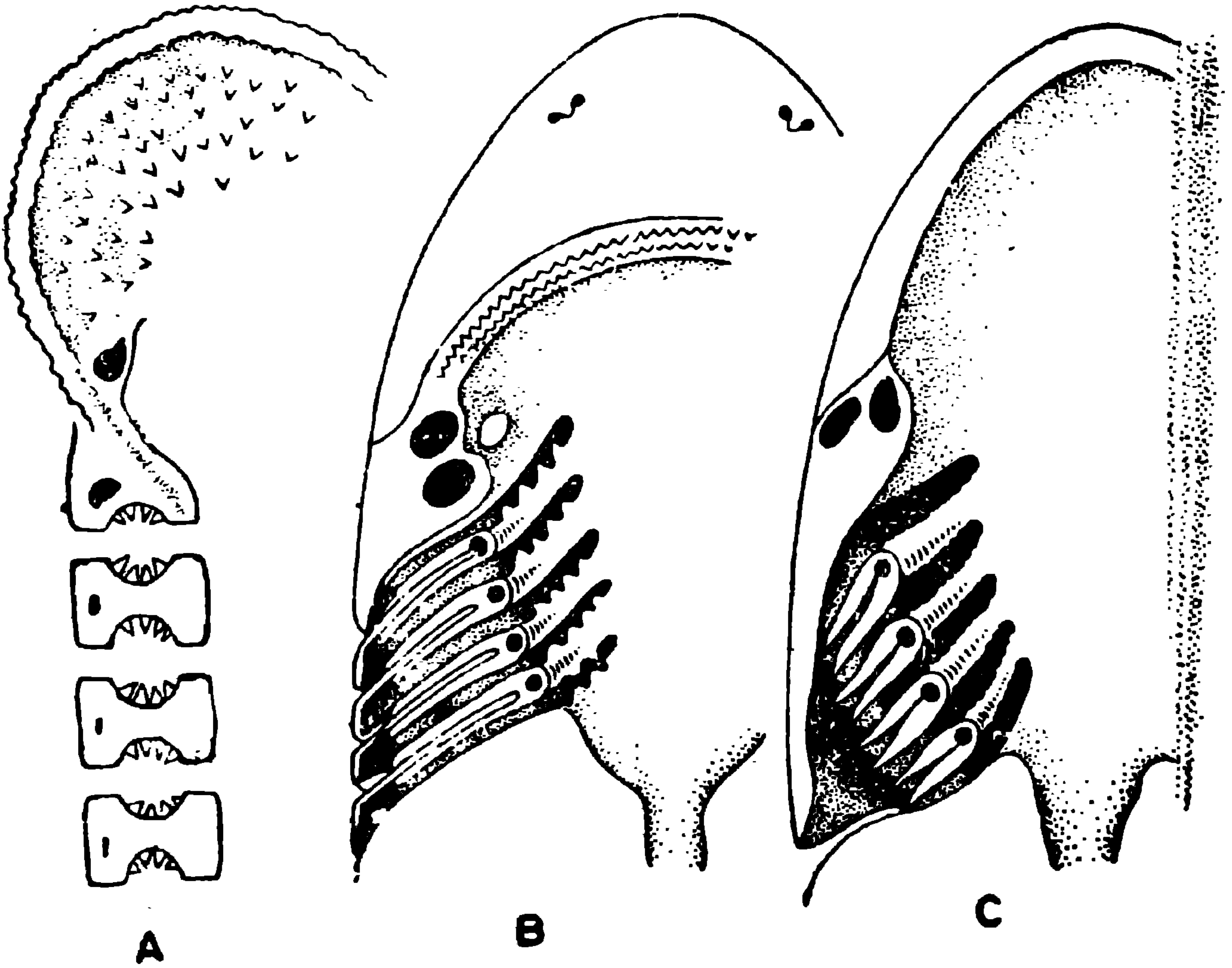
প্রতিটি কোটরেন্দ্রিয় খুঁড়ির মতো, গোল বা ডিম্বাকার, বহিস্ত্বকের এপিথেলিয়ামের রূপান্তরের ফলে উদ্ভূত। পার্শ্বরেখা-ব্যবস্থার নিউরোমাস্টের সঙ্গে এদের মিল আছে। প্রত্যেক কোটরেন্দ্রিয় দু সারি কোষে তৈরি—বাইরের সারি সহায়ক কোষের ; ভিতরের সারি সংবেদক কোষের, তাদের বুরুশের মতো পাতলা চুলের গুচ্ছ (cupule) দশম করোটিক স্নায়ুর পার্শ্ব-শাখার সূক্ষ্ম তন্তুর সঙ্গে যুক্ত।

কোটরেন্দ্রিয়ের কাজ কী ? দেখতে স্বাদ-কোরকের মতো হলেও অবস্থান থেকে মনে হয় না যে তার কাজ স্বাদ বা গন্ধ গ্রহণ। সম্ভবত এগুলো পার্শ্বরেখার নিউরোমাস্টের মতোই জলস্রোত ঠাহর করার অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়, যার দ্বারা মাছটি দূর থেকে স্পর্শের অনুভূতি পেতে পারে।

চার

মাছের শ্বাসযন্ত্র

মাছের একটি পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য হল, ফুলকো দিয়ে জলে-গোলা অক্সিজেনের সাহায্যে শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা। ফুলকো একটি পালকের মতো অঙ্গ, অক্সিজেন ও কার্বন ডায়ক্সাইড বিনিময়ের জন্য রক্তজালকে (blood capillaries) ভরা। অন্ননালিতে গলবিলের (pharynx) কাছাকাছি ওগুলো থাকে এবং মুখ দিয়ে টানা জলের প্রবাহে সিঞ্চিত হয়। কর্ডেটদের এটা একটা মৌলিক ধরন—অ্যামফিওক্সাস ও অন্যান্য অনুন্নত কর্ডেটদের ফুলকো-ব্যবস্থা গঠিত গলবিলে লম্বা একসার ফুটো দিয়ে, তার রক্তনালিকাময় দেওয়ালে জলস্রোতের অক্সিজেন শোষিত হয় ও জল বাইরে বেরিয়ে আসে।



চিত্র 14: নানা রকম মাছের নানা রকম ফুলকো

A: গোলমুখো; B: হাঙর; C: পূর্ণাস্থি মাছ (Lagler, Bardach ও Miller-এর অনুসরণে)

একেবারে প্রথম দিকের চোয়ালবিহীন মাছে ফুলকো-ছিদ্রের সংখ্যা কম ছিল এবং পাতার মতো ফুলকো-ফলকের গুচ্ছ ঘিরে বিকাশ লাভ করেছিল বিশেষ থলি, যেমন দেখা যায় আজকালকার ল্যামপ্রিদের মধ্যে। এই শ্রেণীর মাছেদের নাম দেওয়া হয় 'থলি-ফুলকো' (Marsipobranchii)। চোয়ালওয়ালা মাছের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ফুলকোর সংখ্যা আরও কমে এল। হাঙরের সাধারণত পাঁচটি ফুলকো থাকে, কদাচিৎ ছটা বা সাতটা। অস্থিবিশিষ্ট মাছেদের চারটে বা তারও কম। তা ছাড়া থলে বাদ পড়ে, ফুলকোগুলোকে ধরে রাখে একটি হাড়ের কাঠামো, যার নাম ফুলকো-খিলান।

অস্থিবিশিষ্ট মাছের সাধারণত গলবিল বা গলার প্রত্যেক পাশে চারটে করে ফুলকো থাকে। সেগুলো বাইরের দিকে একটা ঢাকনা অর্থাৎ কানকো (operculum) দিয়ে সুরক্ষিত। ফুলকোর সক্রিয় অংশ হল ফুলকো-খিলানে সম্মুখ ও পশ্চাৎ এই দুই সারিতে সাজানো সূক্ষ্ম, হালকা ও রক্তে-ভরপুর সুতো বা তন্তুর সমষ্টি। প্রতিটি তন্তুর দু পাশে বেরিয়ে থাকে আণুবীক্ষণিক পাতার মতো অংশ, সেগুলো বহিস্ত্বকের পাতলা কোষের একটি স্তর, রক্তজালকে ঠাসা এবং গ্যাস-ব্যাপনের (diffusion) পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। শরীরের যে রক্ত ফুলকোয় আসে তাতে অক্সিজেন থাকে না, ফুলকোর তন্তুগুলির মধ্য দিয়ে তা অক্সিজেন-সমৃদ্ধ জলের স্রোতের বিপরীতে বয়ে যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই 'বিপরীত স্রোতের বিনিময়'-এর প্রণালীটি খুবই ফলপ্রদ। ফুলকোর মধ্য দিয়ে রক্তস্রোতের অনুকূলে জল চালালে ফুলকো 10 শতাংশেরও কম অক্সিজেন টানতে পারে, যদিও এমনিতে তা টানে সাধারণত 15 শতাংশ।

পূর্ণাস্থি মাছের শ্বাসযন্ত্রের অংশগুলি হল—মুখগহ্বর, গলা বা গলবিল ও তার ফুলকোগুলি এবং ফুলকোর ঢাকনা বা কানকো। মাছ যখন নিশ্বাস নেয়, প্রথমে ফুলকো-খিলানের ঘেরগুলি প্রসারিত হয়, ফলে বড় হয় মুখ ও গলবিল। মুখ খুলে যায়, মুখগহ্বরে জলের ধারা ঢোকে, ফুলকোর ঢাকনা তার কিনারার পাতলা ঝিল্লির সাহায্যে চেপে বন্ধ করে রাখে ফুলকোর বাইরের দিকের ছিদ্রপথ। এই হল শ্বাস নেওয়ার পর্যায়। এর পরেই আসে শ্বাস ছাড়ার পর্যায়—মুখ বন্ধ হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে গলবিল সংকুচিত হয়ে জলকে ঠেলে দেয় ফুলকোর দিকে এবং সেখান থেকে কানকোর বাইরে। অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছে মুখ আর কানকোর এই পালা-করে খোলা ও বন্ধ হওয়া সহজেই দেখা যায়। মাছের এক জোড়া নাসাপথ আছে বটে, কিন্তু সেগুলোর সঙ্গে মুখের কোনও যোগ নেই, অতএব শ্বাসক্রিয়াতেও সেগুলো কোনও অংশ নেয় না। নিছক গন্ধের ইন্দ্রিয় ওগুলো।

ফুলকো থেকে রক্ত একটা বহির্মুখী (efferent) ধমনীব্যবস্থা বেয়ে আসে প্রধান পৃষ্ঠদেশীয় মহাধমনীতে (dorsal aorta) এবং তা সেই রক্ত ছড়িয়ে দেয় দেহের প্রত্যেক অংশে। অক্সিজেন ঢেলে দিয়ে রক্ত ফিরে আসে হৃৎপিণ্ডের সাইনাস ভেনোসাস (sinus venosus) নামক গ্রাহক-প্রকোষ্ঠে, তা অলিন্দের (auricle) সঙ্গে যুক্ত। অলিন্দ চাপ দিয়ে রক্তকে পাঠায় অতি-পেশল নিলয়ে (ventricle), তা আবার অন্তর্মুখী (afferent) ধমনী মারফত সে রক্ত পাঠিয়ে দেয় ফুলকোয়।

অন্য যে কোনও মেরুদণ্ডী প্রাণীর মতোই মাছের রক্তেও আছে প্লাজমা নামে তরল পদার্থ, তাতে ভাসে খুদে খুদে কোষ তথা লাল ও সাদা কণিকা। এগুলো গোলাকার ও

কেন্দ্রবিশিষ্ট (nucleated) কোষ, তাদের সাইটোপ্লাজমে (cytoplasm) থাকে হিমোগ্লোবিন নামে সেই আশ্চর্য পদার্থ যা এক রকম ভৌত-রাসায়নিক অবস্থায় অক্সিজেন শুষে নিতে ও অন্য অবস্থায় তা ছেড়ে দিতে পারে।

ফুসফুসওয়ালা মাছ! সোনার পাথরবাটির মতো শোনালেও এই অদ্ভুত ঘটনার কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এরাই হল ডিপনয় (Dipnoi) বা ডিপনিউস্টি (Dipneusti) শ্রেণীভুক্ত সেই বিখ্যাত 'ফুসফুস মাছ', যাদের সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। ফুলকোর অতিরিক্ত ওদের যে বিশেষ শ্বাসযন্ত্রগুলি থাকে, সেগুলো এবার আলোচনা করা যাক।

অস্ট্রেলিয়ার ফুসফুস মাছ নিওসেরাটোডাস (Neoceratodus)-এর তথাকথিত ফুসফুসটি হল পেটের এক ধার থেকে অন্য ধার পর্যন্ত বিস্তৃত এক বড়সড় থলে। তার ভিতরের গায়ে, উপর ও তলার দিকের মধ্যরেখা বরাবর চলে গেছে দুটি লম্বালম্বি তন্তুর পাড়, যেগুলো গহ্বরের মধ্যে খানিকটা বেরিয়ে থাকে। এই লম্বালম্বি পাড়দুটোর দু পাশ থেকে আড়াআড়ি পাড় (septa) বেরিয়ে ভিতরের গহ্বরটিকে একসারি 'অ্যালভেওলাই'-এ (alveoli) ভাগ করেছে, যেগুলো আবার সরু শিরতোলা জটিল জালে ভরা। ফুসফুসটি একটি বায়ুপথ (pneumatic duct) হয়ে ছোট একটি শ্বাসরন্ধ্র (glottis) মারফত খাদ্যনালির সঙ্গে যুক্ত। মুখের কিনারায় অবস্থিত বাহ্যিক নাসারন্ধ্রগুলি দিয়ে হাওয়া ঢুকে মুখের তালুর আভ্যন্তরীণ নাসারন্ধ্র দিয়ে বায়ুপথ বেয়ে প্রবেশ করে ফুসফুসে। হাওয়া টানতে নিওসেরাটোডাসকে উপরে ভেসে উঠতে হয়। খরার সময় ঘোলা জলে অন্য মাছ মরে গেলেও এরা বেঁচে থাকতে পারে।

আফ্রিকার ফুসফুস মাছ প্রোটপটেরাস (Protopterus) এবং দক্ষিণ আমেরিকার ফুসফুস মাছ লেপিডোসাইরেন-এ (Lepidosiren) মোটামুটি একই রকম রূপান্তর দেখা যায়। ডবল ফুসফুস—দুটো থলে দেহ-গহ্বর বা সিলম (coelom)-এর পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে অবসারণী পর্যন্ত বিস্তৃত। থলে দুটো সামনের দিকে মিলে একটি মধ্যক থলি বা উপপ্রকোষ্ঠ তৈরি করেছে, যা শ্বাসরন্ধ্র মারফত খাদ্যনালির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বায়ুপথের কাজ করে। শ্বাসরন্ধ্র নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যাসার্ধ বরাবর সাজানো এক প্রস্ত পেশির দ্বারা। এইসব মাছের একটা উপ-শ্বাসরন্ধ্রও (epiglottis) থাকে। প্রত্যেকটি ফুসফুসের ভিতরের গহ্বর বিভক্ত একসারি অনিয়মিত অ্যালভেওলাই-এ, কোনওটা বড় কোনওটা ছোট। অ্যালভেওলাই আবার ভাগ হয়েছে নালিকা বা টিউবুল-এ (tubule), যেগুলো শেষ হয়েছে গিয়ে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোপে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, এই দু জাতের ফুসফুস মাছ তাদের ফুসফুসের গঠনে ডাঙার মেরুদণ্ডীদের কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে।

প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ লক্ষ করেছে যে, কোনও কোনও মাছ জলের বাইরে বেঁচে থাকতে পারে। মিঠে জলের বানমাছ (Anguilla) রাত্রিবেলা ঘাসজমিতে চরে বেড়ায়। গ্রীষ্মমণ্ডলে সাপমুখোরা (Ophicephalids) ডাঙায় বাঁচতে পারে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলাভূমির গাছ-বাওয়া পার্চ মাছ (Anabas) জল ছেড়ে তালগাছ বেয়ে ওঠে বলে বিশ্বাস। প্রাচীনকালের প্রকৃতিবিদদের চোখে এরা ছিল আজব মাছ—বেশিরভাগ মাছ জল ছেড়ে কয়েক মিনিট না বাঁচলেও এদের বুঝি বা ডাঙায় দম নেওয়ার কোনও 'গোপন কৌশল' আছে।

এইসব মাছ ও তাদের জ্ঞাতিভাইদের শারীরস্থান অনুসন্ধান করে রহস্যের হদিশ মিলেছে। দেখা গেছে, জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসে এরা যাতে বাতাস টেনে নিতে পারে সে জন্য বিশেষ অঙ্গ ও ব্যবস্থা আছে এদের দেহে।

বানমাছ নিজের স্বাভাবিক পরিবেশ ছেড়ে অনেকক্ষণ বাঁচতে পারে এবং নতুন নদীনালার সন্ধানে রাত্রির ঠাণ্ডায় শিশিরভেজা জমি পাড়ি দিতে পারে। বিস্তর গবেষণার পর এখন প্রমাণিত হয়েছে যে ডাঙায় এদের শ্বাসপ্রশ্বাস চলে চামড়ার সাহায্যে। বানমাছের আঁশগুলো খুবই ছোট ও ভিতরে ঢোকানো হওয়াতে চামড়া প্রায় নগ্ন, উপরন্তু অত্যন্ত পিচ্ছিল ও রক্তনালিময়। এইসব কারণে ওই চামড়া একটি দক্ষ, অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্ররূপে কাজ করতে পারে।

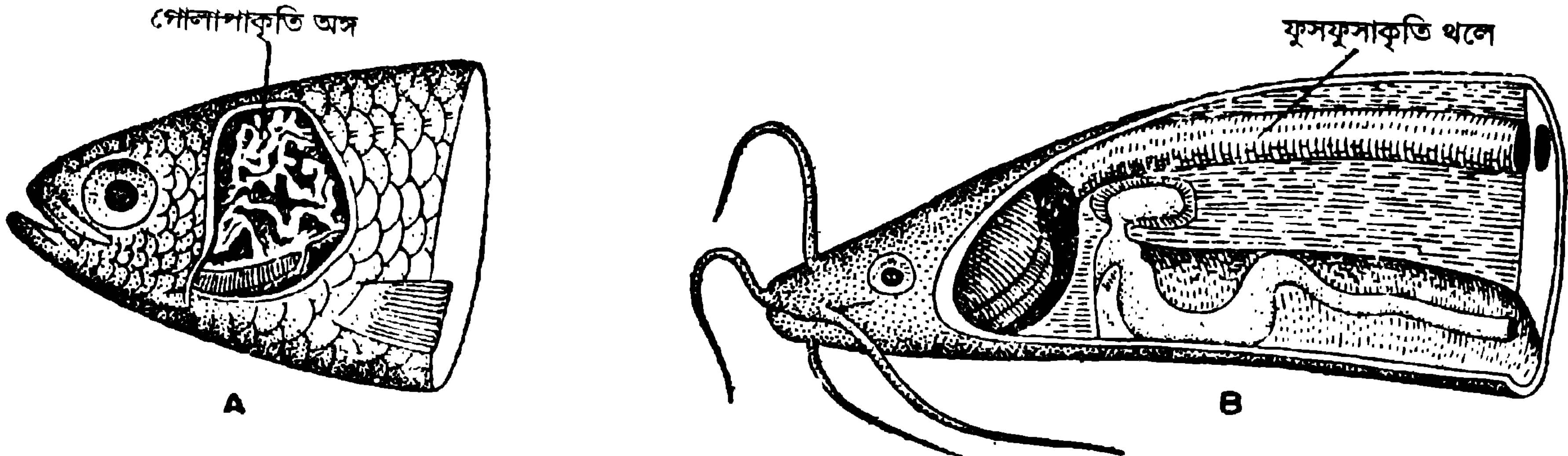
যে সব মাছের কোনও-না-কোনও ধরনের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকে তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই এই জাতীয় রূপান্তরগুলির স্বাভাবিক অবস্থান হল মুখ বা গলবিলের গহ্বর, কারণ তা শ্বাসপথে পড়ে। সাপমুখোদের মুখের তালুতে দু পাশে দুটি থলে গজায়। এই থলের মধ্যে থাকে অনেক অর্বুদ (nodule) বা পিড়কা (papillae), যেগুলোর বহুসংখ্যক রক্তনালি গ্যাস ধারণ ও ব্যাপনে (diffusion) সাহায্য করে। শোলজাতীয় এইসব মাছকে বলে 'মারেল' (Murrel)—মাছের বাজারে প্রায়ই দেখা যায় দোকানদাররা এদের মাটির পাত্রে রেখে 'জিওল মাছ' বলে বিক্রি করছে।

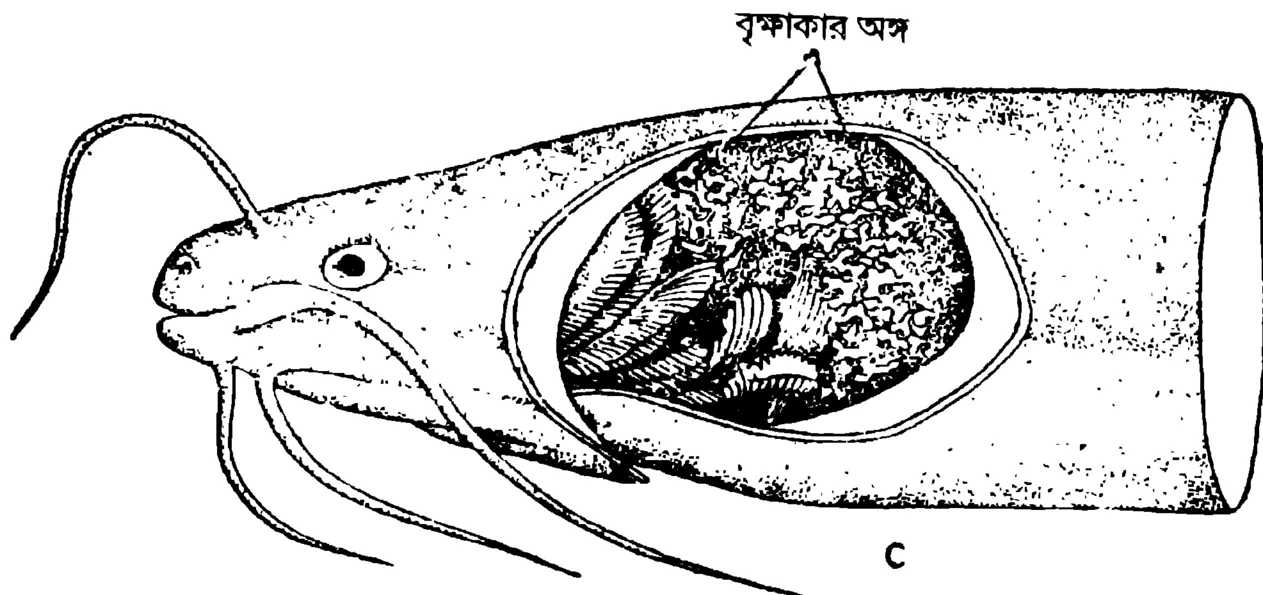
আমাদের পুকুর-ধানখেতের সুপরিচিত মাগুর (Clarias) মাছের দু-জোড়া অদ্ভুত অঙ্গ আছে। প্রত্যেক কানকোর তলায় ফুলকোর সঙ্গে যথাযথভাবে অবস্থিত থাকে এক জোড়া গাছের মতো অঙ্গ। এগুলো ফুলকো-খিলান থেকে গজানো বহিশ্চর্মীয় (epithelial) গুচ্ছ, রক্তনালির জালে ভরা। জল যতদিন পর্যাপ্ত থাকে এরা ততদিন জলাভূমিতেই বাস করে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে জল শুকিয়ে গেলে ফুলকো দিয়ে জল থেকে আর শ্বাস নেওয়া চলে না। তখন এরা উপরে উঠে এসে এই গাছের আকারের শ্বাসযন্ত্র দিয়ে কাজ চালায়।

এরই এক রূপভেদ দেখা যায় ভারতে শিংমাছে (Heteropneustes কিংবা Saccobranchus)। গলবিলের প্রত্যেক পাশে একটা ডাইভার্টিকুলাম (diverticulum) আছে যা দেহের দু পাশের মাংসপেশির ভিতর দিয়ে একটা ফাঁপা নলাকার ফুসফুসের আকারে প্রায় লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, তা বাতাস ধরে রাখতে ও রক্তনালিতে ছড়িয়ে দিতে পারে।

ত্রাংকেবার-এ ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লেফটেনান্ট ডালডর্ফ (Daldorf) তাঁর এক নিবন্ধে 1797 প্রথম গাছ-বাওয়া পার্চ (Anabus) মাছকে বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে নিয়ে আসেন। মাছের নাম হয়েছে এই প্রচলিত বিশ্বাস থেকে যে সে তালগাছ বেয়ে উঠে তাড়ি খায়। সে ডাঙা পেরোতে এবং হাওয়ায় শ্বাস অবশ্য নিতে পারে। সংশ্লিষ্ট অঙ্গগুলি গোলাপের আকারের, সমকেন্দ্রিকভাবে সাজানো অনেকগুলো ঢেউখেলানো ফলকে গঠিত। এগুলো গজায় ফুলকোর খিলান থেকে এবং এগুলোতে থাকে প্রচুর সূক্ষ্ম রক্তনালি।

অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের সবচেয়ে নিখুঁত রূপ দেখা যায় বিহার ও বাংলার নদীবাসী উত্তর ভারতীয় কুচিয়া বান (Amphipnous) মাছে। এর দেহ বানমাছের মতো হলেও বিজ্ঞানীরা একে সত্যিকারের বান বলে মনে করেন না। বেশিরভাগ সময় এরা থাকে পুকুরপাড়ের





চিত্র 15: মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র। A —গাছ বাওয়া পার্চ (Anabas) এর গোলাপাকৃতি অঙ্গ; B —শিং মাছের গলবিলে ফুসফুসের মতো থলে; C —মাগুর মাছের বৃক্ষাকার অঙ্গ (Norman-এর অনুসরণে)

ঘাসে। এর শ্বাসযন্ত্র হল ফুলকোর উপরে গলবিল থেকে গজানো একজোড়া থলে। ফুলকো অপরিণত, মাছটি স্পষ্টতই জলে শ্বাস নেওয়ার সব ক্ষমতা হারিয়েছে। ঘন ঘন জলের উপরে এসে এরা ব্যাঙের মতো এদের ফুসফুসে হাওয়া টেনে নেয়।

কিছু কিছু পূর্ণাস্থি মাছের বায়ুস্থলী বিশেষ পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। এ দেশে তার একটি লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হল ক্লিউপিড নামক বৃহৎ বর্গের অন্তর্গত সার্ডিন মাছের দূর জ্ঞাতি চিতল মাছ (Notopterus)।-এর বায়ুস্থলী খোলা (physiostomous), অনেকটা মেরুদণ্ডীদের ফুসফুসের মতো। এই বায়ুস্থলীর প্রধান অংশটি উদরগহ্বরে দুটি পাশাপাশি ক্লোমের মতো (bronchi-like) নলে ভাগ হয়ে গেছে; এদের প্রত্যেকটা উদর পেরিয়ে ধড়ের পেশির মধ্যে প্রসারিত হয়েছে এবং সেখানে আঙুলের আকারের প্রবর্ধন (process) সহ 14-15টা মুখবন্ধ থলে দেখা যায়। এই সব থলে আর প্রবর্ধনে প্রচুর রক্তজালকের সমাবেশ, দেখলে স্তন্যপায়ীদের ফুসফুসের ক্লোম ও অ্যালভেওলাই মনে পড়ে যায়। এ মাছ অনেকক্ষণ জলের বাইরে থাকতে পারে, কখনও-কখনও দু ঘণ্টা বা তারও বেশি। অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখলে মধ্যে মধ্যে তা ভেসে উঠে হাওয়া গেলে। পরীক্ষামূলকভাবে জলে ডুবিয়ে রেখে এবং বায়ুস্থলীর গ্যাস বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে যে চিতল প্রায় পুরোপুরিই হাওয়া থেকে শ্বাস নেয়। তার ফুলকো ছোট হয়ে গেছে, হাওয়া পেতে না দিলে সে দম বন্ধ হয়ে মারা যায়।

পাঁচ

বিদ্যুৎ, জৈব আলোক ও বিষ

বৈদ্যুতিক প্রত্যঙ্গ

মানুষ তার বুদ্ধিবলে মেঘ ও জলপ্রপাতের মধ্যে বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেছে। তারপর উদ্ভাবন করেছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জটিল যন্ত্রপাতি। জীবজগতে কিন্তু কেবল মাছেদের মধ্যেই তৈরি হয়েছে 'জীবন্ত ব্যাটারি'।

কোমলাস্থিবিশিষ্ট ও অস্থিবিশিষ্ট এই দুই দলেই, বৈদ্যুতিক প্রত্যঙ্গ আছে এমন মাছের দেখা মেলে। প্রথম দলে পড়ে টর্পেডো (Torpedo), নারসিন (Narcine) ও আস্ট্রেপ (Astrape)-এর মতো সুপরিচিত রে-জাতীয় মাছেরা ; আর দ্বিতীয় দলে উল্লেখ করা যায় আফ্রিকার মরমিরিড (Mormyrid), বৈদ্যুতিক বানমাছ, বৈদ্যুতিক ক্যাটফিশ ও স্টার-গেজারদের (Star-gazer) নাম।

টর্পেডোর বৈদ্যুতিক প্রত্যঙ্গ থাকে তার চাকতির মতো শরীরে দু পাশে দেহ-ঘিরে থাকা বুকের পাখনা ও মাথার মাঝখানে। সাদাটে রঙের, সহজে চোখে পড়ার মতো প্রতিটি প্রত্যঙ্গ খাড়া ছয়কোনা কয়েকটি চোঙ বা দণ্ডে তৈরি, যেগুলো পরস্পরের থেকে সংযোজক তন্তুকলার (connective fibrous) পর্দা দিয়ে আলাদা করা। প্রতিটি চোঙ এক রকম স্বচ্ছ জেলিজাতীয় পদার্থে ভরা এবং পাতলা পর্দার সাহায্যে কয়েকটি খোপে ভাগ করা ; প্রত্যেক খোপে থাকে একটা চ্যাপটা বৈদ্যুতিক ফলক। ফলকের এক পাশ থেকে এক গোছা সূক্ষ্ম স্নায়ু গিয়ে মিলেছে প্রত্যঙ্গটির সঙ্গে যুক্ত প্রধান স্নায়ুতে, অর্থাৎ নবম ও দশম করোটিক (cranial) স্নায়ুতে। ফলকের এই পাশটি ঋণাত্মক, আর উল্টো পাশটি ধনাত্মক। নিউ ইয়র্ক অ্যাকোয়ারিয়ামের মিস্টার কোটস (Coates) ও নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের মিস্টার কক্স (Cox) বৈদ্যুতিক রে মাছেদের নিয়ে প্রচুর পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন এবং অসিলোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে তাদের দেহ থেকে বেরোনো বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাপও করেছেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যুৎ নিঃসরণ 220 ভোল্ট, এক মিনিট পরে তা নেমে যায় 60 ভোল্টে। ডান-বাঁ দু দিকের প্রত্যঙ্গ থেকেই এক সঙ্গে বিদ্যুৎ বেরোয়।

বৈদ্যুতিক বানমাছ (Electrophorus)-এর লেজের প্রত্যেক পাশে থাকে দুটি প্রত্যঙ্গ। উপরেরটা বড় ; তলারটা ছোট, পায়ু-পাখনার গোড়ায়।

ক্যাটফিট (Malapterurus)-এর বৈদ্যুতিক প্রতঙ্গ জেলিজাতীয় পদার্থের একটি খাপের মতো—চামড়া ও পেশির তলায় পুরো ধড়টাকে মুড়ে রেখেছে।

মরমিরিডের বৈদ্যুতিক প্রত্যঙ্গগুলি অপরিণত (rudimentary), সেগুলো লেজের ডগার

দু পাশে থাকে। স্টার-গেজারের বৈদ্যুতিক প্রত্যঙ্গগুলি থাকে মাথায়—চোখের পিছনে একটা করে ডিম্বাকার থলি, তাতে অনেক বৈদ্যুতিক ফলকের এক জটিল স্তরবিন্যাস। প্রত্যঙ্গগুলি খুবই শক্তিশালী, তীব্র ও কঠিন 'শক' দিতে সক্ষম।

এই 'জীবন্ত ব্যাটারি'গুলো তৈরি হল কীভাবে? এখন জানা গেছে, এগুলো সাধারণত মাংসপেশির রূপান্তর। টর্পেডোর বৈদ্যুতিক ফলক তার পেশিতন্তুরই পরিবর্তিত রূপ। প্রত্যঙ্গগুলি ফুলকোর সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই ফুলকোর খিলান-সংলগ্ন পেশিগুলিই বৈদ্যুতিক ফলকে রূপান্তরিত হয়। বৈদ্যুতিক বানমাছ, স্কেট ও মরমিরিডের ক্ষেত্রে অবশ্য রূপান্তরিত হয়েছে লেজের পাশের পেশি। মজার ব্যাপার হল, স্টার-গেজারদের বৈদ্যুতিক প্রত্যঙ্গ তৈরি হয়েছে চোখের পেশি থেকে।

বৈদ্যুতিক বানমাছ ও তার আচরণ প্রথম বর্ণনা করেন ফ্রান্সের জে রিশের (J. Richer, 1729)। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী এই মাছের 'শক' একটা ঘোড়াকে ধরাশায়ী করে মেরে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। এই মাছ ইচ্ছামতো বিদ্যুৎ ছাড়তে পারে এবং মানুষ বা পশুর পক্ষে তা খোলা বিদ্যুৎবাহী তারের মতোই যন্ত্রণাকর ও বিপজ্জনক। চার বছর গবেষণার পর কোটস (1939) আরও কিছু আগ্রহজনক তথ্য যোগ করলেন। একটা ক্যাথোড রে অসিলোগ্রাফকে তার দিয়ে এই মাছের পেট ও পিঠের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে পর্দার উপর বৈদ্যুতিক ঘাতের লেখচিত্র নিলেন তিনি। সেগুলোর ফোটো তুলে আগে জানা বৈদ্যুতিক ঘাতের লেখচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেল, ভোল্টেজে তারতম্য ঘটলেও একটা গড়পড়তা আকারের বানমাছ 500 থেকে 600 ভোল্ট বিদ্যুৎ ছাড়তে পারে। তবে বারবার নিঃসরণ হলে ভোল্টেজ কমতে থাকে। বিদ্যুতের ঘাত ছোটে প্রচণ্ড বেগে—সেকেন্ডে প্রায় 1220-1520 মিটার। মানুষের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর মধ্যে ঘাত যে বেগে চলাচল করে তার চেয়ে এ প্রায় 12-15 গুণ বেশি।

এই অসাধারণ প্রত্যঙ্গ মাছের কী কাজে লাগে? নানা ঘটনা থেকে জানা গেছে, এদের 'শক' মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক, এমনকি প্রাণঘাতীও হতে পারে। মাছেরা এই 'শক' ব্যবহার করে অন্য মাছকে অজ্ঞান করে শিকার করার জন্য। আক্রমণ ছাড়া আত্মরক্ষার প্রয়োজনেও প্রত্যঙ্গগুলি কাজে লাগতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও ভারতে এদের সম্বন্ধে নানা কাহিনী শোনা যায়। অগভীর জলে বৈদ্যুতিক বানমাছের গা মাড়িয়ে নাকি কুপোকাত হয়েছে অনেক মানুষ ও পশু।

জৈব আলোক

তাপ ছাড়া আলো তৈরির ক্ষমতা বিরল ঘটনা, কিন্তু জীবজগতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা দেখা যায়। সুপরিচিত দৃষ্টান্ত হল ভারতের অতি সাধারণ জোনাকি পোকা আর দক্ষিণ আমেরিকার কিছু বোলতা। সমুদ্রেও এমন কিছু কিছু এককোষী জীব (Noctiluca), জেলিফিশ বা মেডুসি (medusae), চিরুনি-ফলক (comb-plate) বা টেনোফোর (ctenophore) এবং কবচী (Crustacean) প্রাণী দেখা যায় যারা আলো তৈরি করতে পারে। তবে জৈব আলোকের চরম উৎকর্ষ দেখা যায় মাছেদের মধ্যেই। গভীর সমুদ্রের অর্থাৎ 90-550 মিটার বা তারও তলাকার বেশিরভাগ মাছই প্রকারে-সংখ্যায়-উৎসে বিচিত্র সব আলোক প্রত্যঙ্গের অধিকারী।

কোমলাস্থিবিশিষ্ট মাছেদের মধ্যে স্কোয়ালিডি বর্গভুক্ত (Squalidae order) কোনও গভীর সমুদ্রের হাঙরের চামড়া জুড়ে ছড়ানো থাকে অনুপ্রভা (phosphorescent) নিঃসরক অসংখ্য ছোট ছোট সরল প্রত্যঙ্গ, ফলে তাদের দেহ থেকে বেরোয় এক ধরনের উজ্জ্বল সবুজ আভা।

অবশ্য অস্থিবিশিষ্ট মাছেদের মধ্যেই আলোক প্রত্যঙ্গের বৈচিত্র্য বেশি দেখা যায়। একটি সুপরিচিত উদাহরণ হল খোলা সমুদ্রের চওড়া-মুখো মাছ (Stomiatoidea)। এদের শরীরের প্রত্যেক পাশে থাকে দু সারি আলোক প্রত্যঙ্গ—এক সারি পেটে, অন্যটি উপরে, প্রথম সারির সমান্তরাল। সারি দুটি মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত এবং তাদের আলোক প্রত্যঙ্গগুলি সমপর্বীয় (metameric)। প্রতিটি প্রত্যঙ্গ বাটির আকারে সাজানো কিছু গ্রন্থিকোষে তৈরি। বাটির ভিতরটায় থাকে কালো রঙের একটা প্রতিফলক আস্তরণ, আর বাটির মুখে লেন্স ধরে রাখার ঝিল্লি। গ্রন্থিকোষ থেকে বেরোনো আলো এই লেন্সের মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়, তখন মাছের পেটের দু পাশে আলোর সারিগুলিকে দেখায় ঠিক জাহাজের আলোকিত জানালার সারির মতো।

লণ্ঠন মাছেরা (Myctophids) হল গভীর সমুদ্রের একটি গুরুত্বপূণ গোষ্ঠী। এদের আলোক প্রত্যঙ্গগুলি সংখ্যায় কম হলেও আকারে বড় ও উজ্জ্বল, শরীরের তলার দিকে সমানভাবে সাজানো, দেখতে এক-একটি জ্বলজ্বলে মণির মতো।

সবচেয়ে কৌতূহলজনক প্রশ্ন হল—প্রাণীদের আলো তৈরির কৌশলটা কী? প্রক্রিয়াটা যে জৈব-রাসায়নিক সে কথা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। ত্বক থেকে পিচ্ছিল জেলির মতো যে পদার্থ বেরোয় তাতে থাকে ফসফরাস, যার জারণে (oxidation) এক রকম আভা তৈরি হয়। আর আলোক-প্রত্যঙ্গের বেলায় গ্রন্থিকোষগুলি থেকে লুসিফেরিন (luciferin) নামে একটি পদার্থ ক্ষরিত হয় এবং লুসিফেরেজ (luciferase) নামক এনজাইমের সংস্রবে তা অক্সি-লুসিফেরিনে (oxy-luciferase) পরিণত হয়। তারই ফলে আলোর উৎপত্তি ঘটে।

আলোক-প্রত্যঙ্গ এই প্রাণীদের কী কাজে লাগে? একটা কাজ তো স্পষ্ট—সমুদ্রের গভীরে যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছয় না সেখানে আলো জোগানো। আবার কখনও—যেমন লণ্ঠন মাছের ক্ষেত্রে—আত্মরক্ষার জন্য শত্রুকে বিভ্রান্ত করতেও এগুলো ব্যবহৃত হয়। একই প্রজাতির প্রাণীদের পরস্পরকে চিনতেও হয়তো সাহায্য করে এগুলো—ডোরা বা ছোপের মতোই। ছিপ মাছ ও চওড়া-মুখোরা শিকারকে প্রলুব্ধ করতেও এই আলো ব্যবহার করে।

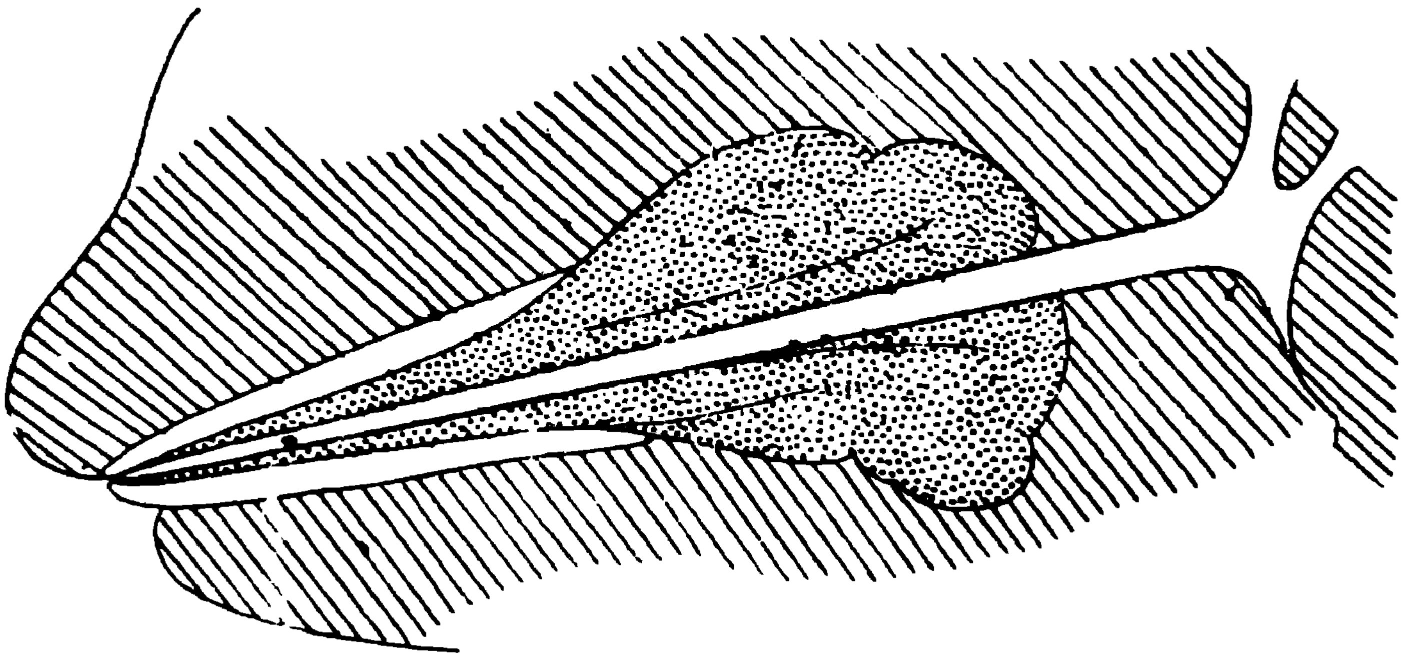
মাছের বিষ

মাছের বিষ দু রকমের। এক রকম বিষ তৈরি হয় বিশেষ গ্রন্থির দ্বারা, যেগুলো শরীরের নানা অংশে থাকতে পারে। অন্যটি দেহের মাংস থেকে নিঃসৃত হয়ে পুরো মাছটাকেই বিষাক্ত ও খাওয়ার অযোগ্য করে দেয়।

কোমলাস্থিবিশিষ্ট মাছেদের মধ্যে বিষ-গ্রন্থির বেশ কিছু দৃষ্টান্ত মেলে। সাধারণত এই সব গ্রন্থির সঙ্গে কাঁটা বা হুল থাকে—যেমন দেখা যায় কাঁটাওয়ালা ডগফিশ (Squalus) কিংবা ষণ্ডমুণ্ড হাঙরের (Heterodontus) শরীরে, কিছু কিছু রে, যেমন হুলওয়ালা রে (Trygon বা Dasyatis) ও ইগল রে (Myliobatis) এবং রাজা হেরিং (Chimaera) জাতীয় মাছে।

আদিকাল থেকেই জানা আছে, এই সব কোমলাস্থিবিশিষ্ট মাছের হুল ফুটলে দারুণ যন্ত্রণা ও প্রদাহের সৃষ্টি হয়। প্রথম প্রথম সন্দেহ করা হত, এর জন্য দায়ী কাঁটার গায়ে লেগে-থাকা শ্লেষ্মা। রোম দেশীয় বৈজ্ঞানিক প্লিনি দায়ী করেছিলেন আঘাতের পরবর্তী জীবাণু দূষণকে। এখন জানা গেছে, কাঁটার সঙ্গে বিষ-নিঃসরক বিশেষ কিছু চর্মগ্রন্থি যুক্ত থাকে। এই গ্রন্থিগুলো প্রায়ই থাকে কাঁটার গোড়ায়, তবে হুলওয়ালা শঙ্করজাতীয় মাছের বিষগ্রন্থি থাকে তার লেজের কাঁটার দু পাশের খাতে। শিকারের দেহে কাঁটা বিঁধলে সেই খাত বেয়ে বিষ ক্ষতস্থানে ঢুকে ব্যথা ও অসাড়তার সৃষ্টি করে।

অস্থিবিশিষ্ট মাছেদের মধ্যে ক্যাটফিশ, তাঁতিমাছ (weavers), বৃশ্চিক মাছ (scorpion fish) ও ব্যাংমাছের বিষযন্ত্র সুপরিচিত। ম্যাড টম (Noturus) বলে উত্তর আমেরিকার ক্যাটফিশের বুকের প্রতিটি পাখনার বাইরের ডাঁটিটি রূপান্তরিত হয়েছে শক্ত চ্যাপটা কাঁটায়, তার এক দিকে বা দু দিকেই করাতের মতো দাঁত এবং গোড়ায় একটি থলি যাতে বিষ থাকে বলে বিশ্বাস। তাঁতিমাছের (Trachinurus) কাঁটা থাকে কানকোয়; চামড়ায় ঢাকা, শুধু আগাটা থাকে বেরিয়ে। কাঁটার গায়ে দু পাশে দুটি গভীর খাত, সেই খাতের দু-পাড় জুড়ে গ্রন্থিকলা। কোনও নালি নেই, তাই ধরে নেওয়া হয় বিষগ্রন্থি ফেটে বিষ এমনিই ছিটকে বেরোয়। এই বিষ মারাত্মক, তীব্র জ্বালা-যন্ত্রণা ও বুক-ধড়ফড়ানির সৃষ্টি করে, এমনকি অজ্ঞানও করে দিতে পারে। ডাঃ ইভান্স প্রাণীদের বিষ ও বিষযন্ত্র নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন; তাঁর মতে 5% পটাশ পারম্যাঙ্গানেটের দ্রবণ (Condy's fluid) কয়েক মিনিট ক্ষতস্থানে ইঞ্জেকশন করলে সঙ্গে সঙ্গে আরাম হয় ও প্রদাহ বন্ধ হয়। মাছেরা তাদের হুল সাধারণত আক্রমণের জন্য ব্যবহার করে না; করে উত্ত্যক্ত বা আক্রান্ত হলে কিংবা পায়ে চাপা পড়লে।



চিত্র 16: তাঁতিমাছের (Trachinurus) কাঁটা ও তার দু পাশে বিষগ্রন্থি (নরম্যান অনুসরণে)।

দ্বিতীয় ধরনের বিষ মাছকে বিষিয়ে মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক করে দেয়। সবাই জানেন, উষ্ণ জলবায়ুতে মাছ পচে গিয়ে খাদ্য-বিষণ ঘটাতে পারে। তা বাদেও বেশ কিছু বিষাক্ত মাছ প্রশান্ত, অ্যাটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরে বাস করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ব্যারাকিউডা (Barracuda), টিউনা ও ম্যাকেরেল ; এরা সবাই তলদেশে চরে বেড়ায়। এদের কারও কারও বিষ জীবাণুঘটিত নয় এবং সবচেয়ে মারাত্মক যে কটি বিষ আজ অবধি পাওয়া গেছে সেগুলোর অন্যতম। এ বিষের নাম সিগুয়া টেরা (Cigua tera)। বিজ্ঞানীরা এর রাসায়নিক চরিত্র ও প্রতিষেধক আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন। গবেষণা থেকে অনুমান করা হচ্ছে, মাছের খাদ্য প্ল্যাংকটন (plankton) যে আণুবীক্ষণিক ডায়নোফ্ল্যাজেলাটা (Dinoflage-llata) নামক এককোষী প্রাণীদের দ্বারা গঠিত, তারাই এ বিষের উৎস।

এই বিষ বমি-বমি ভাব, বমি, দাস্ত, চুলকানি ও অসাড়তা ঘটায়, সেই সঙ্গে কখনও কখনও রক্তচাপ ও হৃৎস্পন্দনের অবনতি। লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন সময় লাগতে পারে। শিকার করা মাছে বিষ নির্ণয়ের জন্য মার্কিন বিজ্ঞানীরা একটি বিশ্লেষক-সরঞ্জাম আবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলির যে সব অধিবাসী প্রোটিনের জন্য প্রধানত মাছের উপর নির্ভরশীল তাদের পক্ষে সেটা হবে এক আশীর্বাদ। পাফার (Puffer) জাতীয় মাছেদেরও কোনও কোনওটা বিষাক্ত বলে বিশ্বাস করা হয়। 'তেলা মাছ' বা 'জোলাপ মাছ' (Ruvettus pretiosus) খুব বিপজ্জনক ; খেলে, শোনা গেছে, হাত-পা-জিভের অসাড়তা, বুকে-পিঠে ব্যথা, সার্বিক দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়।

ছয়

প্রজনন ও সন্তানপালন

অধিকাংশ মাছে, পাখি বা স্তন্যপায়ীদের মতো, স্ত্রী-পুরুষে কোনও বাহ্যিক প্রভেদ চোখে পড়ে না। এ ছাড়া জলচর হওয়ার কারণে তারা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের আওতাতেও আসে না। তাদের প্রজননের বিষয়কে ঘিরে তাই অজস্র কল্পকথা আর কিংবদন্তি। প্রখ্যাত ছিপশিকারি ইজাক ওয়ালটন (Izaak Walton) জানিয়েছিলেন, ওরা বংশবৃদ্ধি করে স্বতোজনন (spontaneous generation) প্রক্রিয়ায়। ওপিয়ান-এর (Opian) মতে তাদের সন্তান জন্ম নেয় বাপ-মায়ের শ্লেষ্মা থেকে। অ্যারিস্টটল আবার বিশ্বাস করতেন, স্ত্রী-মাছ পুরুষ-মাছের বীর্য গিলে ফেলার পর জননকোষগুলি কোনওভাবে মিলিত হয় তার দেহের ভিতরে। আরও অদ্ভুত সব ধারণা প্রচলিত ছিল বানমাছকে নিয়ে, তাদের প্রজননের বিষয়টাকে তাদের প্রব্রজনের (migration) সঙ্গে যুক্ত করে।

প্রাণিবিদ্যার অগ্রগতির ফলে শিগগিরই এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে মাছেদের মধ্যেও লিঙ্গভেদ আছে। তাদের জননাঙ্গ দু রকমের—স্ত্রীদেরটা ডিম্বাশয় আর পুরুষদেরটা শুক্রাশয়। অঙ্গগুলি সাধারণত লম্বাটে, থাকে জোড়ায়-জোড়ায়, বৃক্কের কাছে। ডিম্বাশয় দুটি গোলাপি বা হলদেটে রঙের, দানাদার। প্রজননঋতুতে এগুলো বেড়ে ওঠে, ডিম্বকোষগুলিও বেড়ে গিয়ে দেখতে হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার দানার মতো। পরিণত ডিম্বকোষগুলি ডিম্বনালি বেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে একটি বিশেষ ছিদ্রপথ কিংবা বৃক্কনালির প্রান্তবর্তী ছিদ্রপথ দিয়ে। অধিকাংশ অস্থিবিশিষ্ট মাছের স্থায়ী ডিম্বনালি থাকে না। পরিপক্ব ডিম্বাশয় ফেটে ডিম্বকোষগুলি মূল দেহগহ্বরেই ঝরে পড়ে এবং সেখান থেকে সাময়িক জনননালি বেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। শুক্রাশয়গুলি আরেকটু ছোট, ফিকে ও মসৃণ, তবে ডিম্বাশয়ের মতোই বৃক্কের কাছাকাছি থাকে। প্রত্যেক শুক্রাশয় থেকে একটি সরু নল গিয়ে মিলেছে পায়ুর কাছাকাছি জননদ্বারে।

প্রাণীদের—যেমন পাখি ও কিছু স্তন্যপায়ীর—প্রজননক্রিয়ার অঙ্গ হল পূর্বরাগ, লাস্য ও স্ত্রী-পুরুষের জোড়-বাঁধা। মাছেদের মধ্যে কিন্তু এ ব্যাপারটা বিরল। বেশিরভাগ মাছ, বিশেষত যেগুলি বড় বড় ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায়, এলোপাতাড়ি বংশবৃদ্ধি করে এবং তাদের শুক্র ও ডিম্বকোষগুলি মিলিত হয়ে ভ্রূণকোষ (zygote) গঠন করে। এ হল বাহ্যিক নিষেক (external fertilization)—পক্ষান্তরে উচ্চতর প্রাণীদের নিষেক আভ্যন্তরীণ, তাদের ডিম্বকোষ তাদের দেহের জননতন্ত্রের মধ্যেই নিষিক্ত হয়। নিষেক যেখানে বাহ্যিক এবং ডিম বা সন্তান যেখানে বাপ-মায়ের যত্ন পায় না, মৃত্যুহার সেখানে বেশি হতে বাধ্য। তবে প্রকৃতিও সে ক্ষেত্রে মোটামুটি একটা প্রতিকার করে বিপুল সংখ্যায় ডিম উৎপাদন করে। কড, স্যামন বা প্লেইন-এর মতো সাধারণ মাছও প্রত্যেক প্রজননঋতুতে আড়াই লাখ থেকে পাঁচ লাখ ডিম পাড়ে।

মাছেদের ডিম পাড়ার বিশেষ মরসুম আছে কি? কোন্ বয়সে তারা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে? এমন অনেক প্রশ্নই লোকের মনে জাগে। মাছের ডিম পাড়ার সময় ও পর্যাবৃত্তি (periodicity) স্থানভেদে ভিন্ন হয়, তা জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। ইউরোপে দেখা গেছে, অনেক ভক্ষ্য মাছ বৎসরের প্রথমার্ধে বংশবৃদ্ধি করে থাকে। প্লেইস-এর (Pleuronectes) ডিম পাড়ার সময় জানুয়ারি থেকে এপ্রিল; নর্থ সী-র কড-এর (Gadus) ফেব্রুয়ারি থেকে মে; আর বাঁশপাতি বা সোলিয়ার (Solea) এপ্রিল থেকে জুলাই।

ভারতে অধিকাংশ কার্প এবং ক্যাটফিশ বর্ষাকালে বা তার ঠিক আগে বংশবৃদ্ধি করে। বর্ষার সূচনা অনুযায়ী সামান্য স্থানগত তারতম্য ঘটে। যেমন ভারতের পূর্বাঞ্চলের কার্প ও ক্যাটফিশেরা জুন-জুলাই-অগস্টে ডিম পাড়লেও উত্তরাঞ্চলে মরসুমটা শুরু হয় জুলাইয়ে আর চলে সেপ্টেম্বর অবধি।

বাংলার ইলিশ বংশবৃদ্ধি করে সেখানকার বর্ষাকালে অর্থাৎ জুন থেকে অগস্টে, কিন্তু ওড়িশায় জুন-জুলাইয়ে। চিতল ডিম পাড়ে জুন থেকে অগস্টে।

অ্যানবাস (Anabas), মাগুর, শিং, শোল ইত্যাদি মিঠে জলের মাছও বর্ষাতে ডিম পাড়ে।

মাছেরা যৌন-পরিণতি লাভ করে নানা বয়সে। কেউ এক বছরেই বংশবৃদ্ধি করতে তৈরি হয়ে যায়, কেউ বা দুই বা তিন বছরে। আগেই বলা হয়েছে, স্ত্রী বানমাছ ডিম দিতে পারে দশ-এগারো বছর হলে—যেটা মাছের নিম্ন স্তরের জীবের পক্ষে ব্যতিক্রম।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মাছেরা প্রধানত ডিম্বপ্রসূ (oviparous), তবে তাদের মধ্যে কিছু শিশুপ্রসূ (viviparous) গোষ্ঠীও আছে যারা সরাসরি সন্তান প্রসব করে। কোনও কোনও জাতের হাঙর এবং রে আর কিছু অস্থিবিশিষ্ট মাছ এ ধরনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এদের মধ্যে লিঙ্গ-দ্বিরূপতা (sexual dimorphism) প্রকট।

হাঙরের জননতন্ত্রে থাকে দুটি জরায়ু, প্রতিটিতে সাত আট বা তারও বেশি সন্তানের স্থান হতে পারে। নিষেক ডিম্বনালিতে ঘটে, সন্তান বৃদ্ধি লাভ করে জরায়ুতে, সেখানে তাদের পুষ্টির বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ভ্রূণের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে নিষিক্ত ডিমের কুসুম খরচ হয়ে যায় এবং কুসুমের থলিটি তারপর জুড়ে যায় জরায়ুর ভিতরের দেওয়ালের সঙ্গে আর ভ্রূণগুলো ঝুলে থাকে সেই থলির ডগা থেকে। বন্দোবস্তটা অনেকটা স্তন্যপায়ীদের জরায়ুর ফুলের (placenta) মতোই—এই থলি দিয়েই পুষ্টি রক্তনালিতে প্রবেশ করে। রে-দের জরায়ুর ভিতরের দেওয়ালে প্রচুর রক্তনালিসম্পন্ন তন্তু (filament) গজায়, সেগুলো থেকে এক রকম ঘন পুষ্টিদায়ী তরলপদার্থ বেরোয় এবং তা কুসুমস্থলীর রক্তনালিতে শোষিত হয় অথবা ভ্রূণের ফুলকো-দ্বারে বা মুখপথে সঞ্চালিত হয়।

অস্থিবিশিষ্ট মাছেদের মধ্যে শিশু প্রসব বিরলতর। তবু দাঁতাল কার্প (Cyrinodonts), উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের সার্ফ মাছ (Embiotide) এবং ব্লেনিদের (Blennies, Blennoidae) মধ্যে ব্যাপারটা দেখা গেছে। ডিম্বস্থলীতে থাকার সময়েই ডিম নিষিক্ত হয় ও সেখানেই বিকাশ লাভ করে। ভ্রূণের পুষ্টি আসে কুসুমস্থলী দিয়ে কিংবা ডিম্বস্থলীর গায়ের বিশেষ নিঃসরণ থেকে।

এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই সব নিম্নস্তরের জীব যখন লক্ষ লক্ষ ডিম পেড়ে

সেগুলো জল-হাওয়ার কৃপায় সমর্পণ করে, তখন তাদের মধ্যে বাৎসল্যের বুঝি কোনও স্থান নেই। সাধারণভাবে তাই। তবে বাপ-মা সন্তানের যত্ন নিচ্ছে, এমন দৃষ্টান্তও বেশ কিছু আছে।

সবচেয়ে আদিম হল বাসা বানানোর অভ্যাস। যেমন স্যামন মাছ নদীর বালুকাময় তলদেশে অতি সাধারণ একটি গর্ত খোড়ে। কখনও কখনও বাবা বা মা (সাধারণত বাবা) পাহারাও দেয়। আফ্রিকার কাদা মাছ (Protopterus) বা ফুসফুস মাছ কাদায় গর্ত খোড়ে, ঝাঁজি-ঘাসের আড়ালে। এখানেই স্ত্রী মাছ ডিম পাড়ে, এটাই হয় বাচ্চাদের বাসা। বাসা বানানো আর ডিম পাহারা দেওয়ার পুরো দায়িত্ব পুরুষ মাছের। সে চারদিকে সাঁতরে চোর-ডাকাত তাড়িয়ে বেড়ায় এবং একই সঙ্গে বাসার ডিম ও শূককীটদের জন্য সেখানকার জল বায়ুপূর্ণ করে রাখে।

তিন-কাঁটাওয়ালা স্টিকলব্যাক-এর (Gasterosteus) বাসা পাখির বাসার মতো জটিল। পুরুষটি দিনের পর দিন খেটে গাছগাছালির টুকরো আঠা দিয়ে জোড়ে—আঠাটা তার বৃক্কের এক রকম বিশেষ নিঃসরণ বলে জানা গেছে। তারপর সে বেরোয় স্ত্রীর খোঁজে, তার মন জয় করে তাকে আমন্ত্রণ করে আনে তার বাসায়। স্ত্রী মাছ সেখানে কটি ডিম পাড়লে সে সেগুলো নিষিক্ত করে দিয়ে বেরোয় আরেক স্ত্রীর খোঁজে। এই চলতে থাকে যত দিন না তার বাসা নানা স্ত্রীর ডিমে বোঝাই হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটি ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে বাচ্চারা বাসা ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে সেখানে পাহারা দেয়।

যাঁরা শখ করে মাছ পোষেন তাঁদের কাছে লড়াকু বেটা (Betta) সুপরিচিত। এই মাছ অসাধারণ রকমের বাসা বানায়, ফেনা দিয়ে। পুরুষ মাছ ফুঁ দিয়ে বুদ্বুদ তৈরি করে এবং মুখের শ্লেষ্মা দিয়ে সেগুলো জোড়ে। ক্রমে তা এক ভাসমান গম্বুজের আকার ধারণ করে। দীর্ঘ পূর্বরাগের পর স্ত্রী মাছ ডিম ছাড়ে ও পুরুষটি তৎক্ষণাৎ সেগুলো নিষিক্ত করে দেয়। তারপর ডিমগুলো মুখে নিয়ে সে উপরে ওঠে এবং শ্লেষ্মার একটা আস্তরণ লাগিয়ে সেঁটে দেয় গম্বুজের তলায়। প্রতি দফায় তিন থেকে সাতটি ডিম সংগ্রহ করে সে মোট দেড়শো-দুশো ডিম জড়ো করে। শূককীট বেরিয়ে বাসা ছাড়ার মতো বড় না হওয়া অবধি পুরুষ মাছ বাসা ও স্ত্রী দুইয়েরই অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে (ফাঁক পেলে স্ত্রীটি কিন্তু ডিম গিলতে ছাড়ে না)।

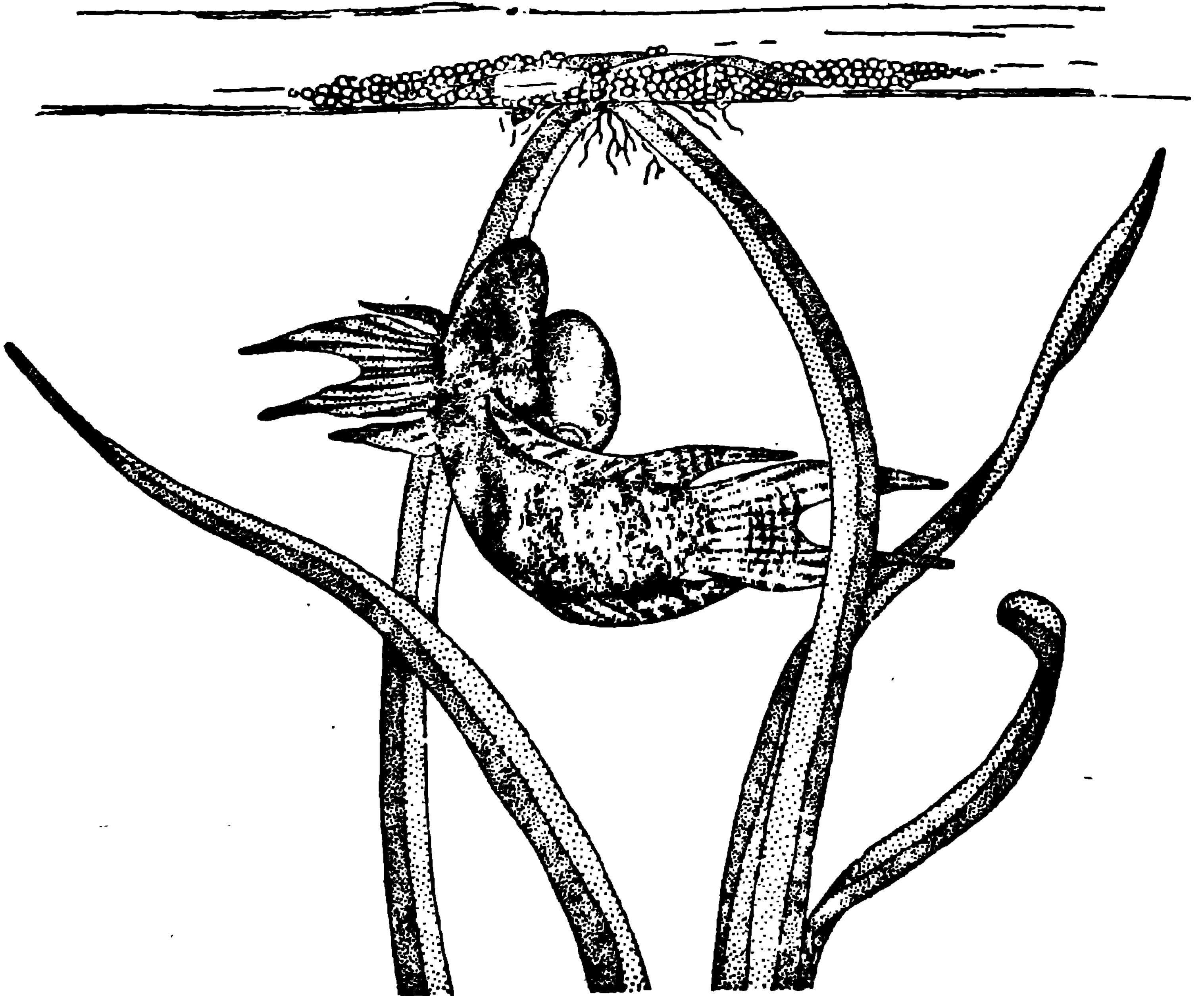
মধ্য ইউরোপের নদীতে বিটারলিং (Bitterling) নামে এক জাতের ছোট কার্প (Rhodeus) দেখা যায়, তাদের সন্তান প্রতিপালনের প্রণালী বেশ চমকপ্রদ। এরা বাসা বানায় না, মিঠে জলের ঝিনুকের খোলাটাকেই দখল করে নেয়। স্ত্রী-মাছের ডিম্বনালী একটা লম্বা নলের আকার-বিশিষ্ট, অনেকটা পতঙ্গের ডিম্বস্থাপকের (ovipositor) মতো। এর সাহায্যে স্ত্রী-মাছ ঝিনুকের খোলার নিরাপদ আশ্রয়ে ডিমগুলো ঢুকিয়ে দেয়। সেখানে ডিমগুলো বিকাশ লাভ করে এবং ঝিনুকের ফুলকোর উপর দিয়ে প্রবাহিত শ্বাস-স্রোত থেকে টেনে নেয় বাতাস। এই পর্যায় এক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। প্রকৃতির আশ্চর্য ব্যবস্থায় ঝিনুক আর মাছটির প্রজননঋতুও এক। গ্লোকিডিয়া (Glochidia) নামক ঝিনুক-শূকগুলি মাছের গায়ে কিছুকালের জন্য পরজীবী হয়ে থাকে এবং মাছের চলাফেরার মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

বাবা অথবা মা-র দেহের বিশেষ থলিও হতে পারে সন্তান পালনের একটি আগ্রহজনক উপায়। সমুদ্র ও মোহনার অধিবাসী ক্যাটফিশদের (Aridae) মধ্যে পুরুষটিই ডিম রক্ষার দায়িত্ব নেয়। প্রচুর কুসুম থাকার কারণে ডিমগুলো বেশ বড় হয়। পুরুষটি সেগুলো পূর্ণ বিকশিত না হওয়া পর্যন্ত নিজের মুখে রাখে এবং এই সারা সময়টা উপোস করে কাটায়।

আফ্রিকা ও দক্ষিণ ভারতের সিক্লিড (Cichlid) মাছেরাও মুখে ডিম নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তবে এদের মধ্যে কাজটা করে স্ত্রী মাছ। বলা হয়, ডিম ফোটার পরেও বাচ্চাগুলো মা-র মুখের আশ্রয় ছাড়ে না। কিছুদিন পরে বাপ-মার সঙ্গে ছোট ছোট ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ায়—মা থাকে সাধারণত মাঝখানে, বাবা চক্কর দিতে থাকে তাদের ঘিরে।

পাইপফিশ আর তাদের জ্ঞাতি সি হর্স (উভয়েই Syngnathidae বর্গের অন্তর্ভুক্ত) ডিম ও বাচ্চার রক্ষণাবেক্ষণ করে তাদের পেটের তলার দিকে একটা বিশেষ থলির মধ্যে।

হিপোক্যামপাস-দের (Hippocampus) প্রচলিত নাম সি হর্স (যেহেতু তাদের মাথাটা ঘোড়ার মাথার মতো)। এদের পুরুষরাই ডিম ও বাচ্চার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়, সে জন্য তাদের লেজের তলায় থাকে একটা থলি। প্রজননঋতুতে রক্তের জোগান বেড়ে স্ফীত হয়ে ওঠে থলিটা। মেয়েদের অবসারণী (cloaca) বেড়ে একটা জনন-পিড়কার (genital papilla) আকার নেয় এবং সেটাই পুরুষের জননস্থলীতে ডিম ঢোকানোর যন্ত্ররূপে কাজ করে। ডিম থেকে যে ভ্রূণগুলো বেরোয়, সেগুলো ঐ জননস্থলীর রক্তবাহী গাত্র থেকেই পুষ্টি গ্রহণ করে। ভ্রূণের বিকাশ সম্পূর্ণ হলে জননস্থলীর সংকীর্ণ ছিদ্রমুখ খুলে যায় এবং এক-একবারে পাঁচ-ছটি খুদে খুদে সি হর্স বেরিয়ে আসে। পুরো দলটা বেরোতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে।



চিত্র 17: বেটা মাছের বাসা বানানো (শুলৎজ ও স্টের্ন-এর অনুসরণে)

সাত

প্রব্রজন : বানমাছের জীবননাট্য

পাখির প্রব্রজনের সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে, কিংবা একই মহাদেশের ঠাণ্ডা জায়গা থেকে গরম জায়গায়, হাঁস আর সারসের ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে যাওয়া নিয়ে যে গবেষণা চলে তার কথাও আমাদের জানা আছে। এই সব পর্যায়ক্রমিক ও দিক-নির্দিষ্ট ভ্রমণ ঘটে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক কারণে ; যেমন খাদ্যান্বেষণ, প্রজনন কিংবা প্রতিকূল জলবায়ু এড়ানোর তাগিদ। মাছেদের মধ্যে এই ধরনের স্থান পরিবর্তন সাধারণ ঘটনা হলেও কেবল জেলে আর প্রকৃতিবিদরাই তার কথা জানতেন। সুদূর অতীত থেকেই ইল (eel) অথবা বানমাছ, স্যামন আর ল্যামপ্রিদের দলে দলে পাড়ি জমানোর ব্যাপারটি মানুষ বিস্ময় আর সম্ভ্রমের সঙ্গে লক্ষ করে আসছে। মাছেরা নদী থেকে সাগরে নেমে যেতে পারে (katadromous), যেমন ঘটে বানজাতীয় মাছের বেলায় ; আবার নদীর উজান বেয়েও উঠে আসতে পারে (anadromous), যেমন আসে স্যামন।

প্রব্রজনের সবচেয়ে বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত মেলে ইউরোপীয় ইল বা বানমাছের মধ্যে। গ্রিক ও রোমান সভ্যতার যুগ থেকেই এই মাছ বিখ্যাত। তা ছিল ধনীদের বিলাসের খাদ্য, জলাধারে তাদের পোষা হত। এদের চঞ্চল স্বভাবের জন্য কেউ জানতে পারত না কোথায় এরা ডিম পাড়ে কিংবা কেমন দেখতে এদের বাচ্চা। বিখ্যাত গ্রিক জীবতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক অ্যারিস্টটল এ-ধাঁধার একটা জবাব পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বানমাছদের পর্যবেক্ষণ করে তিনি স্থির করেছিলেন যে, এদের জননাঙ্গই নেই, কারণ মিঠে-জলে এদের কোনও ডিম খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর তাই তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, ওরা আসে ভূগর্ভ থেকে। প্লিনি নামে আরেক বিজ্ঞানীও ঘোষণা করেছিলেন যে, বানমাছের কোনও শুক্র বা ডিম্ব কোষ নেই, বুড়ো হলে এরা পাথরে নিজেদের গা ঘষে আর তার ফলে শরীরে যে সব টুকরো খসে পড়ে সেগুলোই প্রাণ পেয়ে বেঁচে ওঠে। আবার অনেকেরই অনুমান ছিল, মে মাসের ভোরের শিশির থেকেই বানমাছের উদ্ভব।

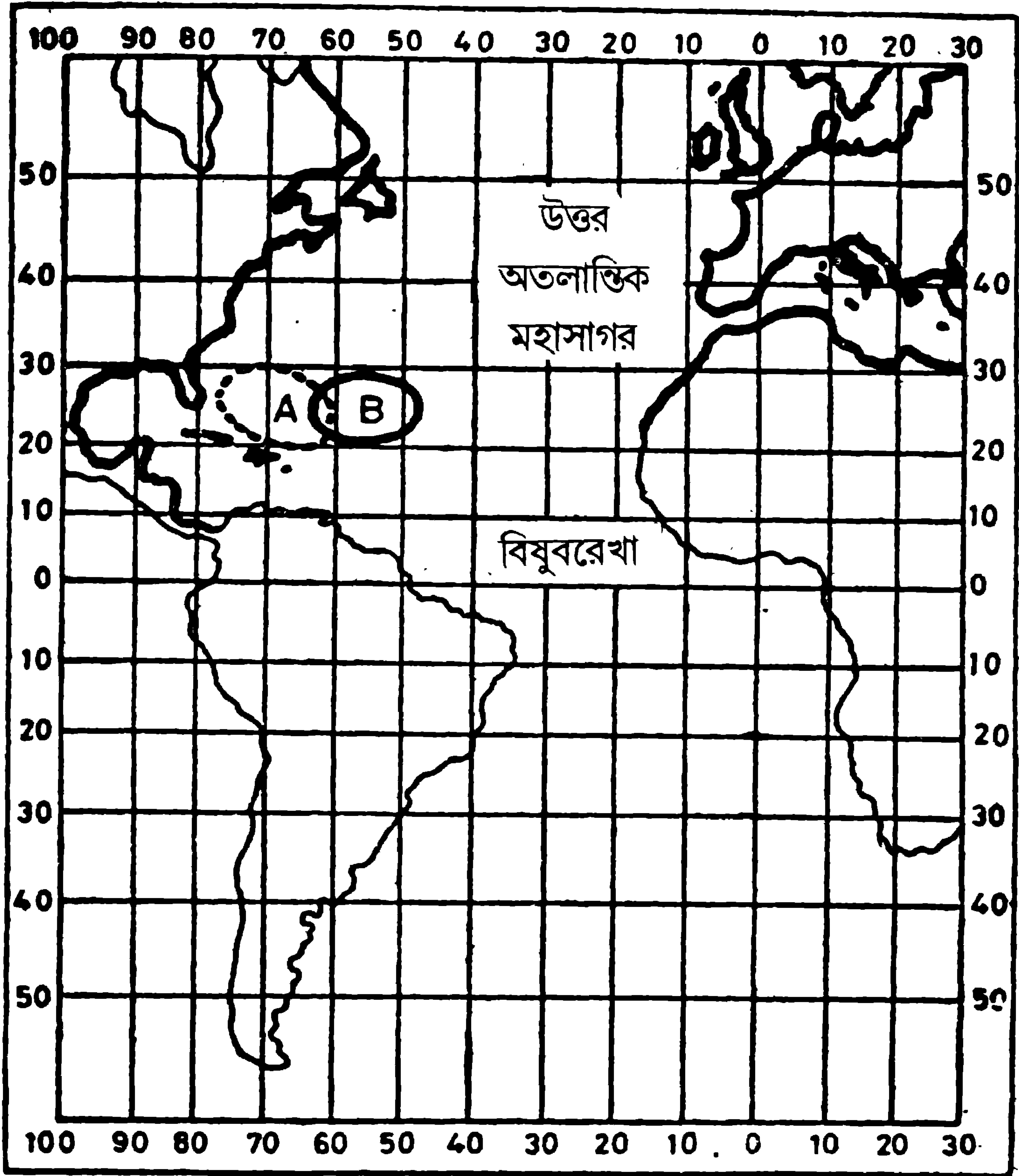
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পর্যবেক্ষণও চলতে লাগল, আর এইসব তথ্য নথিভুক্ত করলেন বিজ্ঞানীরা। প্রত্যেক বছর শরৎকালে বয়স্ক বানমাছেরা সাগরে নেমে যায় কিন্তু কেউ আর ফেরে না। প্রকৃত বসন্তে 76-101 মিমি লম্বা বাচ্চার দল (elvers) উপকূল জুড়ে দেখা দেয় এবং মোহনা পেরিয়ে উজান বেয়ে উঠতে থাকে। এতে অবশ্য ধাঁধাটার জবাব মিলল না। বানমাছ ডিম পাড়ে কোথায় ? ওদের কি শূক-পর্যায় আছে ? থাকলে কত দিনের ? এই সব প্রশ্নের জবাব মিলল 1896-এ যখন দৈবাৎ দুই ইতালীয় বিজ্ঞানীর চোখে পড়ল

পাতার আকারের, স্বচ্ছ, মাছের থেকে একেবারেই আলাদা দেখতে কিছু জীব যার নাম লেপটোসেফালাই (Leptocephali)। আরও তন্ন তন্ন করে তাঁরা খুঁজলেন ভূমধ্যসাগরের জল। সমুদ্রের অতিক্ষুদ্র জীব (plankton) ধরার জন্য বিশেষভাবে তৈরি জালে তাঁরা পেলেন আরও কিছু অদ্ভুত খুদে জীব—লেপটোসেফালাই বা এলভার কোনওটাই নয়, দুইয়ের মাঝামাঝি। পরে গবেষণা চালিয়ে জানা গেল. লেপটোসেফালাই 76 বা 101 মিমি লম্বা হলেই এলভারে পরিণত হয়।

এই চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারগুলির পরে অন্য প্রকৃতিবিদরাও খুঁজে বের করলেন কাহিনীর নানা অংশ। তাঁরা দেখালেন যে, লেপটোসেফালাই কেবল খোলা সাগরেই দেখা যায়, নদীতে বা উপকূলের কাছাকাছি কখনও নয়। বাপ-মা যদি সাগরে নেমে আসে তা হলে তারা নিশ্চয় উপকূলের কাছাকাছি অগভীর জলেই ডিম পাড়ে, অথচ লেপটোসেফালাই দেখা যায় কেবল সুদূর উন্মুক্ত সমুদ্রে। নানা তথ্য ও সিদ্ধান্ত জমা হচ্ছিল কিন্তু তখনও একসঙ্গে মেলানো যাচ্ছিল না সব কিছু।

1905 সালে সামুদ্রিক গবেষণার আন্তর্জাতিক পরিষদ (International Council for the Study of the Sea) থেকে ডেনমার্ককে দেওয়া হল ইউরোপীয় বানমাছের জীবন-বৃত্তান্ত খোঁজার দায়িত্ব। কোপেনহাগেনের কার্লসবার্গ পরীক্ষাগারের (Carlsberg Laboratory) পরিচালক ডাঃ ইওহান শ্মিডট নির্বাচিত হলেন জীবতত্ত্ববিদদের একটি দলের নেতা হিসাবে। 1939 সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই বিশাল দুরূহ কর্তব্যে নিয়োজিত ছিলেন। উত্তর অ্যাটলান্টিকের পুরো জল তিনি ছেঁকে দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন। জায়গাটার ব্যাপ্তিতে যে কোনও দলেরই হিসসিম খাওয়ার কথা, খরচও প্রচুর। খরচা কমানোর জন্য তিনি এ কৌশল করলেন, অ্যাটল্যান্টিক যে শয়ে শয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ নিত্য পাড়ি দেয় সেগুলোর ক্যাপ্টেনদের সহায়তা প্রার্থনা করলেন তিনি। উত্তর অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের সারাটা তল্লাট থেকে বানমাছের বাচ্চা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সরঞ্জাম দিলেন সেই ক্যাপ্টেনদের। অঢেল নমুনা জোগাড় হল, সবিস্ময়ে দেখা গেল যে একটাও বয়স্ক বানমাছ বা এলভার নেই, আছে শুধু অসংখ্য কাচের মতো পাতার আকারের জীব। শ্মিডট ও তাঁর সঙ্গীরা বেশ গুছিয়ে তাঁদের কর্মপন্থা ছকলেন। লেপটোসেফালাই যেখানে যেখানে পাওয়া যাচ্ছিল সেই জায়গাগুলো মানচিত্রে চিহ্নিত করতে লাগলেন তাঁরা, তা থেকে অচিরেই বেরিয়ে পড়ল এদের ব্যাপ্তির নকশা। জীবতত্ত্ববিদ হিসাবে তাঁরা লিপিবদ্ধ করলেন শূককীটগুলোর নানা বৈশিষ্ট্য ; যেমন দৈর্ঘ্য, দেহের অনুপাত, পাখনার ডাঁটি ও কশেরুকার সংখ্যা ইত্যাদি। শিগগিরই পরিষ্কার হয়ে গেল, শূককীটদের পুরো সংগ্রহটিকে দুটো দলে ভাগ করা যায়—একটার কশেরুকার সংখ্যা অন্যটার চেয়ে গড়ে $7\frac{1}{2}$টি বেশি। দেখা গেল, প্রথম দলটি ইউরোপীয় বানমাছের, দ্বিতীয়টি আমেরিকান বানমাছের—দু দলেরই প্রজননের জায়গা হচ্ছে অ্যাটলান্টিক। সত্যিকারের বিস্ময়কর আবিষ্কার।

অনুসন্ধান শেষ হতে চলল। ডাঃ শ্মিডট তাঁর মানচিত্রে দেখলেন যে, উপকূল থেকে যত দূরে যাওয়া যায় ইউরোপীয় লেপটোসেফালাইয়ের আকার তত কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তিনি আঙুল রাখলেন ঠিক সেই জায়গাটায় যেখানে ডিম ফোটে বানমাছের—50-60°W দ্রাঘিমা, 22-29° অক্ষাংশ, 275 মিটার গভীরতা—অর্থাৎ বারমুডার দক্ষিণ-পূর্বে, সারগাসো



চিত্র 18 : বানমাছের প্রব্রজন-মানচিত্র।

A—আমেরিকান বানমাছের প্রজননস্থান

B—ইউরোপীয় বানমাছের প্রজননস্থান (শুলৎজ ও স্টের্ন-এর অনুসরণে)

সাগরের কাছাকাছি এলাকা। তিনি আরও দেখলেন, ডিম ফোটে বসন্তে। অবশেষে আবিষ্কৃত হল ডিম ফোটার জায়গা-সময় দুই-ই।

জন্মস্থান থেকে শূককীটেরা রওনা হয় উজান বেয়ে, 46 মিটার গভীরতায় অ্যাটলান্টিক উপসাগর-স্রোতের (Gulf Stream) উষ্ণ জলে ভেসে-ভেসে বড় হতে হতে। মোটামুটি হিসাবমতো জীবনের দ্বিতীয় গ্রীষ্মে তারা পৌঁছায় অ্যাটলান্টিকের মাঝামাঝি আর তৃতীয় গ্রীষ্মে ইউরোপের উপকূলে। তৃতীয় বছরের শরতে ও শীতে ওদের চেহারা বদলে যায়, দেখা দেয়

পেনসিলের আকারের এলভার—অবিকল খুদে বানমাছ। এরা বিপুল সংখ্যায় নদীর মোহনায় জড়ো হয়ে ঢুকে পড়ে মিঠে-জলে। এইবার একটি আশ্চর্য লিঙ্গগত পার্থক্য দেখা যায়। পুরুষগুলো থেকে যায় মোহনার নোনা জলে, মেয়েগুলো এগিয়ে যায় উজানে।

মিঠে-জলে বেশ ক বছর কাটে বানমাছের। পুরুষগুলোর 8 থেকে 10 বছর, মেয়েগুলোর সম্ভবত আরও বেশি। সময়টা অবশ্য খাবারের জোগান ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। অতঃপর তরুণ বানমাছ যৌন পরিণতি লাভ করে। তাদের রঙ হয় গাঢ় হলুদ, নামও হয় হলদে বানমাছ। প্রত্যেক শরতে প্রজননের বেশ ধারণ করে তারা রুপোলি বানমাছে পরিণত হয় এবং তৈরি হয় অ্যাটলান্টিকের সুদূর সারগাসো সাগরে পাড়ি জমানোর জন্য। অনেক সুন্দর সুন্দর শৃঙ্গারলক্ষণ জেগে ওঠে তাদের শরীরে। চোখ হয় বড়, ঠোঁট পাতলা, তস্ত আর বুকের পাখনা ছুঁচলো। শরীরের ভিতরে খাদ্যনালি ছোট হয়ে বেড়ে ওঠে জননাঙ্গগুলো। ঝাঁকে ঝাঁকে তারা বেরিয়ে পড়ে পুকুর, হ্রদ আর নদী ছেড়ে উপকূলের দিকে; এমনকি রাত্রির ঠাণ্ডায় হেঁটে পেরোয় ঘাসজমি-ময়দান, অবশেষে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্রে, শুরু হয় সারগোসা সাগরের অতল জলের অভিমুখে তাদের 3830 কিলোমিটার বা তার চেয়েও লম্বা অবিশ্বাস্য অভিযান। কেবলমাত্র অ্যাটলান্টিকের এই অংশটিতেই রয়েছে তাদের বংশবৃদ্ধির উপযুক্ত অবস্থা—সঠিক গভীরতা, তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা। বিপদসঙ্কুল এই যাত্রাপথে কেউ মরে, কেউ কেউ অন্য মাছের পেটে যায়। শেষ পর্যন্ত প্রজননের জায়গায় যারা পৌঁছায় তারাও এমন বিধ্বস্ত ও কাহিল হয়ে যায় যে তারা আর বাঁচে না—জন্ম দিতে দিতেই মৃত্যুবরণ করে তারা।

আমেরিকান বানমাছও সারগাসো সাগরেই বংশবৃদ্ধি করে। এদের শূককীটগুলো ভেসে যায় আমেরিকান উপকূলের দিকে এবং পথটা পাড়ি দেয় আরেকটু তাড়াতাড়ি, বছর দুয়েকে চেহারা বদলে এলভার হয়ে তারা ঢোকে উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের নদীগুলোর মোহনায়।

ইউরোপীয় বানমাছের জীবনে রয়েছে চারটি পর্যায় :

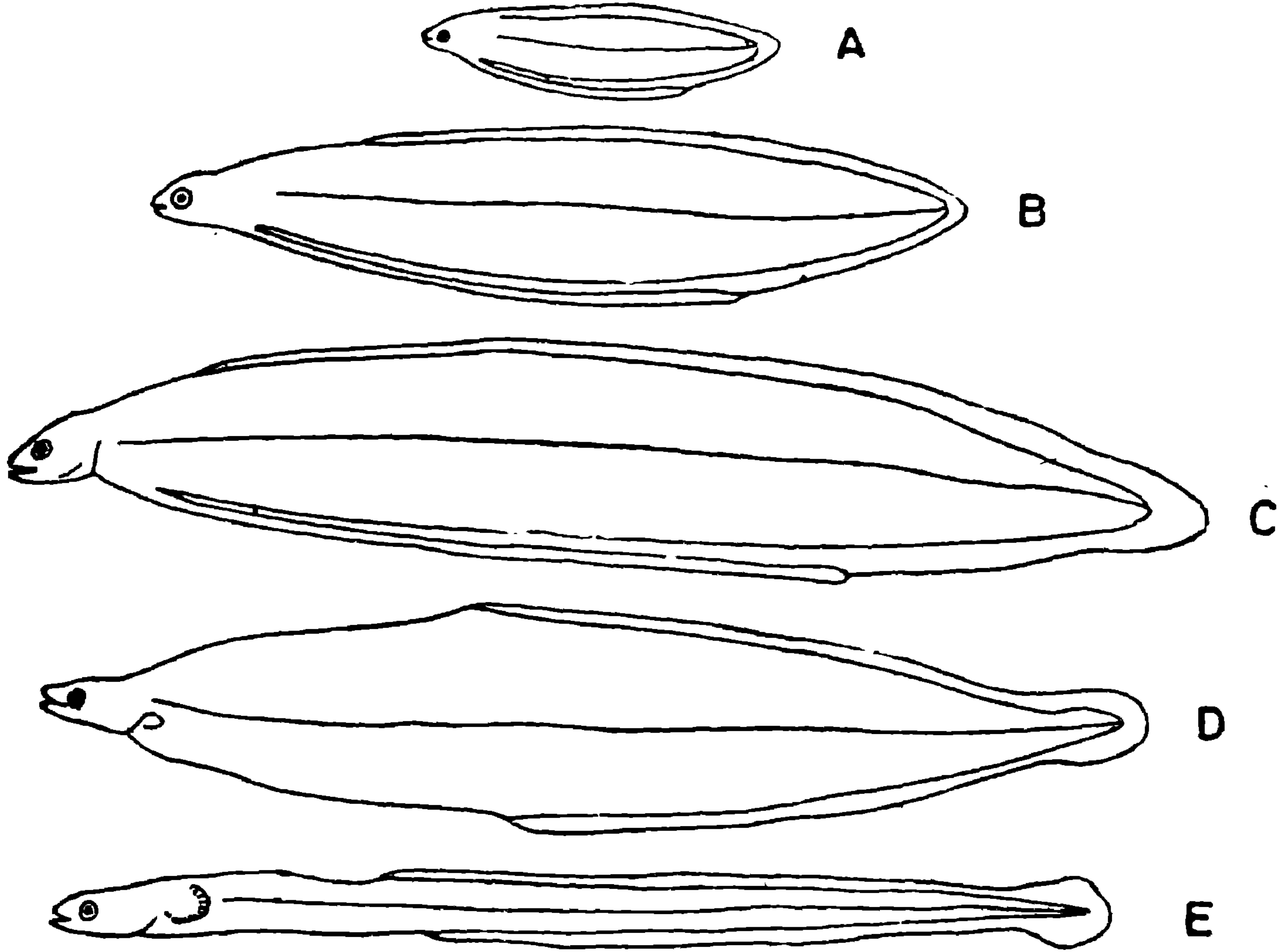
(1) সামুদ্রিক—সারগাসো সাগরে বারমুডা দ্বীপপুঞ্জের কাছে ডিম ফুটে বেরোয় কাচের মতো স্বচ্ছ পাতার আকারের শূককীট, যাদের বৈজ্ঞানিক নাম লেপটোসেফালাই। 100-150 ফ্যাদম গভীরতায়, 68° ফা. উষ্ণতায় উপসাগরীয় স্রোত বেয়ে তারা ভেসে চলে ইউরোপের নদনদীতে তাদের বাসস্থানের উদ্দেশে। প্রথম বছরের শেষে তাদের আকার দাঁড়ায় 25 মিমি, তারা এসে পৌঁছয় 50° পশ্চিম দ্রাঘিমায় এবং তারপর তারা সাঁতরাতে থাকে জলের উপরিভাগে। পরের বছর তারা ইউরোপের উপকূলে পৌঁছয়, তাদের আকার তখন 75 মিমি।

(2) এলভার পর্যায়—লেপটোসেফালাই খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে বেঁটে পেনসিলের মতো আকার নেয়, এদের বলে এলভার বা গ্লাস ইল।

(3) হলদে বানমাছ—এলভাররা নদীর উজানে এগোয়, তাদের আকার বাড়ে, রং হয় হলুদ।

(4) রুপোলি বানমাছ—তরুণ মাছগুলো যৌন পরিণতি লাভ করে। তাদের দেহে ফোটে উজ্জ্বল রুপোলি আভার শৃঙ্গারবেশ, তারা রওনা হয় সারগাসো সাগরের গহন জলের দিকে—যেখান থেকে তারা আর কোনও দিন ফিরবে না।

এ অধ্যায়ের বেশির ভাগ জুড়ে একটিমাত্র মাছের কথাই বলা হয়েছে, তার কারণ এই মাছের জীবনকাহিনী একটি 'মহাকাব্য' বিশেষ — সব মাছের মধ্যে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর, আমাদের সবচেয়ে জানাও বটে। তবে আরও কিছু মাছ আছে, অত চমকপ্রদ না হলেও গুরুত্বপূর্ণ।



চিত্র **19**: A-E, ইউরোপীয় বানমাছের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় (শুলৎজ ও স্টের্ন-এর অনুসরণে)

সার্ডিন গোত্রের একটি নামজাদা ভক্ষ্য মাছ স্যামন, তারও প্রব্রজনের স্বভাব দেখা যায়। বড় মাছগুলো সাগরে থাকে, নদীর উজান বেয়ে ওঠে বংশবৃদ্ধি করতে। ইউরোপ ও আমেরিকার বেশ কিছু প্রজাতির স্যামনের মধ্যেই উজানি (anadromous) প্রব্রজনের ভাল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সবচেয়ে অসাধারণ প্রব্রজক হল রাজা স্যামন (King Salmon)। সমুদ্র থেকে মিঠে জলের উজানি যাত্রায় এরা উত্তর আমেরিকার অ্যালাস্কায় ইউকন (Yukon) নদী বেয়ে 1610–3220 কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে চলে যায়। এদের এই প্রবৃত্তি এতই প্রবল যে তার তাগিদে সব রকম কষ্ট সহ্য করে এরা, অসীম অধ্যাবসায়ে, পেরিয়ে যায় তুমুল জলপ্রপাত, বাঁধ আর অন্য নানা বাধা।

মিঠে-জলে ঢুকেই এরা খাওয়া বন্ধ করে, ফলে দেহকলায় জমানো চর্বি খরচ হয়ে যায়, মাংসপেশি শিথিল হয়ে পড়ে, ওজন কমে যায় মাছগুলোর। পুরুষদের কতকগুলো যৌন বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। তুণ্ড আর নীচের চোয়াল লম্বা হয়ে যায়, দ্বিতীয়টিতে একটা বঁড়শি

গজায়। উপরের চোয়ালের সামনের দাঁতগুলো বেড়ে যায়। নদীনালার অগভীর নুড়ি-ছড়ানো তলদেশে, জলের স্রোত যেখানে তীব্র এমন একটি জায়গা বেছে নিয়ে, জোড়ায়-জোড়ায় ভাগ হয়ে যায় স্যামনের ঝাঁক। স্ত্রী মাছ লেজ দিয়ে একটা অগভীর খাদ খুঁড়ে তাতে একগাদা ডিম পাড়ে আর সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো নিষিক্ত করে দেয় পুরুষ মাছ। কাজ শেষ হলে তারা ফেরে ঘরের দিকে, কিন্তু ততদিনে এমনই কাহিল তারা যে স্ত্রীপুরুষ কেউই আর সমুদ্রে পৌঁছতে পারে না।

সব মাছের মধ্যে স্যামনেরই নীড় চেনার প্রবৃত্তি সবচেয়ে জোরালো বলে বলা হয়। প্রত্যেক প্রজন্ম নাকি তার পূর্বপুরুষদের বিশেষ নদীনালাটি পর্যন্ত চিনে নেয়!

ভারতীয় মাছেদের মধ্যে ইউরোপীয় বা আমেরিকান বানমাছ এবং স্যামনের মতো অত চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত দেখা না গেলেও সার্ডিন গোত্রভুক্ত আমাদের সুপরিচিত ইলিশ মাছের উল্লেখ করা যেতে পারে। বঙ্গোপসাগরের এই বাসিন্দা প্রজননঋতুতে গঙ্গার মোহনা পেরিয়ে মিঠে জলে চলে আসে, কখনও-কখনও এলাহাবাদ অবধি পৌঁছে যায়।

দুধমাছ বা চানোস-ও (Chanos) সার্ডিন গোত্রের মাছ, আরব সাগরের উপকূলে প্রচুর দেখা যায়। প্রতি বছর এরা বংশবৃদ্ধি করতে পশ্চিম উপকূলের মোহনা আর জলাভূমির দিকে পাড়ি দেয়। ডিম ফুটে শূককীট বেরিয়ে আঙুলের মতো বড় হতেই রওনা হয় সাগরের উদ্দেশে।

বিখ্যাত 'বম্বে ডাক'-এর (Bombay Duck, Harpodon) মধ্যেও খাবারের খোঁজে প্রব্রজনের কিছু কিছু ঝোঁক দেখা যায়। এদের স্বাভাবিক নিবাস বোম্বাই উপকূল বরাবর আরব সাগরে। বঙ্গোপসাগর অবধি, এমনকি গঙ্গার মোহনার ভিতর পর্যন্ত এরা চলে যায় বলে খবর পাওয়া গেছে।

আট
সাধারণ ভারতীয় মাছ

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচুর নদী, হ্রদ, বদ্ধজলা, উপহ্রদ আর বিল-হাওড়। সবচেয়ে বড় দুই নদী গঙ্গা আর সিন্ধু হিমালয় থেকে বেরিয়ে সারা উত্তর ভারত পেরিয়ে যার-যার মোহনা দিয়ে গিয়ে পড়েছে সাগরে। দক্ষিণ ভারতেও রয়েছে গোদাবরী-কৃষ্ণা-কাবেরীর মতো বিশাল নদী, তা ছাড়া অসংখ্য ছোট-ছোট নদীনালা। ভারতে সব নদীর মোট দৈর্ঘ্য ধরা হয় প্রায় 27,360 কিলোমিটার। এই সব নদী, তাদের শাখাপ্রশাখা, খাল আর সেচনালির মোট ক্ষেত্রফল প্রায় 1,12,650 বর্গ কিলোমিটার, তাতে মাছেদের জন্য হরেক রকম পরিবেশ।

ভারতের পুবে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর, আর এই দুই সাগর দেশের দক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে মিলেছে ভারত মহাসাগরে। প্রায় 6000 কিলোমিটার লম্বা ভারতের উপকূল। উপকূল-বরাবর সমুদ্র সীমার মোট ক্ষেত্রফল প্রায় 2,59,000 বর্গ কিলোমিটার। এই বিশাল জায়গা জুড়ে যে কত বিচিত্র ধরনের সামুদ্রিক মাছের বাস তার ইয়ত্তা নেই। এর পরে মহাসাগরের জলরাশি—বড় বড় হাঙর ও রে মাছের এবং টিউনা, পাল মাছ (sail fish) ও তরোয়াল মাছের (sword fish) মতো নানা অস্থিবিশিষ্ট মাছের বাসস্থান। ভারতের মিঠে-জল ও সামুদ্রিক জলসম্পদের মোট এলাকা কয়েক মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার বা তারও বেশি হবে, অথচ এখনও পর্যন্ত এক মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটারের বেশি কাজে লাগানো হয়নি।

মিঠে আর নোনা জলের মাছ এ দেশে আছে কয়েক শ প্রজাতির—এ বইয়ে সবগুলোর বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সাধারণ যে সব মাছ খাদ্য বা পণ্যদ্রব্যের উৎস হিসাবে অথবা শখের শিকারের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, বেছে বেছে সেগুলোরই বর্ণনা দেওয়া হবে। এ উদ্দেশ্যে এইসব মাছকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে : (1) কোমলাস্থিবিশিষ্ট বা ইল্যাজমোব্র্যাংক (Elasmobranch) মাছ ও (2) পূর্ণাস্থি মাছ।

ইল্যাজমোব্র্যাংক মাছ

আগেই বলা হয়েছে, হাঙর আর রে মাছেদের নিয়েই কোমলাস্থিবিশিষ্ট মাছেদের দল—এরা প্রধানত সাগর আর মহাসাগরের বাসিন্দা, যদিও কিছু আগ্রহজনক মোহনাবাসী ও প্রব্রজনকারী প্রজাতিও রয়েছে।

প্ল্যুরোট্রেমাটা (Pleurotremata) বা সেলাকোয়ডেই (Selachoidei) মহাবর্গ (হাঙর)

বড় আকার এবং শিকারি স্বভাবের জন্য হাঙররা নামকরা এবং সুপরিচিত। বর্তমান যুগের হাঙরদের ভাগ করা হয় তিনটি প্রধান গোষ্ঠী বা বর্গে—(১) নোটিডানিড (Notidanid)

বা হেক্সাংকিড (Hexanchid) হাঙর; (২) গ্যালেওয়ড (Galeoid) বা ল্যামনা-জাতীয় (Lamna-like) এবং (৩) স্কোয়ালয়ড (Squaloid) হাঙর। এদের সবাইকেই ভারতের সাগরগুলিতে পাওয়া যায়।

নোটিডানিড বা হেক্সাংকিড হাঙর বিরল, এদেরই সবচেয়ে আদিম বলে মনে করা হয়। ছয় বা সাত জোড়া ফুলকো-মুখ, একটা পিঠের পাখনা। ভারতে এদের একমাত্র যে জাতটাকে দেখা যায় তা হল হেপট্রাংকিয়াস প্ল্যাটিসেফালাস (Heptranchias platycephalus)। এর দেহ লম্বাটে, তন্ড গোল বা ভোঁতা। চোখে উপপল্লব (nictitating membrane) নেই। স্পাইর‍্যাকল ছোট। সাতজোড়া ফুলকো-মুখ।

গ্যালেওয়ড হাঙরের গোষ্ঠীই সবচেয়ে বড়, দুনিয়ার সব সুপরিচিত হাঙরই এই গোষ্ঠীতে পড়ে। ফুলকো-মুখ পাঁচটি, দুটি পিঠ-পাখনা। একটি পায়ু-পাখনা, কাঁটা বা দাঁড়া নেই। এই উপবর্গে ছটা প্রধান গোত্র—ওডনটাসপিডি (Odontaspidae), ল্যামনিডি (Lamnidae), ওরেকটোলোবিডি (Orectolobidae), স্কাইলিওরাইনিডি (Scyliorhinidae), ক্যার্কারাইনিডি (Carcharhinidae), স্ফিরনিডি (Sphyrnidae)।

ওডনটাসপিডি গোত্র (বেলে হাঙর)

ভারতে এই গোত্রের একমাত্র যে হাঙরটি পাওয়া গেছে তা হল ক্যার্কারিয়াস ট্রাইকাসপিডেটাস (Carcharias trichaspidatus), বোম্বাইতে যাকে বলে 'ওয়াগির' (Wagir)। বোম্বাই আর সিন্ধু উপকূলের কাছে পাওয়া যায়। গড় দৈর্ঘ্য 3·5 মিটার, তবে 6 মিটার লম্বাও হয়। হিংস্র, মানুষ ও অন্য মাছের পক্ষে বিপজ্জনক।

ল্যামনিডি গোত্র (ম্যাকেরেল হাঙর)

ম্যাকেরেল নামের পূর্ণাস্থি মাছের সঙ্গে দেহের গড়নের নিখুঁত মিলের জন্যই এদের চলতি নাম ম্যাকেরেল হাঙর। ল্যামনা (Lamna) এই গোত্রের একটি সুপরিচিত হাঙর। আরেকটি দৃষ্টান্ত হল ক্যার্কারোডন (Carcharodon), মানুষকে আক্রমণ করে বলে যাকে চলতি কথায় মানুষখেকো বলে। তবে এ দুটি কোনওটিই ভারতের সাগরে থাকে না। এ দেশে এই গোত্রের কেবল দুটি হাঙরের কথাই জানা গেছে—আইসুরাস (Isurus), যার চলতি নাম পোরবিগল (Porbeagle) এবং অ্যালোপিয়াস (Alopias) বা শেয়ালমুখো হাঙর (thresher shark)।

ওরেকটোলোবিডি গোত্র (Orectolobidae)

বড় ও বৈচিত্র্যময় গোত্র, যার একটি পরিচিত সদস্য হল ওরেকটোলোবাস (Orectolobus) বা কার্পেট হাঙর। ভারতে যে সব গণের কথা জানা গেছে সেগুলি হল: চিলোস্কাইলিয়াম (Chiloscyllium), নেব্রিয়স (Nebrius), স্টেগোস্টোমা (Stegostoma) ও রিংকোডন (Rhincodon)—শেষেরটাই সবচেয়ে পরিচিত।

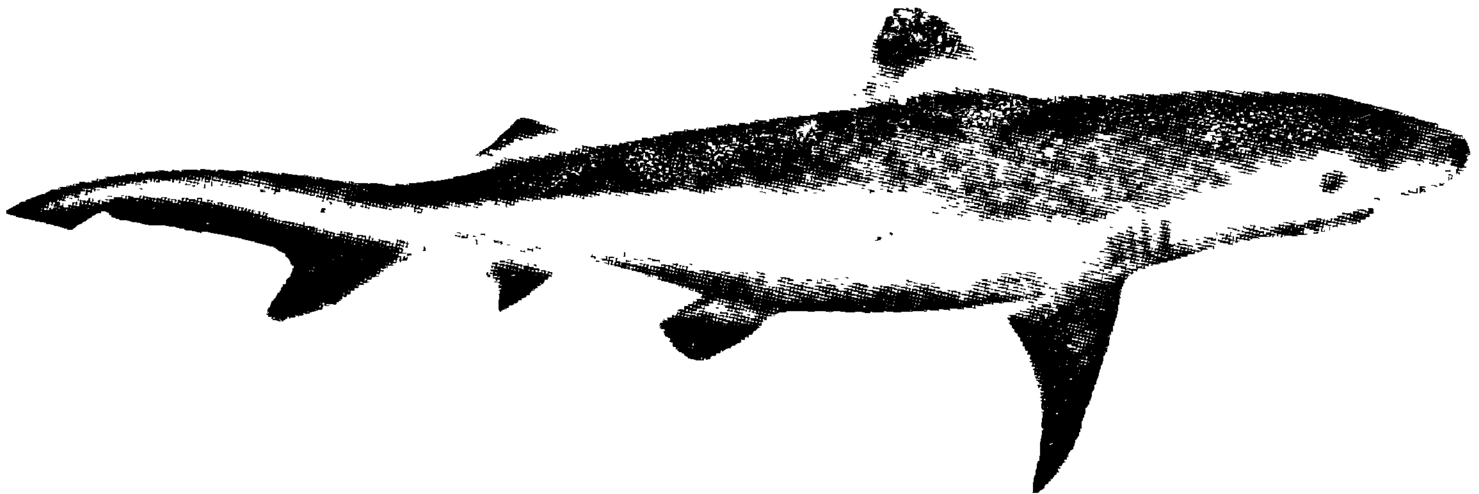
রিংকোডন টাইপস বা তিমি হাঙরকে বোম্বাইতে বলে 'করঞ্জ' বা 'বাহিরি'। নামেই বোঝা যায়, আকারে এ তিমির সমান। সত্যি বলতে কি, রিংকোডন হল আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মাছ, লম্বায় প্রায় 12 মিটার। ভারতীয় প্রজাতিটি অবশ্য 4–9 মিটার হয়।



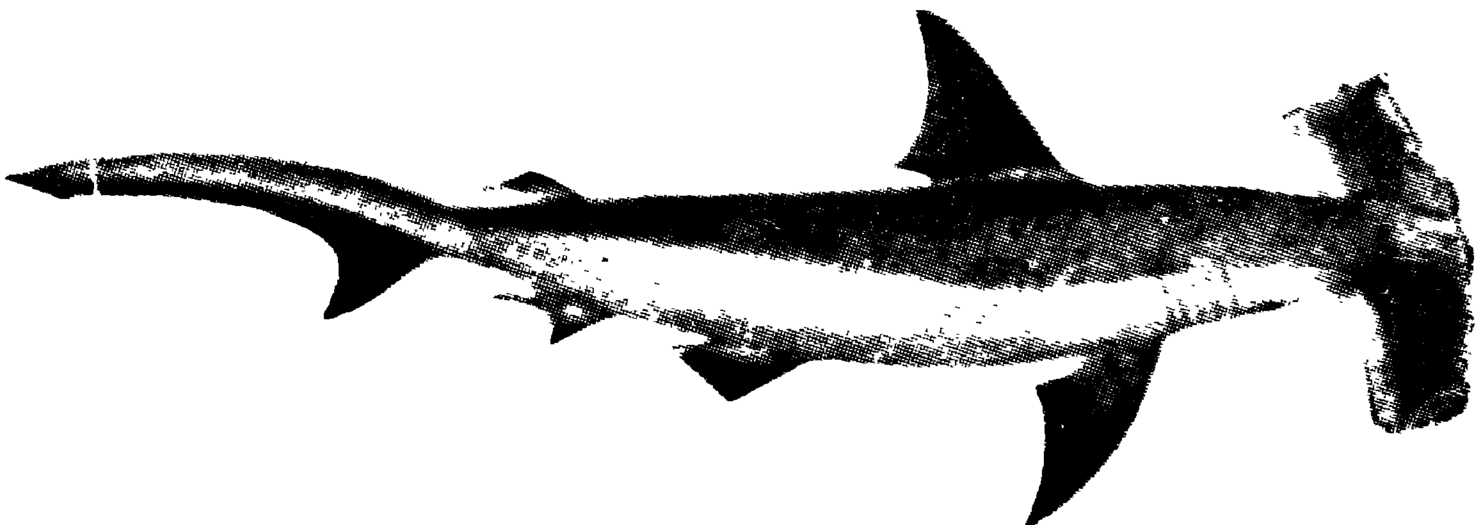
ডগফিশ (Dogfish)



টাইগার শার্ক (Tiger Shark)



হাঙর (Shark)

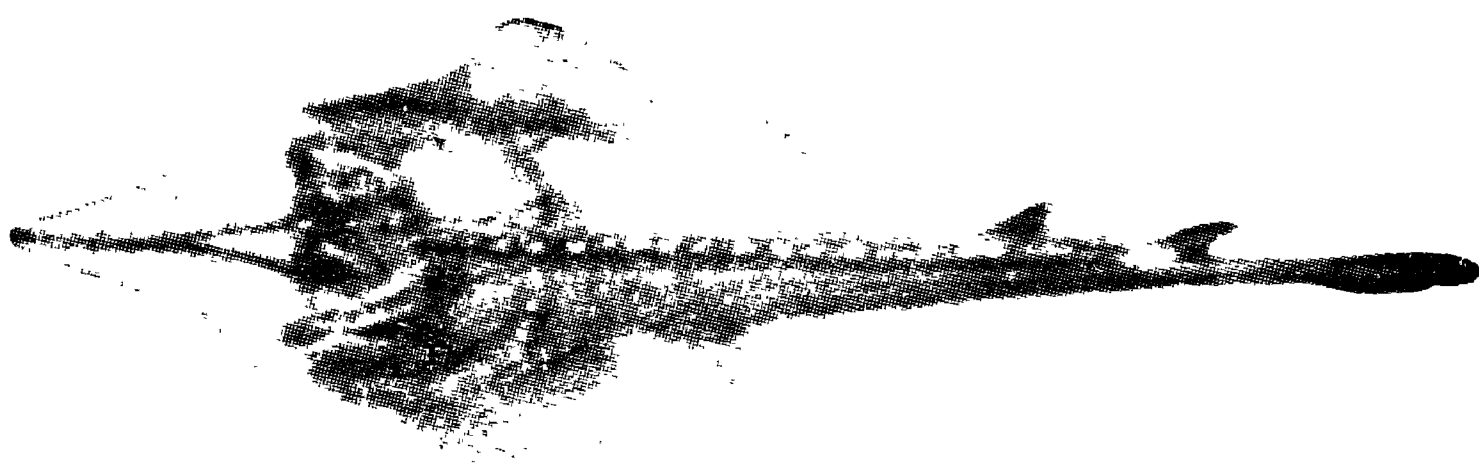


হাতুড়ি-মাথা হাঙর (Hammer-headed Shark)

তিমি (Whale Shark)



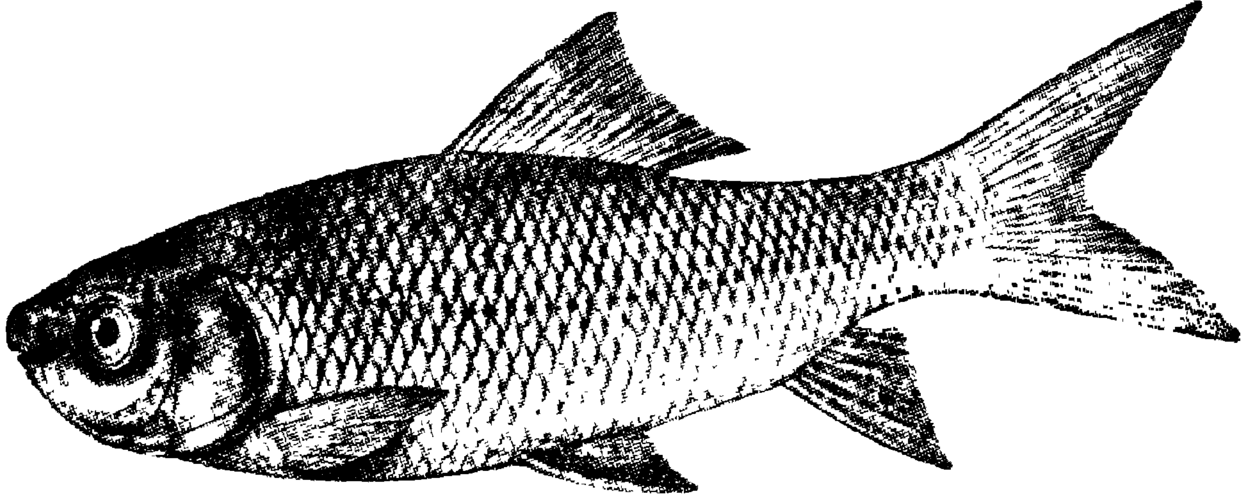
করাতি মাছ (Saw Fish)



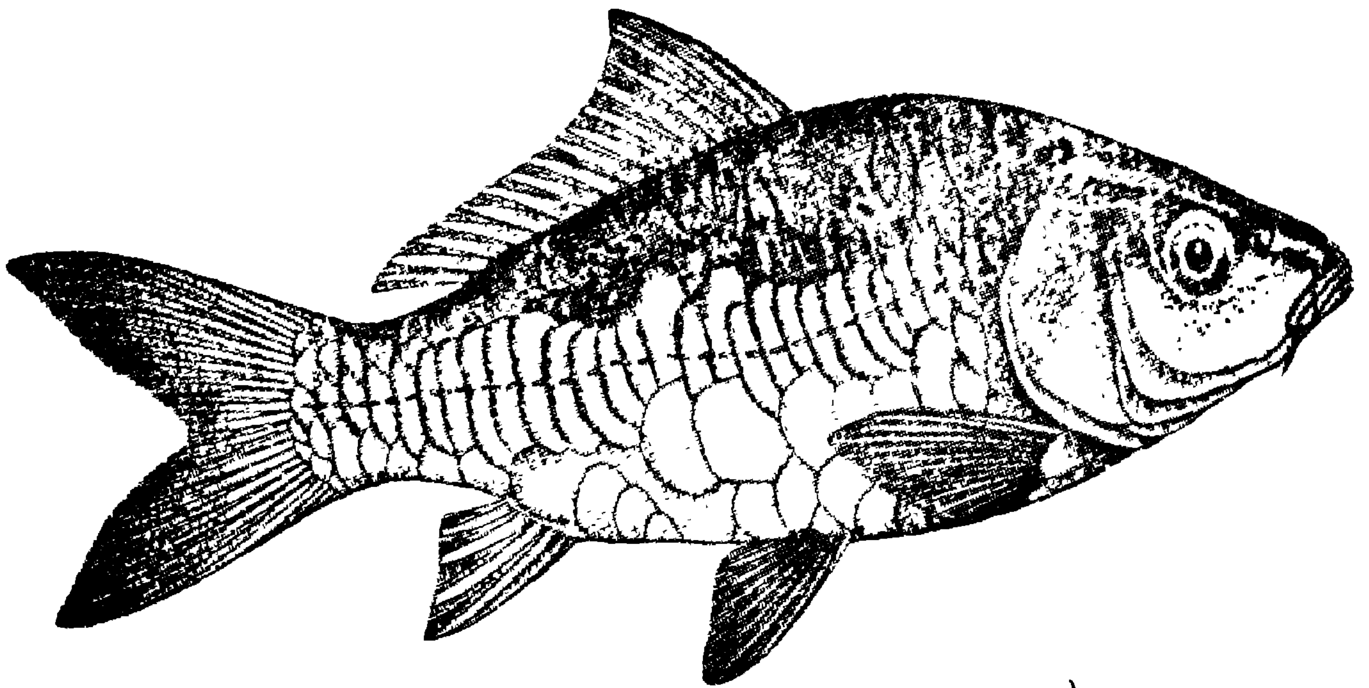
গিটার রে (Guitar Ray)

হুলওয়ালা রে (Sting Ray)

ছবি—IV



ভারতীয় কার্প—রুই (Indian Carp)



সাধারণ ইউরোপীয় কার্প (Common Carp)

এরা জলের উপরিভাগে সাঁতরে বেড়ায়, প্ল্যাংকটন খেয়ে বাঁচে। এদের যকৃৎ-তেল প্রচুর, অর্থনৈতিকভাবে এরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদেরই জ্ঞাতি হল আরেকটু ছোট, 2–9 মিটার লম্বা, নেব্রিয়স ফেরুজিনিয়ম (Nebrius ferrugineum)— বোম্বাইতে খুব মেলে, সেখানে একে বলে 'সুনেরা'। এরও যকৃৎ-তেল প্রচুর। এই গোত্রের আরেকটি ভারতীয় মাছ হল স্টেগোস্টোমা ভেরিয়ম (Stegostoma varium), বাঘের মতো জমকালো ডোরা থাকার কারণে যাকে চলতি কথায় বলে বাঘা-হাঙর। লম্বায় 5.5 মিটার পর্যন্ত হয়, মাংস আর তেলের কদর আছে। মাদ্রাজ আর ত্রিবান্দ্রমে অনেক দেখা যায়।

স্কাইলিওরাইনিডি গোত্র (Scyllorhinidae)

এই বিশাল গোত্রে 11–12টি গণ। বাণিজ্যিক দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্কারাইনস (Carcharhinus) বা নীল-হাঙর। সুঠাম, নীল রঙের মাছ। ভারতের সাগরগুলিতে গোটা বারো প্রজাতি দেখা যায়। মালাবার উপকূলেই এদের সংখ্যা বেশি।

কার্কারাইনস গ্যাঞ্জেটিকস (Carcharhinus gangeticus) দেখা যায় বঙ্গোপসাগরে ও সব নদীতে, জেলে আর স্নানার্থীদের আক্রমণ করার জন্য সুপরিচিত। গঙ্গায় যেগুলো থাকে সেগুলো উজান বেয়ে ওঠে, অল্প যে ক রকমের হাঙর মিঠে-জলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে এরা তাদের অন্যতম। কার্কারাইনসের সব কটি প্রজাতিই যকৃত-তেলের মূল্যবান উৎস, তেল বের করার জন্য প্রচুর ধরা হয় এদের। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্কলিওডন, চলতি নাম যার ডগ-শার্ক বা ডগফিশ। এরা তুলনায় ছোট, দৈর্ঘ্যে 0.6-0.8 মিটার। খাদ্য আর তেলের উৎস হিসাবে এদের দু-তিনটি প্রজাতির কদর আছে। ছোট আকারের কারণে কলেজগুলোতে ভারতের জীববিদ্যা অধ্যয়নের জন্য এরা জনপ্রিয়। এই গোত্রের আরেক সদস্য গ্যালেওসের্ডো (Galeocerdo) মেলে মাদ্রাজ ও করমণ্ডল উপকূলে। মাঝারি আকারের মাছ, 3.6–4.2 মিটার লম্বা, প্রচুর পরিমাণ তেল পাওয়া যায় তা থেকে।

স্ফিরনিডি গোত্র (হাতুড়ি-মাথা হাঙর)

এদের বিদঘুটে চেহারার জন্য বড় বড় সামুদ্রিক অ্যাকোয়ারিয়ামের এরা বড় আকর্ষণ। এদের মাথা সামনের দিকে ভোঁতা হয়ে ও দু দিকে বেড়ে গিয়ে হাতুড়ির মতো দেখতে হয়েছে। মাথার এই দু পাশে বাড়ানো অংশের আগায় থাকে চোখ। এই হাঙররা হিংস্র, মাথা দিয়ে এরা শিকারের উপর বাড়ি মারে। এদের ধরা হয় তেলের জন্য, যদিও তেল পাওয়া যায় তুলনায় কমই। ভারতের সাগরজলে চারটি প্রজাতির কথা জানা গেছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল স্ফিরনা ব্লকিআই, বঙ্গোপসাগরে আর বোম্বাই উপকূলে এদের পাওয়া যায়।

স্কোয়ালয়ডরা (Squaloids) হল হাঙরদের তৃতীয় প্রধান গোষ্ঠী, তাদের তিনটি গোত্র। স্কোয়ালিডি (Squalidae) গোত্রের হাঙররা ছোট, দেখতে কুকুর-মাছের মতো। এদের একটি

বৈশিষ্ট্য হল পায়ু-পাখনার অনুপস্থিতি। প্রতিটি পিঠ-পাখনার প্রথমেই কাঁটা, তাই এ গোত্রটিকে সাধারণত ডাকা হয় 'কাঁটাওয়ালা কুকুরমাছ' বলে। তুণ্ড চামচের আকার ধারণ করার এবং স্পাইর‍্যাকল বড় হওয়ার ঝোঁক দেখা যায় এদের মধ্যে। এই গোত্রের দুই সুপরিচিত সদস্য হল সেন্টোফোরস (Centophorus) এবং সেন্ট্রোস্কাইলিয়ম (Centroscyllium)—দুইই বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে প্রচুর পাওয়া যায়।

অন্য দুই গোত্র— স্কোয়াটিনিডি (Squatinidae) বা অ্যাঞ্জেল হাঙর (Angel Shark) এবং প্রিস্টিওফোরিডি (Pristiophoridae) বা করাতি হাঙর (Saw Shark)— ভারতে দেখা যায় না।

হাইপোট্রেমাটা (Hypotremata) বা ব্যাটয়ডেই (Batoidei) মহাবর্গ (রে-জাতীয় মাছ)

ইলাজমোব্র্যাংক মাছেদের দ্বিতীয় প্রধান গোষ্ঠী হল রে জাতীয় মাছ। হাঙরদের থেকে এদের তফাত হল, এদের শরীর উপর-নীচে চ্যাপটা, তার তলার দিকে পাঁচটি ফুলকো-মুখ। ভারতের সাগরজলে এদের সংখ্যা প্রচুর। সাধারণ রে-দের ফেলা হয় ব্যাটিয়া (Batea) বা র‍্যাজিফর্ম (Rajiforme) বর্গে, আর যাদের বৈদ্যুতিক প্রত্যঙ্গ আছে তাদের নার্কোব্যাটিয়া (Narcobatea) বা টর্পেডেনিফর্ম (Torpedeniforme) বর্গে। ব্যাটিয়া বর্গের সুপরিচিত সদস্যদের বর্ণনা দেওয়া হল।

প্রিস্টিডি গোত্র [Pristidae(করাতি মাছ)]

এইসব মাছের বৈশিষ্ট্য হল লম্বা, দাঁতওয়ালা, করাতের মতো ঠোঁট যা দিয়ে ওরা অন্য মাছকে আক্রমণ করে। ভারতে দুটি প্রজাতি আছে— প্রিস্টিস কাস্‌পিডেটস (Pristis cuspidatus) ও প্রিস্টিস মাইক্রোডন (Pristis microdon)— দুইই ভিটামিন-সমৃদ্ধ যকৃৎ-তেলের জন্য অমূল্য। করাতি হাঙরেরও দাঁতাল ঠোঁট আছে, তাই তার সঙ্গে প্রিস্টিসকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। হাঙরের ফুলকো-মুখগুলো থাকে দু পাশে, তাই দিয়ে চেনা যায় তাকে। দুটোই অবশ্য মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক।

রাইনোব্যাটিডি গোত্র [Rhinobatidae (গিটার রে)]

এই রে-দের চাপা শরীর, ক্রমশ-সরু-হওয়া তুণ্ড এবং লম্বাটে লেজের জন্য এদের দেখতে হয় গিটারের মতোই। ভারতে তিনটি গণ আছে। বড়টার নাম রিংকোব্যাটাস (Rhynchobatus), প্রায় 2.5 মিটার লম্বা, যকৃতের ওজন প্রায় 4 কিলোগ্রাম, সেই যকৃতের তেলের জন্যই এদের ধরা হয়। টাটকা বা শুকোনো মাংস খাওয়াও চলে। অন্য গণ দুটি হল রাইনা (Rhina) এবং রাইনোবেটস (Rhinobatos), আকারে ছোট, প্রধানত খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত।

ড্যাসিয়াটিডি গোত্র (Dasyatidae) **বা ট্রাইগোনিডি গোত্র** [Trygonidae, হুলওয়ালা রে বা চাবুক রে]

এরাই সেই বিখ্যাত রে মাছ, যারা লেজের হুল দিয়ে শিকারকে জখম করতে পারে। হুলটি হল কাঁটার রূপান্তর, সংখ্যায় একটি বা দুটি, সঙ্গে থাকে বিষের গ্রন্থি। ভারতীয় সমুদ্রে বেশ কটি গণ ও প্রজাতি আছে, তাদের মধ্যে ড্যাসিয়াটিস (Dasyatis) বা শঙ্কর মাছই সবচেয়ে পরিচিত।

হুলওয়ালা রে-র অন্য গণগুলো হল জিমন্যুরা (Gymnura), ইউরোজিমনস (Urogymnus) ও টিনিউরা (Taeniura)।

হুলওয়ালা রে-রা আকারে ছোট হলেও ব্যবসায়িক দিক দিয়ে মূল্যবান। এদের মাংস খাওয়া চলে, যকৃৎ থেকেও বেশ তেল পাওয়া যায়।

রাইনোপটেরিডি গোত্র [Rhinopteridee, (গরুমুখো রে, Cow Ray)]

এদের মাথায় গভীর খাঁজ, তার দু পাশে দুটি গোল পিণ্ড—দেখতে অনেকটা গরুর মাথার মতোই। চাকতির মতো শরীরটা চৌকোনা। লেজ লম্বা, চাবুকের মতো। মাছগুলো লম্বায় মিটার খানেক। তেল কম থাকায় অর্থনৈতিকভাবে এরা লাভজনক নয়। ভারতে চারটি প্রজাতি দেখা যায়।

মাইলিওব্যাটিডি গোত্র (Myliobatidae, ইগল রে)

ইগলের ছড়ানো ডানার মতো বুকের পাখনা থেকেই এইসব মাছের চলতি নামটি এসেছে। লেজ চাবুকের মতো, তাতে একটি কাঁটা। ভারতে দুটি প্রজাতি সাধারণত দেখা যায়। ইটোমাইলিয়স নিকোফিআই (Aetomylaeus nichofii) তথা মাইলিওবেটিস নিকোফিআই (Myliobatis nichofii, Day) থাকে গঙ্গার মোহনায়, চিল্কা হ্রদে, পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে। ইটোব্যাটস ন্যারিন্যারি (Aetobatus narinari) হল ভারতীয় ফুটকিওয়ালা ইগল রে-র একমাত্র প্রজাতি।

ন্যার্কোব্যাটিয়া বা টর্পেডিনিফর্ম-এর বেশ কিছু পরিচিত প্রজাতি ভারতে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে—

টর্পেডো মার্মোরেটা (Torpedo marmorata) হল সাধারণ বৈদ্যুতিক রে, যার দেহ 30-50 সেমি চওড়া এবং যার বড় দুটি বৈদ্যুতিক প্রত্যঙ্গ থাকে ফুলকোর কাছে।

নারসিন ব্রুনিয়া (Narcine brunnea) হল বোম্বাই থেকে হুগলি পর্যন্ত উপকূলের নিকটবর্তী জলের সাধারণ বৈদ্যুতিক রে।

নারকে ডিপটেরিজিয়া (Narke dipterygia) দেখা যায় করমণ্ডল উপকূলে এবং পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশার মোহনাগুলোতে।

পূর্ণাস্থি মাছ

ভারতের পূর্ণাস্থি মাছদের দুভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হবে: এক, মিঠে-জলের মাছ; দুই, সামুদ্রিক মাছ।

মিঠে-জলের মাছ

সাইপ্রিনিফর্ম (Cypriniforme) বা অস্টারিওফাইজি (Ostariophysi) বর্গের কার্প জাতীয় মাছ আর ক্যাটফিশ জাতীয় মাছই হল ভারতের মিঠে-জলের মাছেদের প্রায় 64 শতাংশ, খাবার হিসাবেও এরা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কার্প আর তাদের জ্ঞাতিগুষ্টিদের নিয়ে সাইপ্রিনি (Cyprini) বিভাগ, যাতে প্রায় 200 গণ। ক্যাটফিশদের নিয়ে সিল্যুরি (Siluri) নামক দ্বিতীয় বিভাগ, তাতেও 100 বা তারও বেশি গণ। প্রতিটি বিভাগের কিছু কিছু সুপরিচিত দৃষ্টান্ত এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে।

কার্প

ল্যাবেও রোহিতা (Labeo rohita Hum)

বাংলা—**রুই**, ওড়িয়া, হিন্দি, পঞ্জাবি—**রোহু**, মরাঠি—**তম্বাদা মাসা**, অসমীয়া—**রোহিতি**

সারা উত্তর ভারত এবং গোদাবরী নদী পর্যন্ত মধ্য ভারতের এটাই সবচেয়ে বিখ্যাত কার্প। দাক্ষিণাত্যেও একে আনার চেষ্টা হয়েছে গত কয়েক দশক ধরে। এখন এদের গোদাবরী আর কৃষ্ণা নদীতেও দেখা যায়।

রুইয়ের লম্বাটে শরীর, খানিকটা গোলাকার পেট। মাথা বড়, তুণ্ড ভোঁতা, পেট মোটা। শরীরের উপরটা বাদামি-ধূসর বা কালচে রঙের, আঁশের মাঝখানটা কমলা বা লালচে। পূর্ণবয়স্ক মাছের দৈর্ঘ্য হয় 90 সেমি।

ল্যাবেও রোহিতা ছাড়াও আরও কিছু প্রজাতি ছড়িয়ে আছে সারা উত্তর ভারত জুড়ে।

সিরাইনা মৃগেল (Cirrhina mrigal Ham)

বাংলা—**মৃগেল**, হিন্দি—**নারাইন**, তেলুগু—**ইয়েরামোসু**, ওড়িয়া—**মিরগা**, পঞ্জাবি—**মোরি**

এই কার্পেরও মোটামুটি চেহারা রুইয়েরই মতো, শুধু আরেকটু সরু। মুখও বেশি চওড়া, ঠোঁট আরেকটু পাতলা। শরীরের রং রুপোলি, পিঠ বরাবর গাঢ়-ধূসর, অনেক সময় তামাটে আভা-যুক্ত। বুক, শ্রোণী আর পায়ুর পাখনা কমলা রঙের, আগায় কালো ছোপ। মৃগেলের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় প্রায় 66 সেমি এবং ওজন 1.4-2.8 কেজি।

কাতলা কাতলা (Catla catla Ham)

বাংলা—**কাতলা**, হিন্দি (উত্তরপ্রদেশ)—**কাতলা**, তেলুগু—**বোটচি**, তামিল—**তেম্মু মীনু**, মলয়ালম—**কারকাতলা**, ওড়িয়া—**বরকুর**, কচ্ছ ও বোম্বাই—**তামব্রা**, পঞ্জাবি—**থেইলা**, উত্তরপ্রদেশ—**কাতলা**, অসমীয়া— **বৌধকেরা**

কাতলা হল ভারতীয় কার্পদের মধ্যে সবচেয়ে বড়, তার দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় প্রায় এক মিটার। সারা ভারতেই এদের পাওয়া যায়, তবে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে কিছু কম। শরীর চওড়া, মোটা ও বলশালী। পিঠটা বেশি কুঁজো। মাথা বড়, ঠোঁটও তাই। রং উপরের দিকে কালচে-ধূসর, দু পাশে রুপোলি। পিঠের দিকের আঁশের মাঝখানটা গোলাপি বা তামাটে, পেটের দিকের আঁশ সাদাটে।

সাইপ্রিনাস কার্পিও (Cyprinus carpio Linn.) বা **সাধারণ ইউরোপীয় কার্প**

ভারতের বাসিন্দা না হলেও চিন ও উত্তর-পূর্ব এশিয়া থেকে একে এনে ছাড়া হয়েছে নীলগিরি পর্বতমালার হ্রদগুলোতে। প্রথমে আনা হয়েছিল শ্রীলঙ্কায়, তারপর দক্ষিণ ভারতে এবং সেখানকার জলবায়ুর সঙ্গে তা খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। বছর জুড়ে বাচ্চা হয় এদের। নীলগিরিতে তিনটি জাত দেখা যায়: (১) সাইপ্রিনাস কার্পিও স্পেকিউলারিস (Cyprinus carpio specularis) বা মিরর কার্প (mirror carp); (২) সাইপ্রিনাস কার্পিও ন্যুডাস (C. c. nudus) বা লেদার কার্প (leather carp); এবং (৩) সাইপ্রিনাস কার্পিও কমিউনিস (C. c. communis) বা স্কেল কার্প (scale carp)। দৈর্ঘ্য প্রায় 76 সেমি., ওজন 6.5 কেজি।

যে-তিনটি প্রধান কার্পের কথা বলা হল তারা ছাড়াও কিছু ছোট জাতের কার্প পাওয়া যায় ভারতে। এদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হল পুনটিয়স (Puntius) বা বারবাস (Barbus)। সারা দেশে তাদের বেশ কটি প্রজাতি দেখা যায়। পুনটিয়স অ্যামফিবিয়স (Puntius amphibius), পুনটিয়স কর্নাটিকস, পুনটিয়স চোল, পুনটিয়স কুর্মুক, পুনটিয়স ডুবিয়স, পুনটিয়স জেরডনি, পুনটিয়স মাইক্রোপগন, পুনটিয়স সরন এবং পুনটিয়স সোফর সুপরিচিত ও ভক্ষ্য মাছ হিসাবে বাণিজ্যিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তবে প্রধান কার্পদের চেয়ে এদের মাংস একটু কম মোলায়েম ও কম সুস্বাদু।

উত্তর ভারতের একটি বিখ্যাত কার্প হল মহাশোল, যা তোড় (Tor) গণে পড়ে, যদিও আগে তাদের ভাগ হল বারবাস গণভুক্ত বলে।

তোড় তোড় (Tor tor Ham.) বা **বারবাস তোড়** (Barbus tor, Day)

বাংলা—**মহাশোল**, **তোড়**, হিন্দি—**নাহার্ম**, মরাঠি—**খাড়চি**, **মেণ্ডা**; কন্নড়—**পেরুভল**, মলয়ালম—**মেরুভাল**

এদের পাওয়া যায় উত্তর অক্ষাংশে পাহাড়ি নদীনালার উপরদিকে। প্রবল প্রবাহ ও স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো এদের শরীরের গড়ন। তুণ্ড চোখা, শরীর সরু, লেজ লম্বা।

স্যামনের মতো এরাও স্রোতের বিরুদ্ধে লাফ মেরে উজান বাইতে পারে। আঁশ গোলাকার ও ছয়কোনা, খুবই বড় হতে পারে। বস্তুত মহাশোলের আঁশকেই আধুনিক পূর্ণাস্থি মাছেদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বলে ধরা হয়। মাথা ও পিঠ গাঢ় সবুজ বা জলপাই রঙের, শরীরের উপর থেকে তলাটা ক্রমশ সোনালি থেকে সাদা হয়ে এসেছে। পাখনা হলদে, তার কিনারা লাল।

মহাশোল আকারে খুবই বড় বড় হয়, প্রায় মিটার খানেক। খাওয়ার মাছ হিসাবে এদের স্থান খুব উঁচু, কদর করেন ছিপশিকারিরাও। ভাকরা-নাঙাল ও পঞ্জাবের অন্যান্য বাঁধের জলাশয়ে এদের আবাদ হচ্ছে আজকাল।

ক্যাটফিশ বা সিলুরয়ড (Siluroid) মাছ

এরা হল মিঠে-জলের মাছেদের দ্বিতীয় প্রধান গোষ্ঠী। এদের মধ্যে অনেক গোত্র, অনেক গণ ও প্রজাতি, নদী-হ্রদের বড় বড় মাছ থেকে শুরু করে সমতল বা পাহাড়ি অঞ্চলের খাঁড়ি-নালার খুদে-খুদে বাসিন্দা। বেশির ভাগই খেতে ভাল। এদের আঁশ নেই, শিরদাঁড়া ছাড়া আর কাঁটাও নেই—অনেকেই তাই কার্পের চেয়ে এদেরই বেশি পছন্দ করে, যদিও ইহুদি ও মুসলমানদের মতো কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে এদের বিরুদ্ধে সংস্কারও আছে।

পরের কয়েকটি পৃষ্ঠায় বাছাই-করা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্যাটফিশের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

ওয়ালাগো আটু (Wallago attu Sch.)

বাংলা—**বোয়াল**, হিন্দি—**বোয়ালী**, মরাঠি—**শিভাড়া**, তেলুগু—**ভালুগা**, তামিল—**ভালাল**, কন্নড়—**বাহলে**, মলয়ালম—**আওভালাই**, পঞ্জাবি—**মুলি**

সিলুরয়ড মাছেদের মধ্যে এদেরই ব্যাপ্তি সবচেয়ে বেশি— সারা ভারতের নদী-হ্রদে এদের দেখা যায়। বিশাল মুখ, দাঁতাল চোয়াল আর শিকারি স্বভাবের জন্য কখনও-কখনও এদের ‘মিঠে-জলের হাঙর’ বলা হয়। দেহ দু পাশে চাপা, পিঠ সোজা। মাথা বিরাট, ধড় ছোট, ক্রমশ সরু-হওয়া লেজ বেখাপ্পা-রকম লম্বা। এক বা দু মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে, যদিও বাজারে মোটে 60-90 সেমি-ই দেখা যায়। অন্য মাছ, বিশেষত কার্পের পোনা খায়। ছিপশিকারিদের প্রিয় মাছ।

মাইস্টস সিংহালা (Mystus seenghala, Sykes) বা ম্যাক্রোনস সিংহালা (Macrones senghala, Day)

বাংলা—**আড়**, হিন্দি—**আড়ি**, **সিঙ্গারা**, মরাঠি—**সিঙ্গলা**, তেলুগু—**মুলতিজেল্লা**, তামিল—**কুম্বুকেলুত্তি**, কন্নড়—**শেড়ে**, মলয়ালম—**কারাড্ডা**, পঞ্জাবি—**সিঙ্গারী**

এ মাছ ব্যাগ্রিড (Bagrid) ক্যাটফিশদের দলের, যাদের পিঠের মেদীয় (adipose) পাখনাটি সুপুষ্ট। ভারতে এদেরও ব্যাপ্তি বিশাল— যমুনা, গঙ্গা, দাক্ষিণাত্য ও অসমের নদীতে এদের দেখা যায়। শরীরের উপরটা বাদামি, দু পাশ রুপোলি। এদের একটি বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন হল মেদীয় পাখনায় গোল গোল কালো ফুটকি। তুণ্ড রীতিমতো লম্বা। দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় প্রায় 120

সেমি। এ-ও শিকারি স্বভাবের— কার্প ও অন্য পূর্ণাস্থি মাছের বাচ্চা এবং চিংড়িকে আক্রমণ করে।

এদের আরও কটি জ্ঞাতি আছে। মাইস্টস ভিটেটাস (M. vittatus Bloch) সারা ভারতেই দেখা যায়, তবে তামিলনাড়ুতেই বেশি। মাইস্টস আওর-এর (M. aor Ham.) ব্যাপ্তিও বিশাল, লম্বাও হয় খুব—প্রায় এক মিটার। মাইস্টস ক্যাভেসিয়স (M, cavasius, Ham) আকারে ছোট, প্রায় আধ মিটার লম্বা, সমস্ত ভারতের মিঠে-জলেই এদের দেখা যায়। খাওয়ার মাছ হিসাবে কদর আছে।

রিটা রিটা (Rita rita. Hum) বা **রিটা বুকানানি** (Rita buchanani, Day)

তামিলনাড়ু আর কর্নাটক ছাড়া ভারতের সব জায়গার মিঠে-জলেই এই ছোট ব্যাগ্রিড ক্যাটফিশ দেখা যায়। রং বাদামি, তলার দিকে জলপাই বা আরও হালকা রঙের। গড় দৈর্ঘ্য 45 সেমি তবে 120–125 সেমি পর্যন্ত হতে পারে।

অম্পক বাইম্যাক্যুলেটস (Ompok bimaculatus, Bloch) বা **ক্যালিক্রস বাইম্যাক্যুলেটস** (Callichrous bimaculatus, Day)

বাংলা—**পাবদা**, হিন্দি—**পফতা**, তেলুগু—**ডুকাদামু**, তামিল—**ছোটাবাহলা**, কন্নড়—**গদলা**, মলয়ালম—**মুঙ্গি বাহলা**, পঞ্জাবি—**পাফতা**

সিলুরিড গোত্রের প্রতিনিধিস্থানীয় মাছ, চলতি নাম শিট ফিশ (sheat fish)। পিঠের পাখনা ছোট বা নেই, মেদীয় পাখনা নেই, পায়ুপাখনা বেশ লম্বা, দু-জোড়া শুঁড়। শরীর দু পাশে চাপা, রুপোলি বা ধূসর-বাদামি রঙের, তাতে লালচে-বেগনি আভা। বুকের পাখনার উপরে একটি কালো ফুটকি, পায়ু-পাখনার কিনারা কালো। লেজের পাখনা গভীরভাবে দু-ভাগ করা, প্রতিটি ভাগের ডগা ছুঁচলো। বাংলার পাবদা 15 সেমি খানেক লম্বা হয়। মালাবারে 50 সেমি পর্যন্ত লম্বা পাবদা ধরা পড়ে। চমৎকার খাওয়ার মাছ। সারা ভারতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে বড় বড় নদীতে তবে বেশি মেলে তামিলনাড়ু আর মালাবারে।

প্যাঙ্গাসিয়স প্যাঙ্গাসিয়স (Pangasius Pangasius Ham.) বা **প্যাঙ্গাসিয়স বুকানানি** (Pangasius buchanani, Day)

বাংলা—**পাঙাশ**, হিন্দি—**পরিয়াসি**, তেলুগু—**চোলুভাজেল্লা**, তামিল—**কোভাইলুলাকেলুতাই**

শিলবেইড (Schilbeid) গোত্রের ক্যাটফিশ। এদের ছোট বা মাঝারি দৈর্ঘ্যের পায়ুপাখনাটি দুভাগ-করা লেজের পাখনা থেকে একেবারেই আলাদা। পিঠে মেদীয় পাখনা। পিঠের প্রথম পাখনা ছোট, তাতে বিষগ্রন্থি-ওয়ালা কাঁটা থাকে। এ মাছ মিঠে-জলেও পাওয়া যায় ; মোহনায়, বিশেষত বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি মোহনাগুলিতেও পাওয়া যায়। শরীর রুপোলি, পিঠের দিকে কালচে, দু পাশে চকচকে লালচে-বেগনি। তুণ্ড আর গাল সোনালি। মাংসাশী মাছ ; অন্য মাছ, বিশেষত কার্পের বাচ্চা এবং শামুক-গুগলি শিকার করে।

ইউট্রোপিআইকথাইজ বাচা (Eutropiichthyes vacha Ham)

বাংলা—**বাচা**, হিন্দি—**বচ্ওয়া**, ওড়িয়া—**বাছুয়া**, পঞ্জাবি—জাল্লি

মাঝারি আকারের শিলবেইড ক্যাটফিশ, প্রায় 30 সেমি পর্যন্ত লম্বা হয়। উত্তর ভারতের বড় নদীগুলিতে প্রায়ই দেখা যায়। শরীব রুপোলি, পিঠের দিকে কালচে। সুস্বাদু মাছ।

ক্ল্যারিয়স ব্যাট্রাকস (Clarius batrachus, Linn) বা **ক্ল্যারিয়স মাগুর** (Clarias magur, Day)

বাংলা—**মাগুর**, হিন্দি—**মংরি**, তেলুগু—**মারপু**, তামিল—**মাসারাই**, মলয়ালম—**এরিভাহলে**, পঞ্জাবি—**কুগ্গা**

সাধারণভাবে বলা যায়, ক্ল্যারিড গোত্রের ব্যাপ্তি-আফ্রিকায় এবং ভারত-সহ দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় সীমাবদ্ধ। কেবল ক্ল্যারিয়স ব্যাট্রাকস প্রজাতিটিকে সারা ভারতের মিঠে ও নোনা জলে দেখা যায়। শরীর লম্বাটে, চাপা মাথার উপরে ও দু পাশে হাড়ের ফলক। ফুলকোর খোপে থাকে হাওয়া থেকে অক্সিজেন টানার সেই বিশেষ গাছের আকারের অঙ্গ। চার জোড়া শুঁড়, বুকের পাখনায় কাঁটা আছে, পিঠে পাখনায় নেই। মেদীয় পাখনা নেই' লেজের পাখনা গোল। রং সমানভাবে বাদামি বা ধূসর-কালো, লম্বা প্রায় 45 সেমি। খাবার হিসাবে কদর আছে। মজবুত জাতের মাছ, তাই পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হেটেরোপনিউস্টেস ফসিলিস (Heteropneustes fossilis, Bloch) বা **স্যাকোব্র্যাংকাস ফসিলিস** (Saccobranchus fossilis, Day)

বাংলা ও হিন্দি— **শিঙি**, মরাঠি—**বিছুকা মাছ**, তেলুগু—**মাপুজেল্লা**, মলয়ালম—**কাহারিমীন**, পঞ্জাবি—নুরি

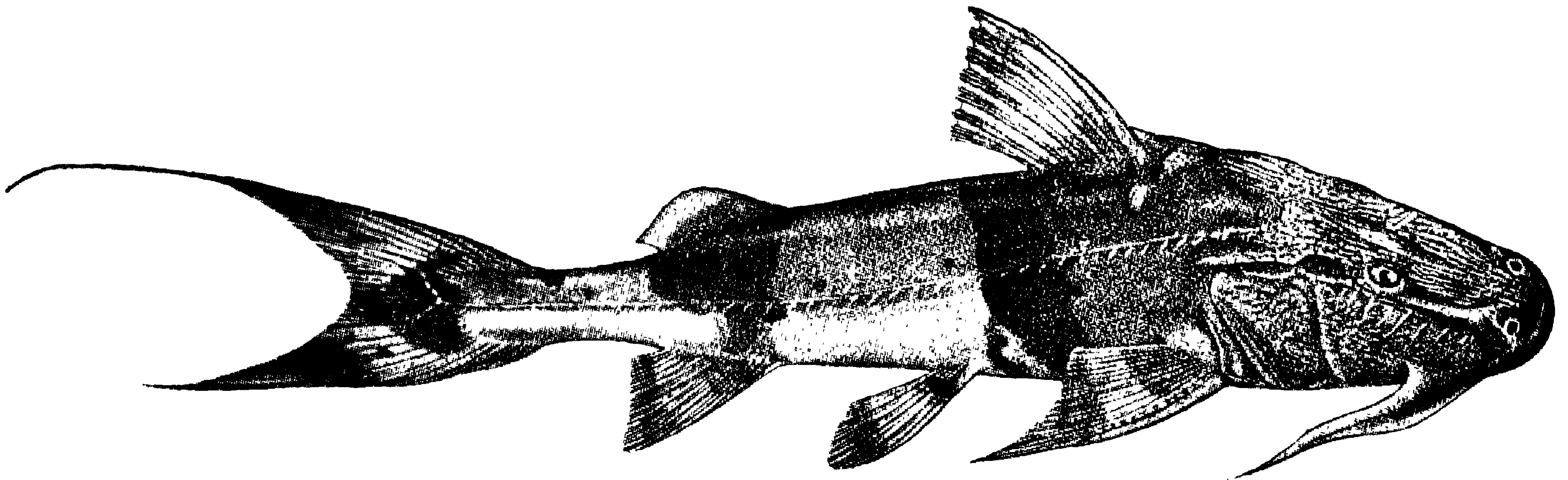
ক্যাটফিশদের হেটেরোপনিউস্টিড গোত্রের এই একটাই মাছ। মাথা চ্যাপ্টা, শরীর লম্বাটে ও দু পাশে চাপা। পিঠের পাখনা ছোট ও কাঁটা-ছাড়া। পায়ুপাখনা লম্বাটে। বুকের মজবুত পাখনায় বিষাক্ত কাঁটা। চারজোড়া লম্বা শুঁড়। হাওয়া থেকে শ্বাস নেওয়ার সহকারী অঙ্গের জন্য এ মাছ উল্লেখযোগ্য— সেই অঙ্গ দুটি হল ফুলকোর খোপ থেকে গজানো ও দেহের পেশিতে ঢাকা দুটি ফুসফুসের মতো থলি। মোহনায় ও মিঠে-জলে এ মাছ পাওয়া যায়। লম্বায় প্রায় 30 সেমি। খাদ্য হিসাবে জনপ্রিয়।

বেশির ভাগ ক্যাটফিশ মিঠে-জলের বাসিন্দা হলেও কোনও কোনও গোত্র সমুদ্রেও স্থান করে নিয়েছে। এদের মধ্যে বাণিজ্যিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি গোষ্ঠী হল ট্যাকিসুরিডি (Tachysuridae) বা অ্যারিআইডি (Ariidae)।

ট্যাকিসুরাস ডুসুমিরেরি (Tachysuress dussumieri, Val) বা **এরিয়াস ডুসুমিয়েরি** (Arius dussumieri, Day)

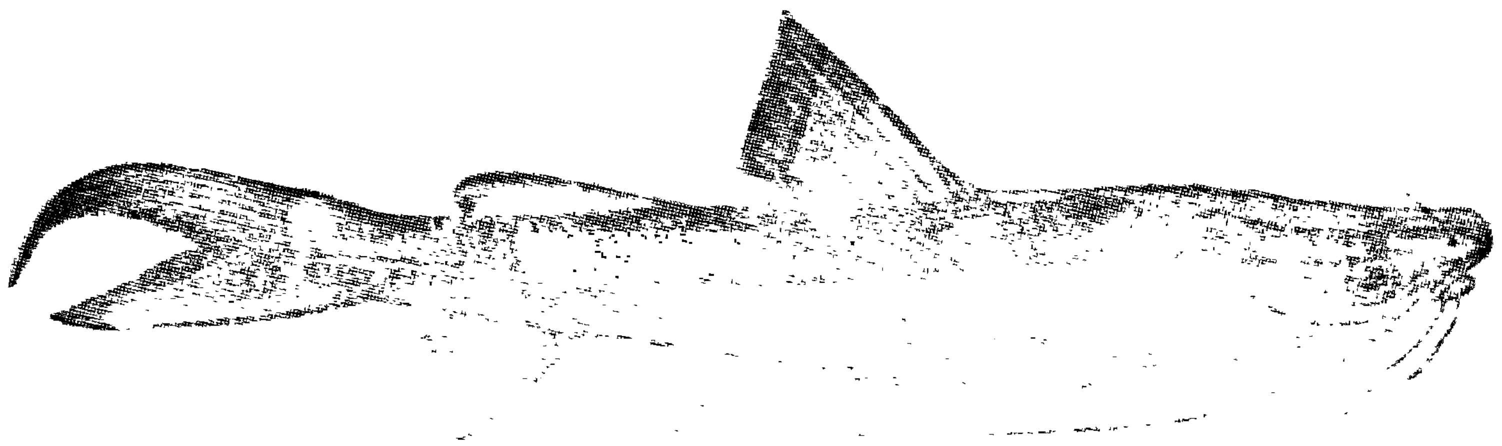
মারাঠী—**শিঙ্গালা**, তেলুগু—**জেডিজেল্লা**, তামিল—**মান্ডাইভাসি**, কন্নড়—**মঙ্গলশেড়ে**, মলয়ালাম—**ভলিয়েট্টা**

ছবি—V

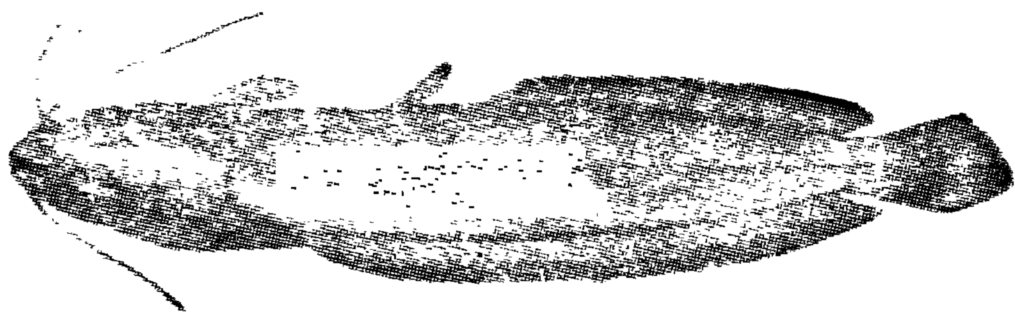


ক্যাটফিশ—গুঞ্চ (Goonch)

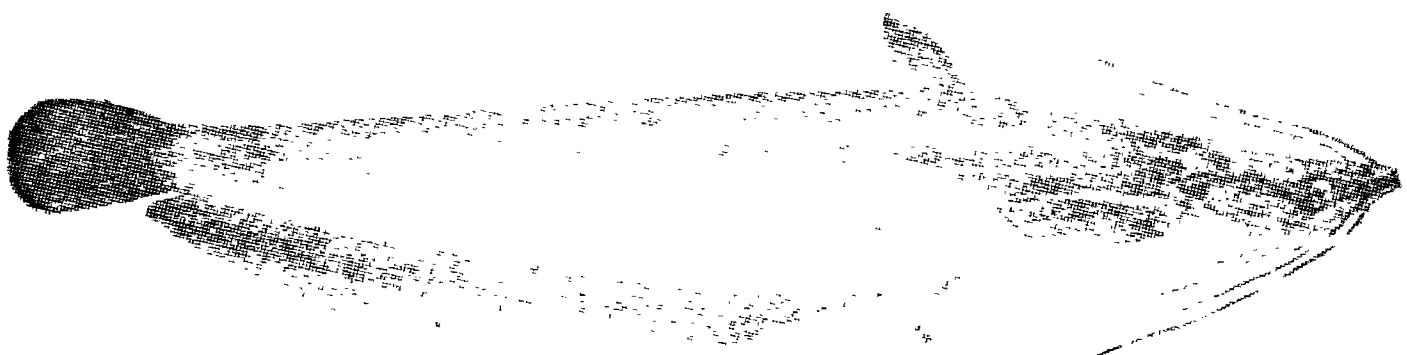
ছবি—VI



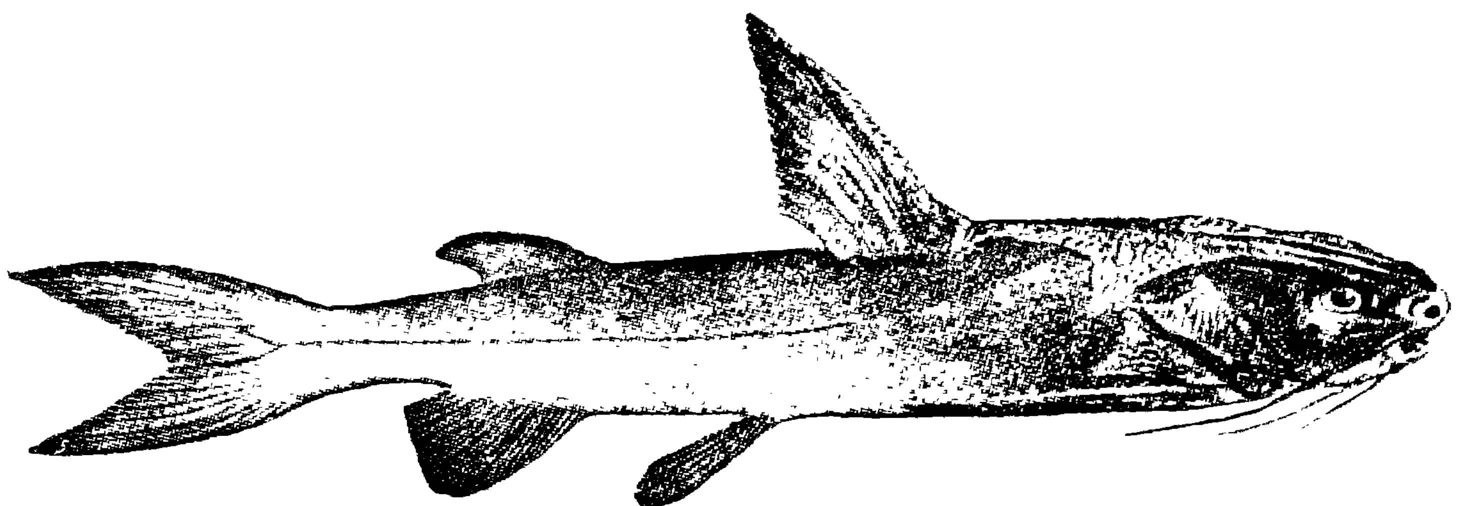
ক্যাটফিশ—আড়



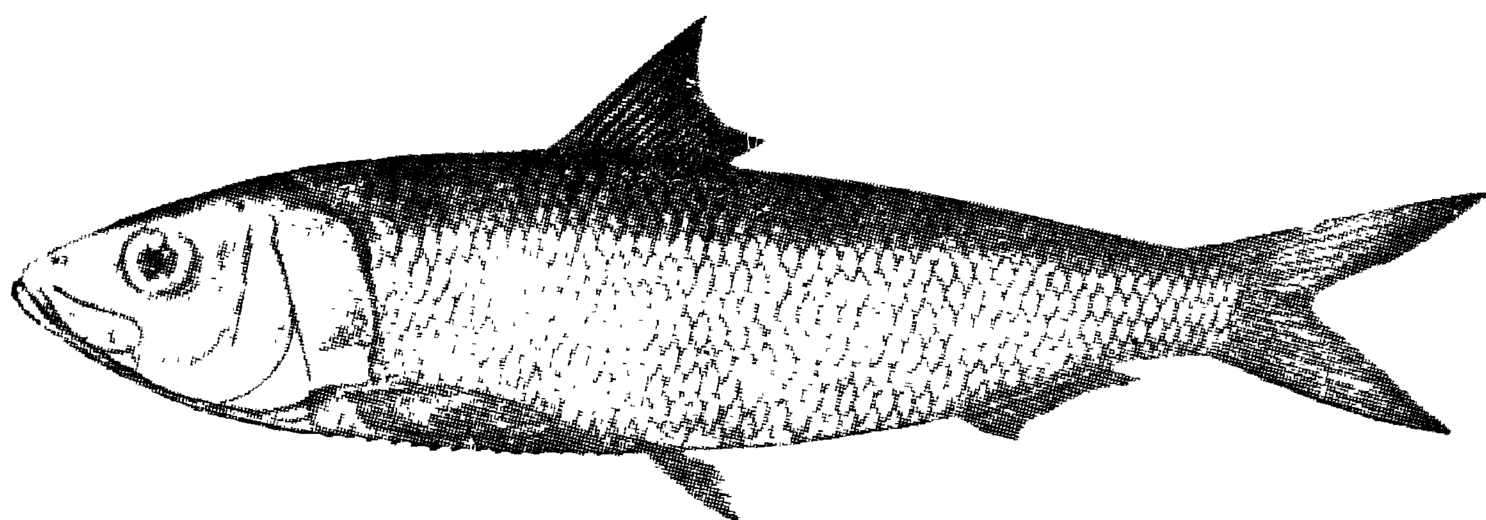
ক্যাটফিশ—মাগুর



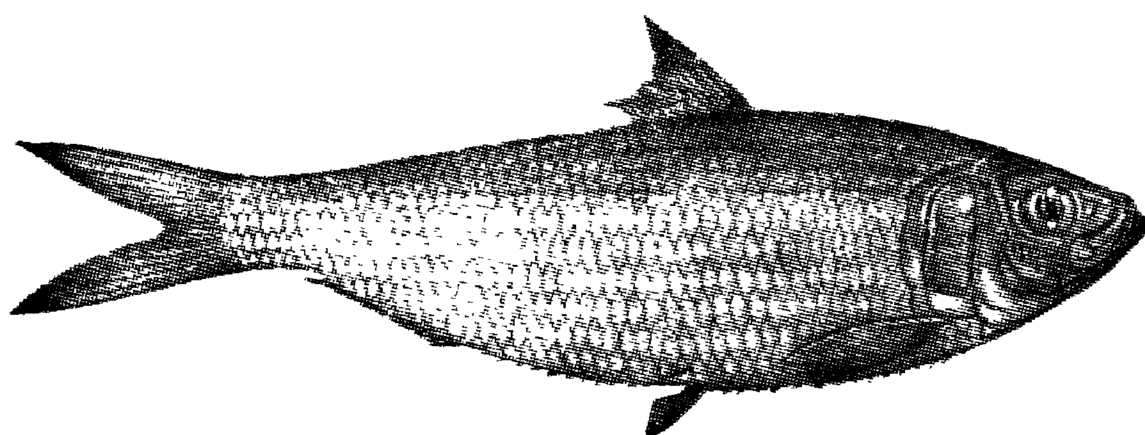
ক্যাটফিশ—সিঙ্গি



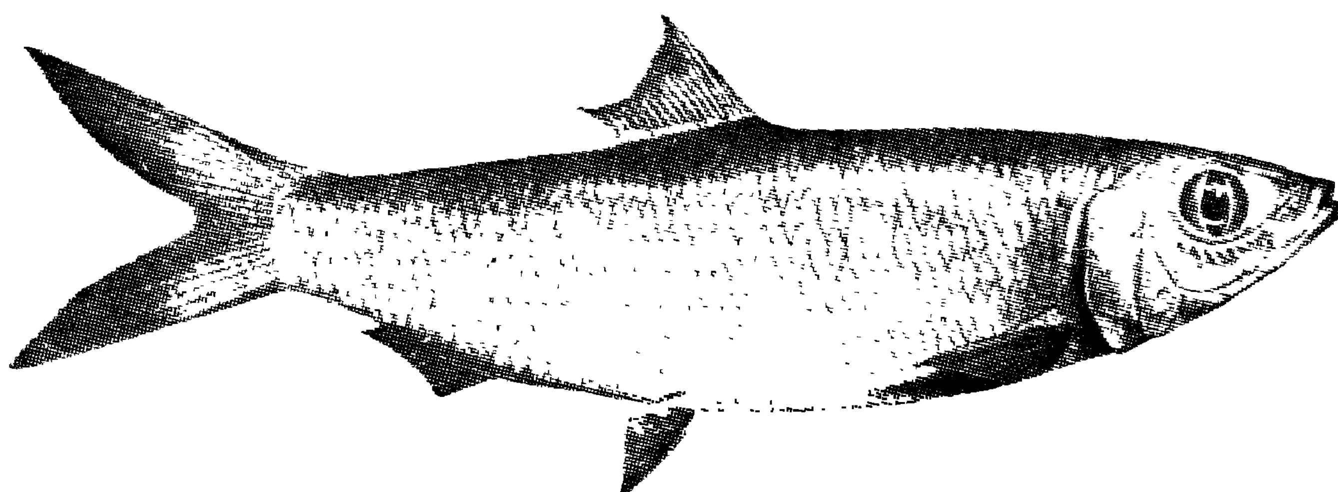
সামুদ্রিক ক্যাটফিশ



অয়েল সার্ডিন

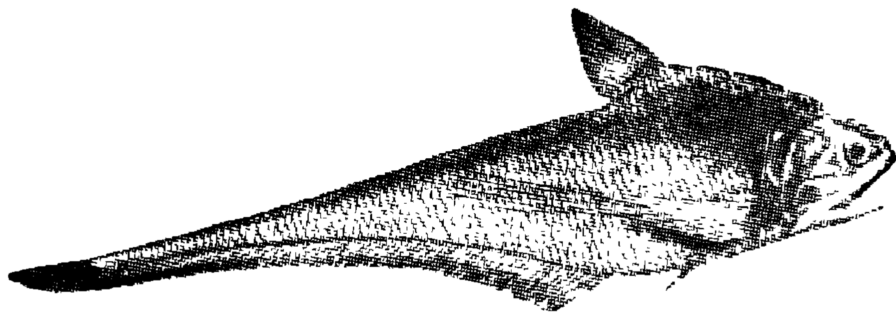


সাধারণ সার্ডিন

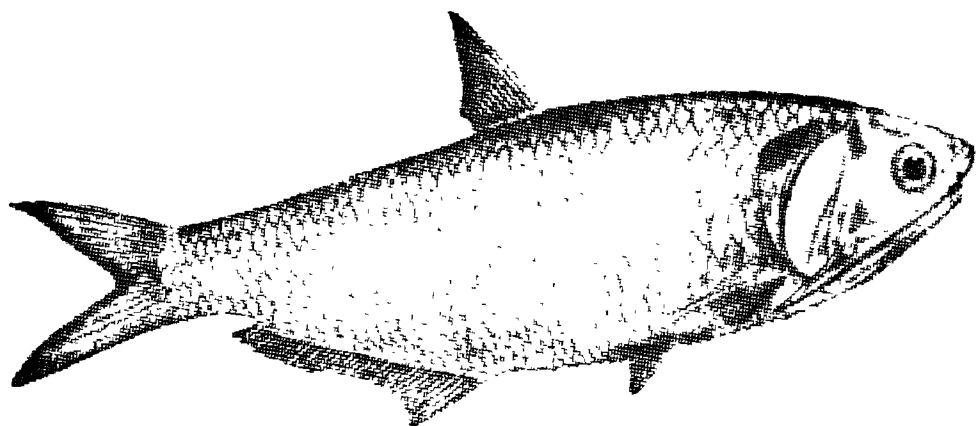


রেইনবো সার্ডিন

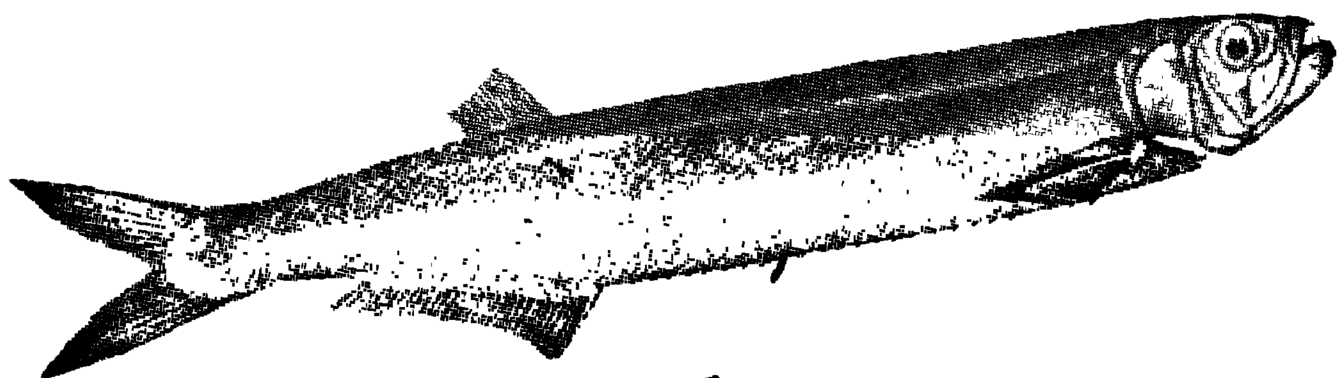
ছবি—VIII



অ্যাংকোভি

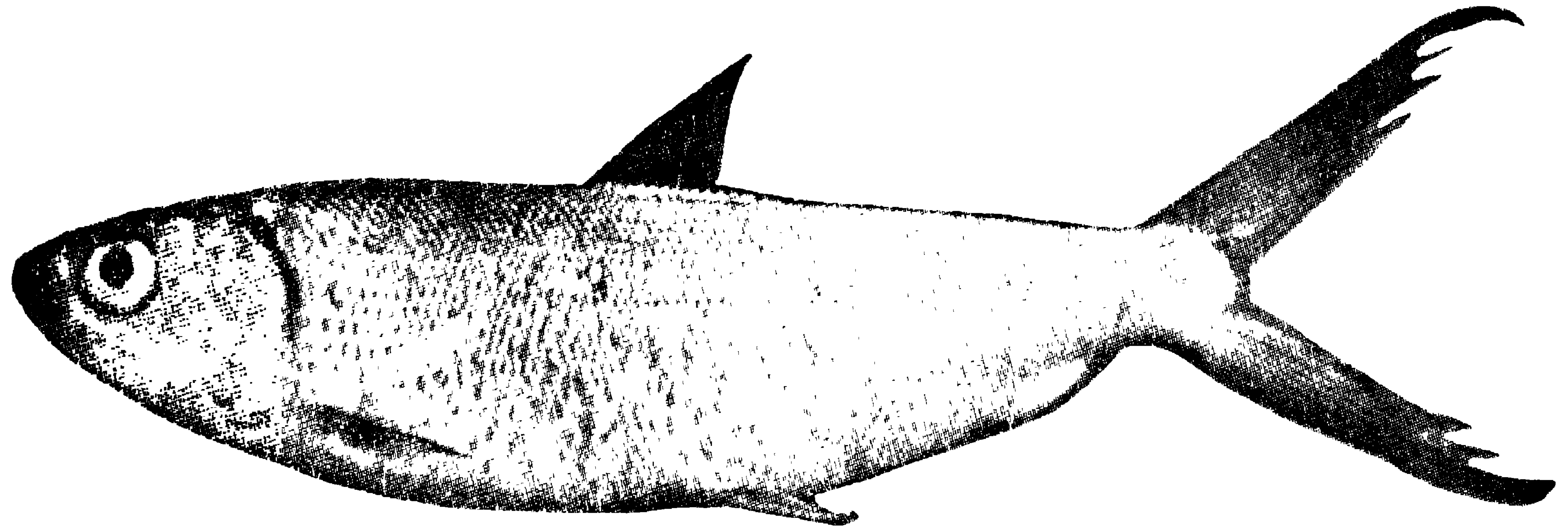


অ্যাংকোভি



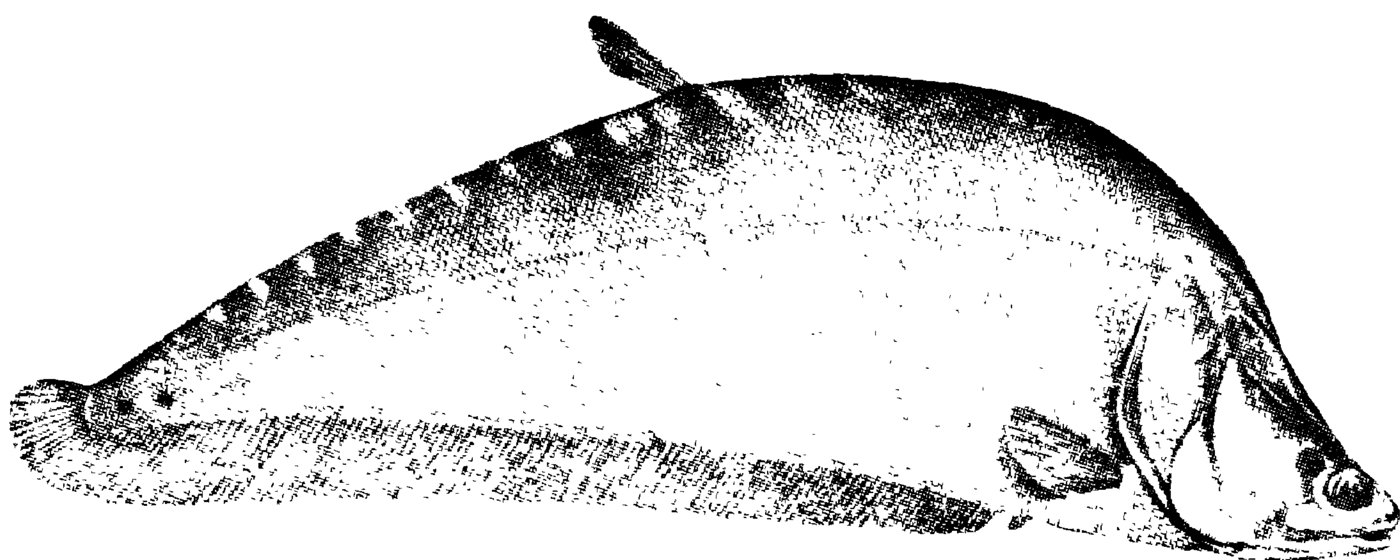
ধন্দা

ছবি—IX

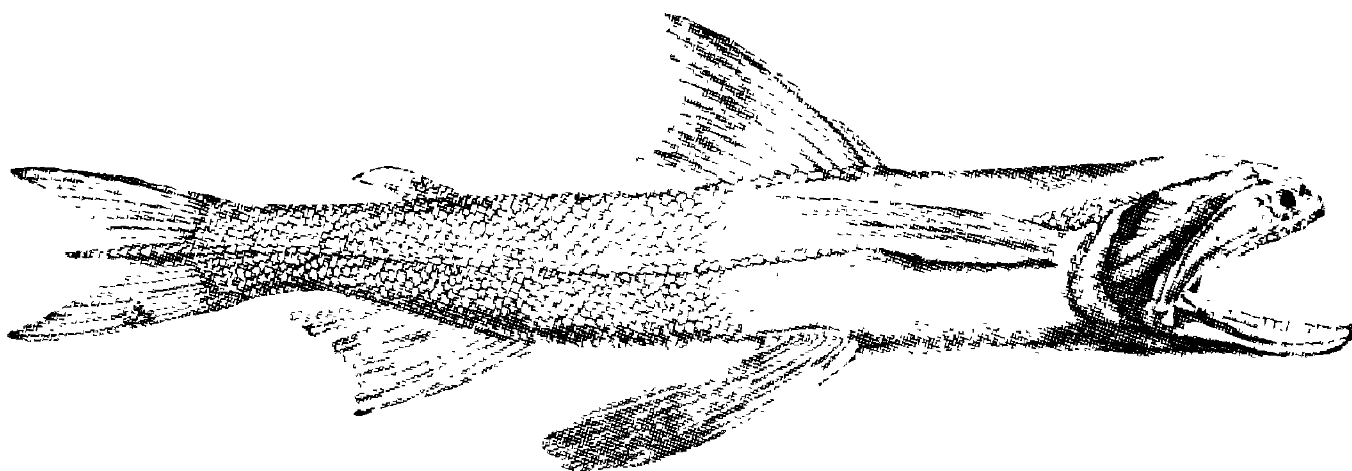


মিল্ক ফিশ

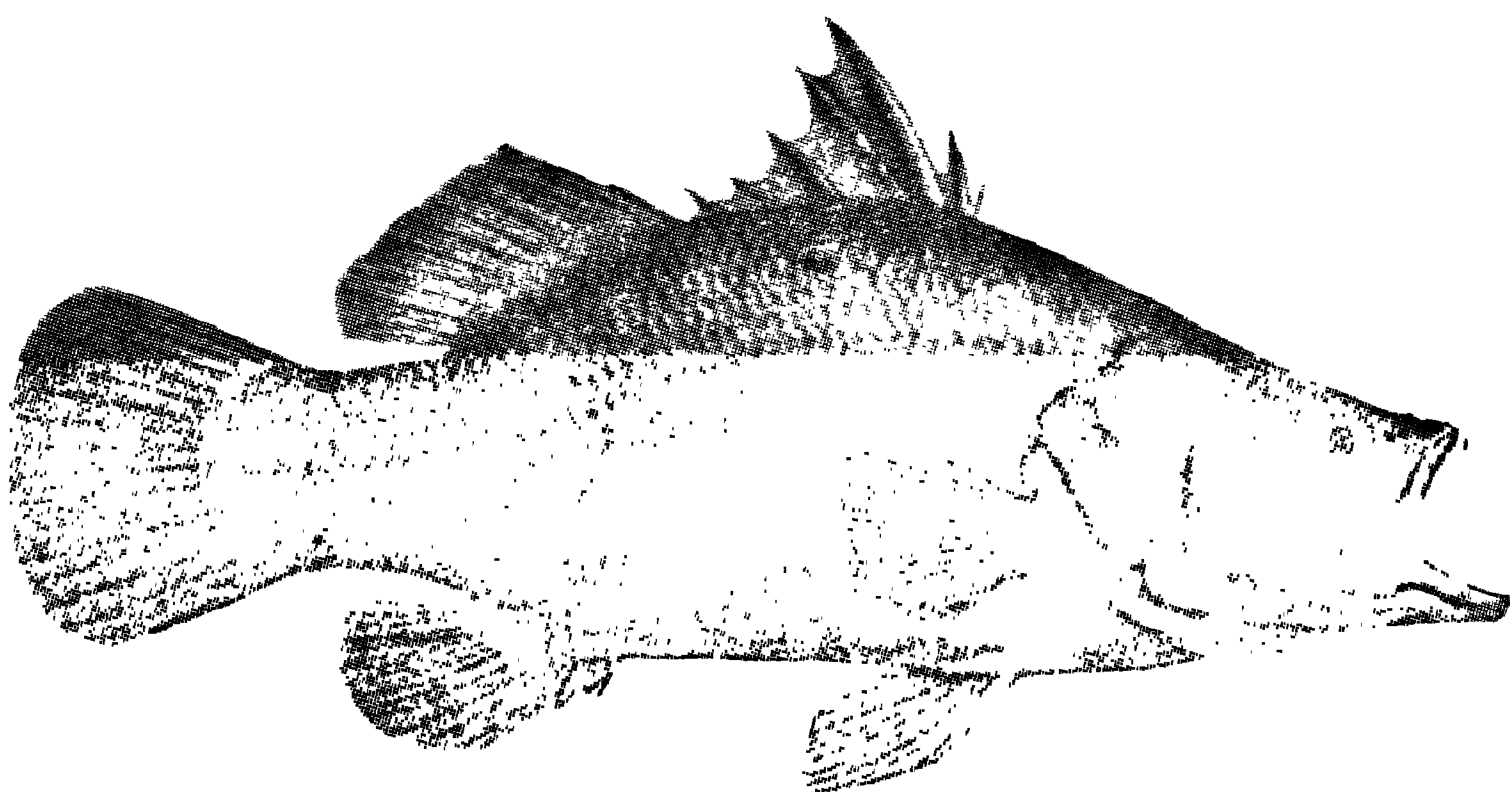
ছবি—X



চিতল



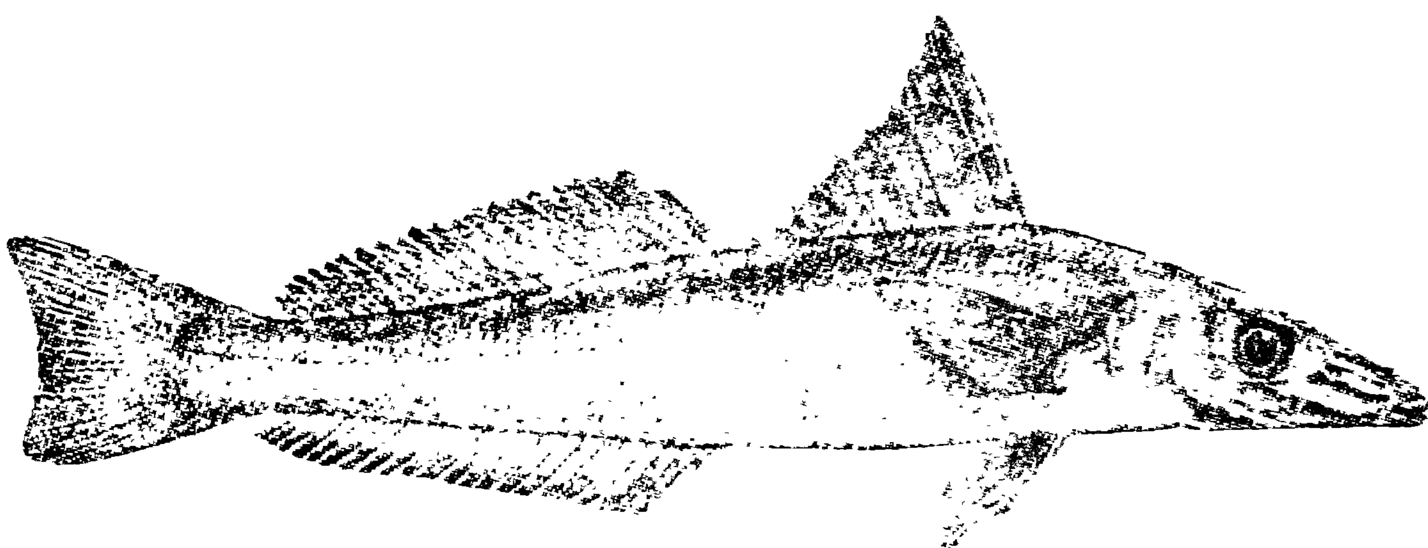
বম্বে ডাক



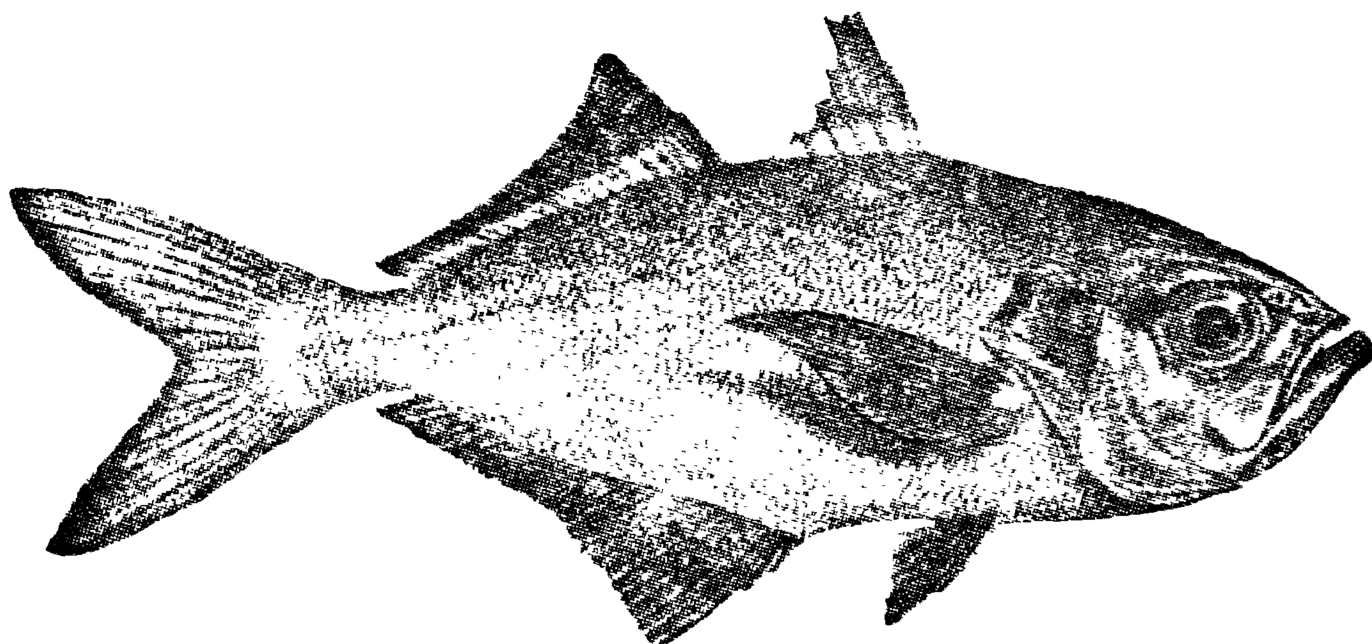
সামুদ্রিক পার্চ—ভেটকি



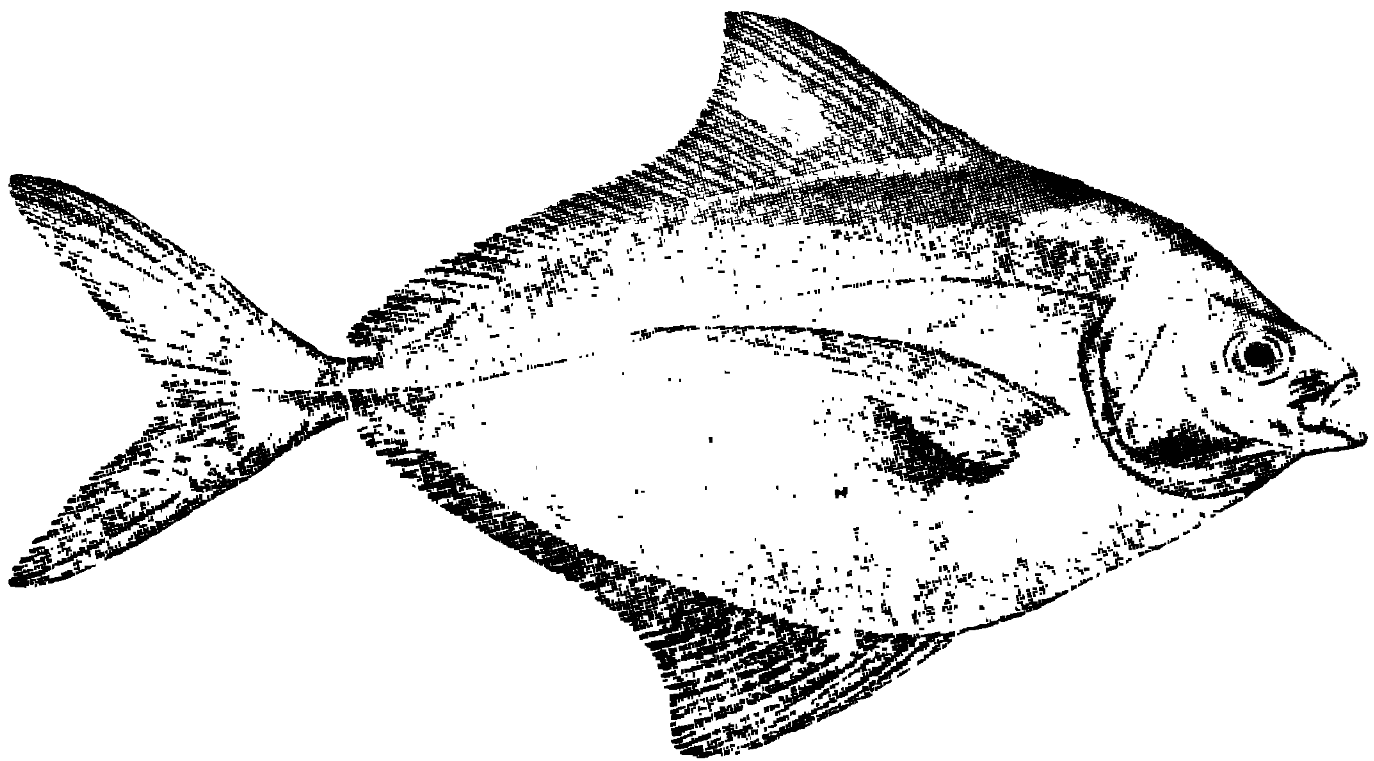
রক কড



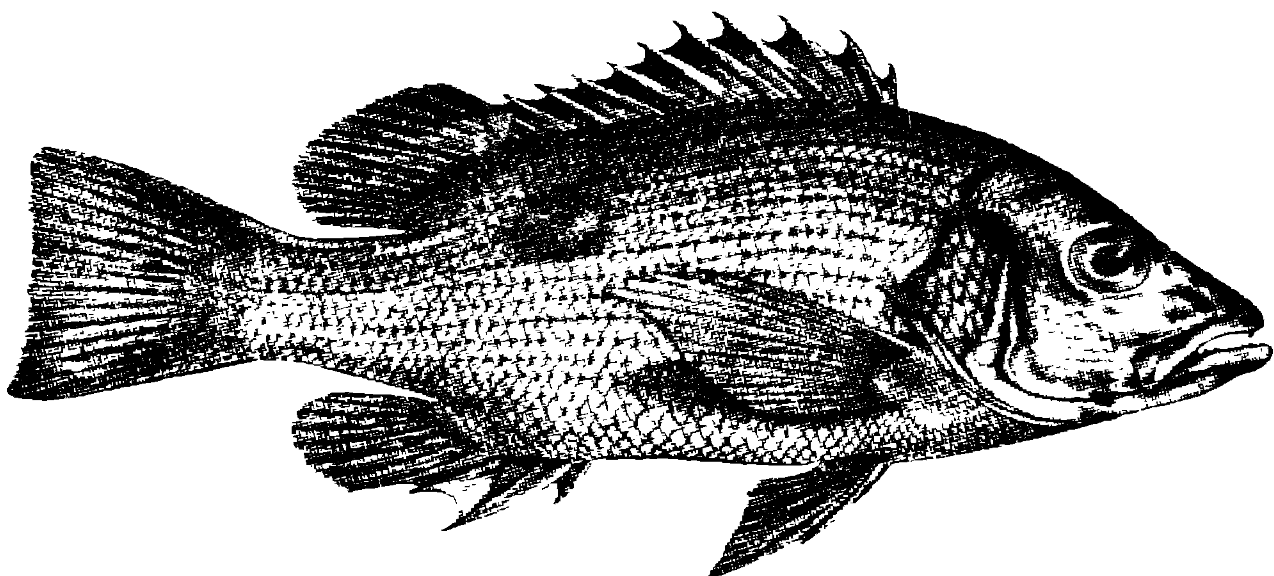
সান্ড হোয়াইটিং বা লেডিজ ফিংগার



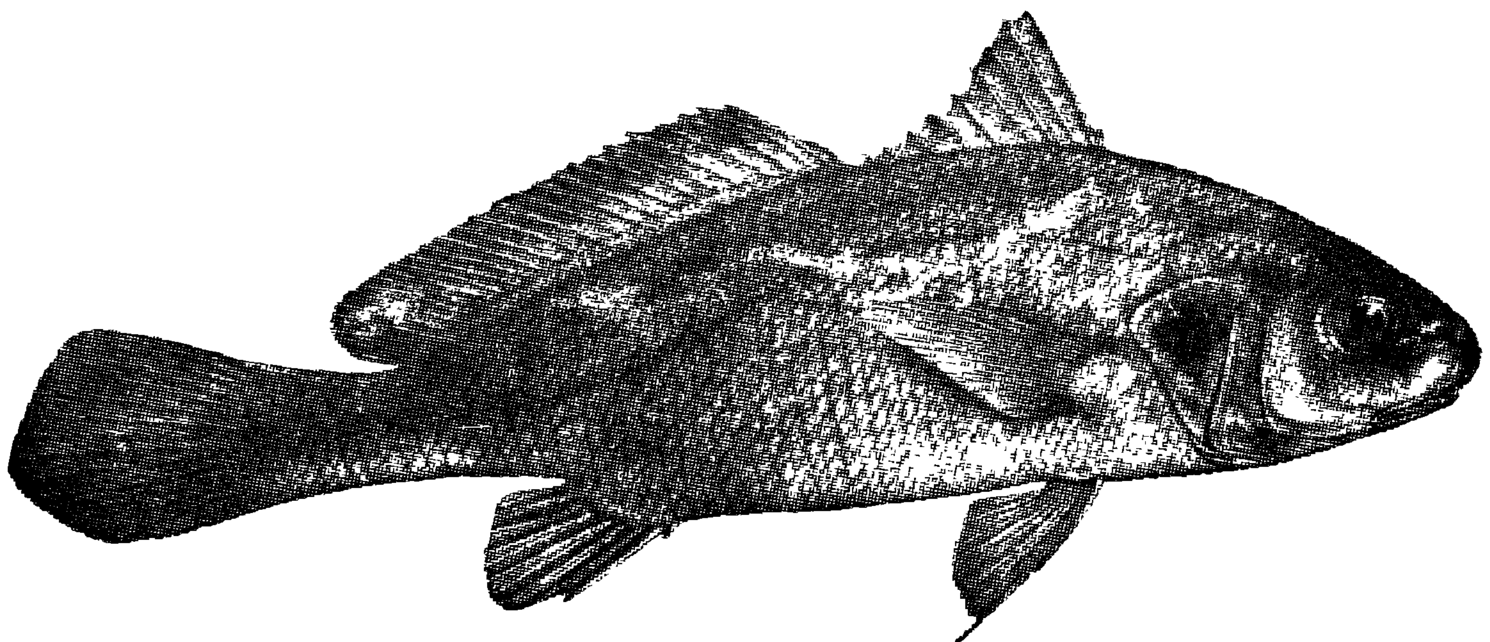
হোয়াইট ফিশ



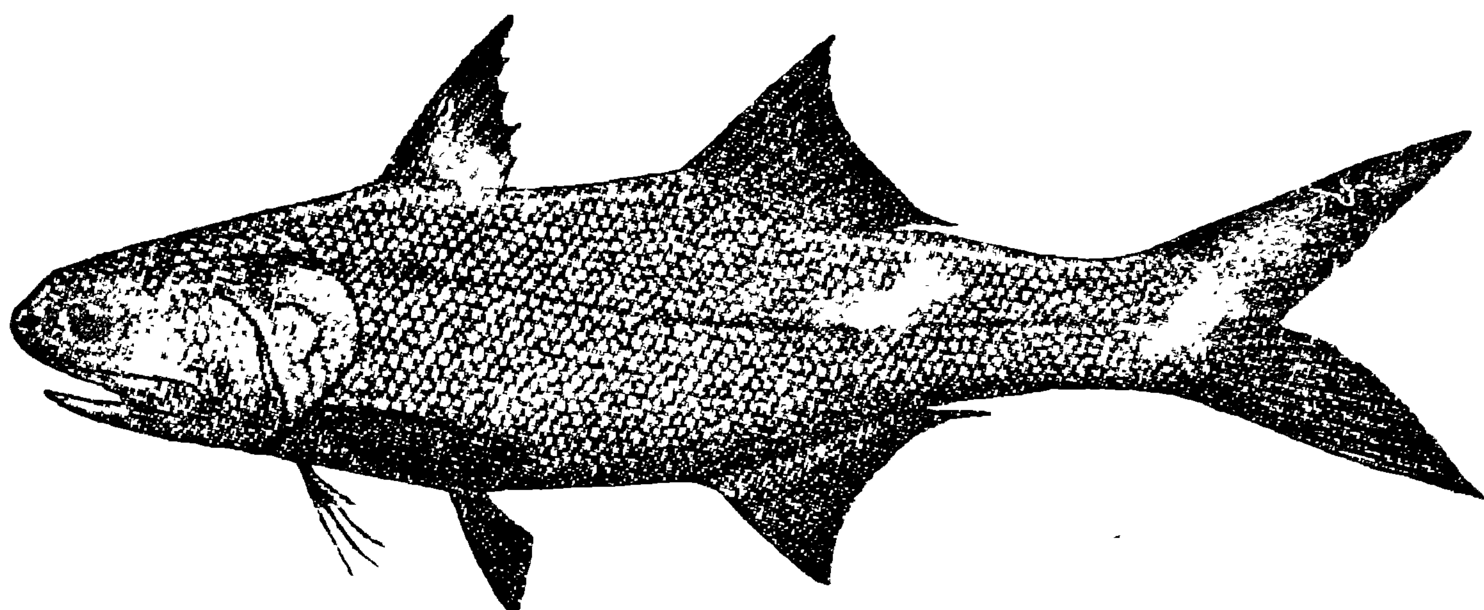
কালো পমফ্রেট



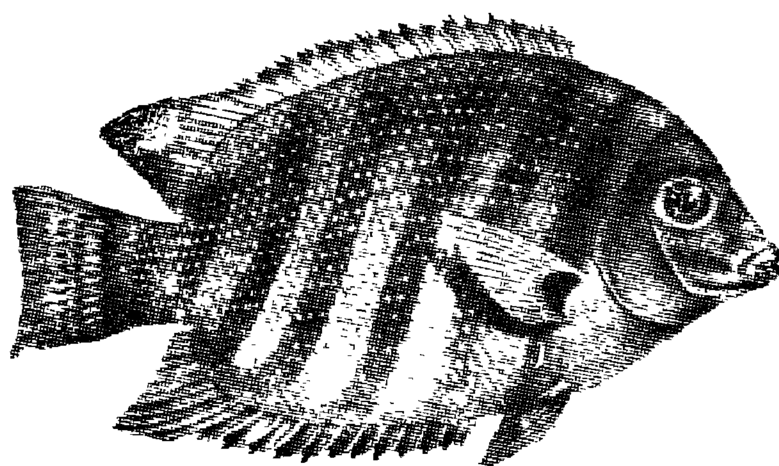
মোজেজ পার্চ (Moses Perch)



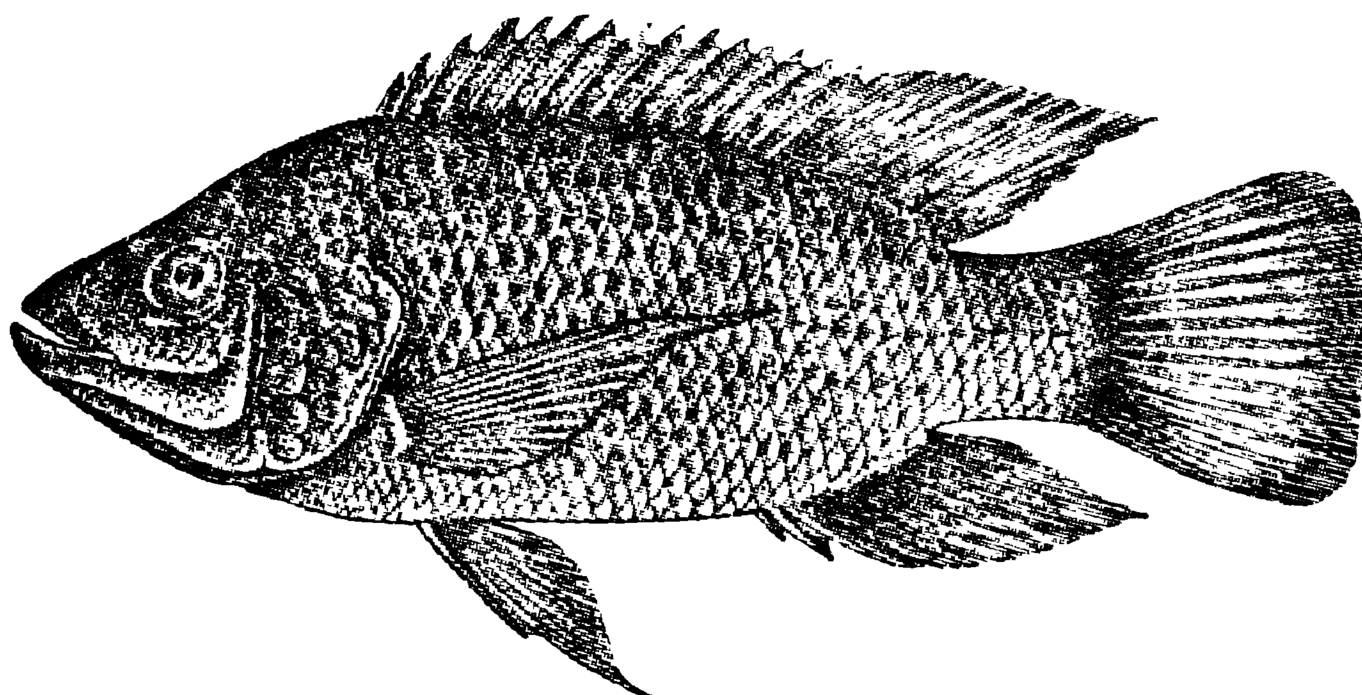
জু ফিশ (Jew Fish)



গুড়জালি (Indian Salmon)

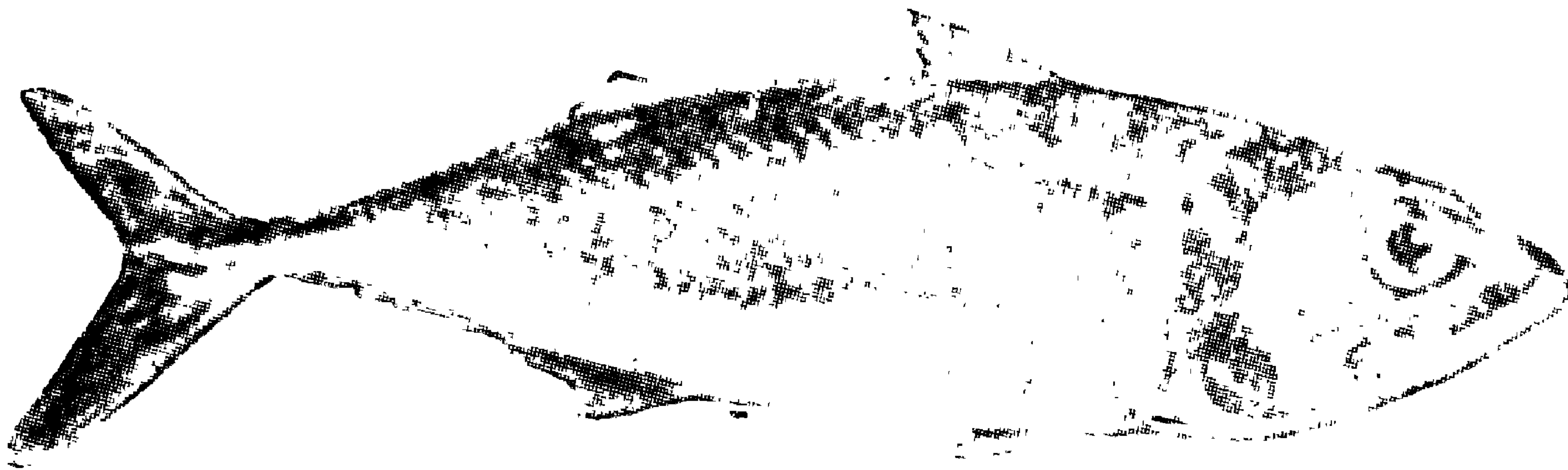


পার্লস্পট (Pearlspot)

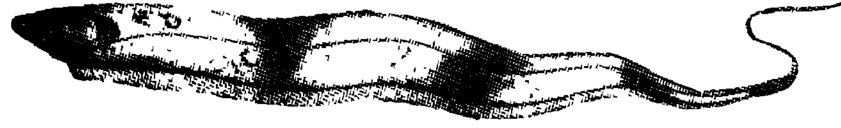


তেলাপিয়া

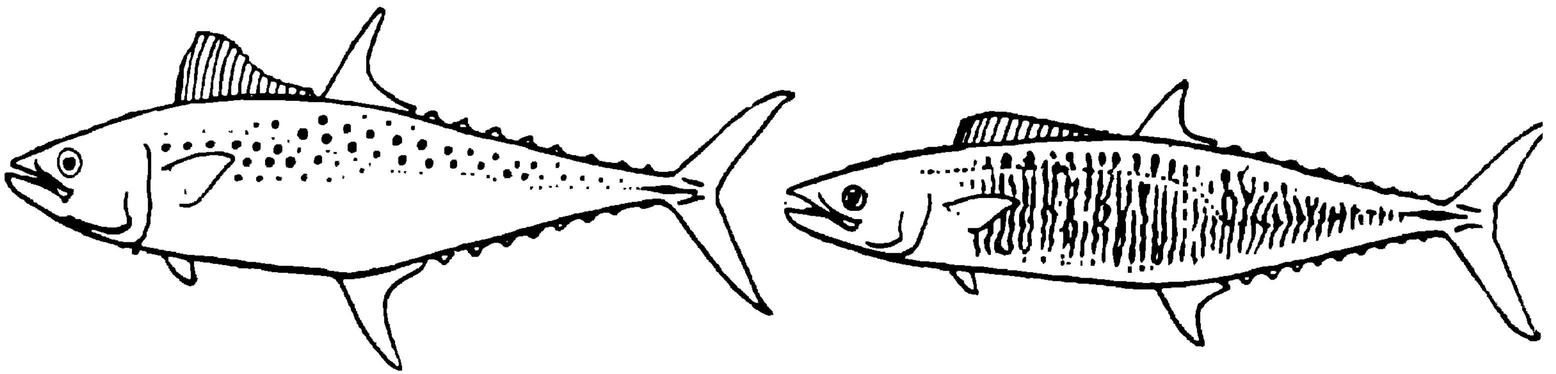
ছবি—XIV



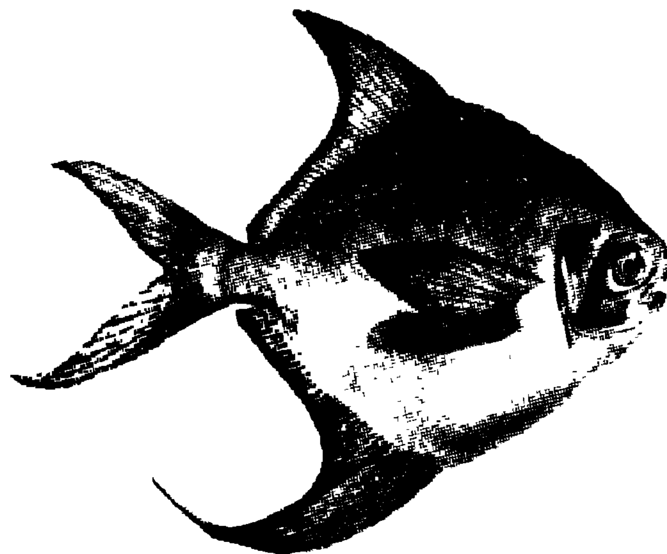
ভারতীয় ম্যাকেরেল (Indian Mackerel)



রিবন ফিশ (Ribbon Fish)

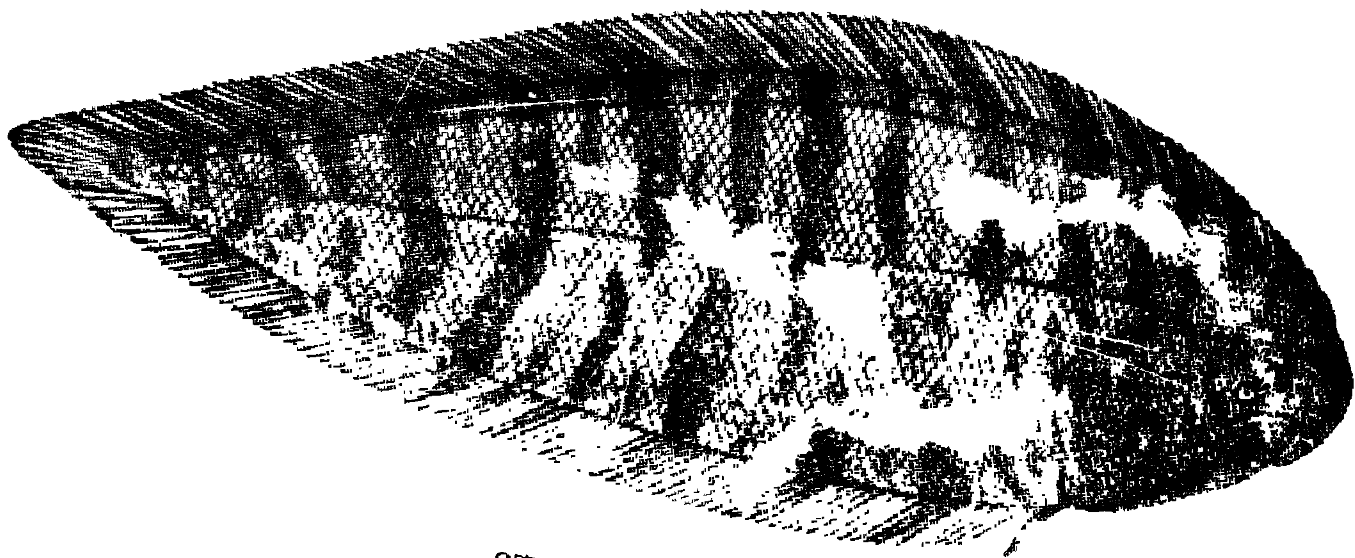


সিযাব ফিশ (Seer Fish)

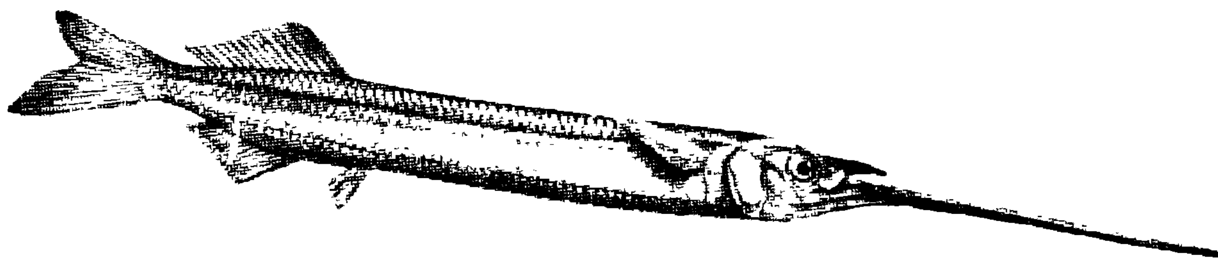


সিলভার পমফ্রেট (Silver Pomfret)

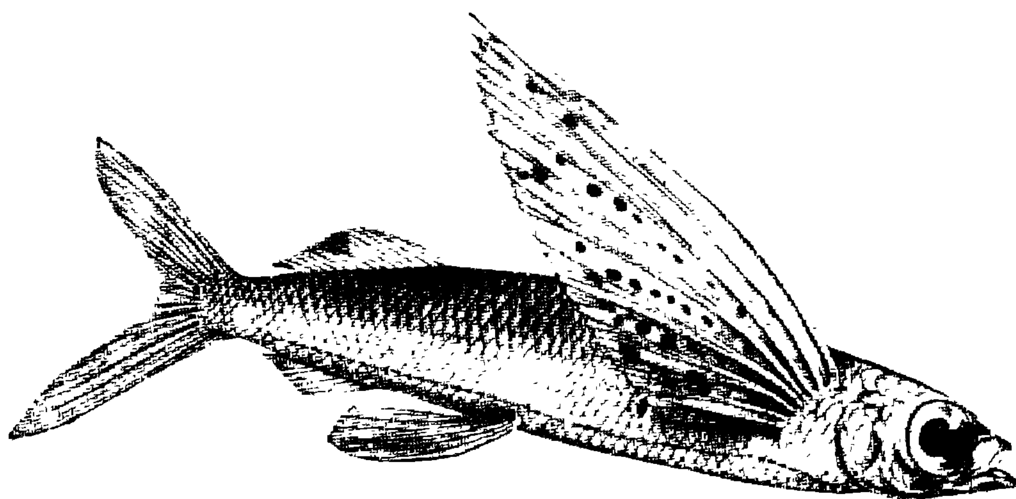
ছবি—XVI



পাতা মাছ (Sole)



সুবর্ণ-খড়কে (Half-beak)



উড়ুক্কু মাছ (Flying Fish)

মালাবার উপকূলেই বেশি পাওয়া যায়। শরীর শক্ত-সমর্থ, তুণ্ড চওড়া, পিঠের দিক নীলচে ও তলার দিক ফিকে। ব্যবসায়িক গুরুত্ব আছে। সামুদ্রিক ক্যাটফিশদের পটকা হল আইজিংগ্লাস-এর (isinglass) মূল্যবান উৎস।

অন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতিগুলো হল জেলা (T. jella) ম্যাকুলেটস (T. maculatus), সোনা (T. sona) এবং থ্যালাসিনাস (T. thalassinus)।

ভারতের সামুদ্রিক মৎস্য-ব্যবসায়ে এই সব ক্যাটফিশের গুরুত্ব আছে—বছরে 20,000-25,000 টন ধরা হয়ে থাকে।

মারেল (Murrel) বা **সাপমুখো** (Snake-heads) **মাছ—অফিওসেফালিফর্ম** (Ophiscephali-form) বা **চ্যানিফর্ম** (Channiforme) **বর্গ**

এই বর্গের মাছ প্রচুর দেখা যায় ভারত, ব্রহ্মদেশ, শ্রীলংকা, তাইওয়ান, মালয় উপদ্বীপ, থাইল্যাণ্ড, চিন এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। আফ্রিকাতেও কিছু প্রজাতি আছে।

ভারতে এদের গোটা আটেক প্রজাতি সুপরিচিত। মাথাটা সাপের মাথার মতো হওয়ার কারণেই এদের চলতি নাম 'সাপমুখো' বা 'Snake-head'। শরীর লম্বাটে, সামনের দিকে নলাকার, পিছনের দিকে চ্যাপটা। পিঠে আর পায়ুতে একটা করে লম্বা পাখনা। এরাও হাওয়া থেকে শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতার জন্য বিখ্যাত। গলবিলের তালুতে থাকে দুটি খোপ, তাদের ভিতরের আস্তরণে থাকে বাতাস নিতে সক্ষম প্রচুর রক্তনালী। এই প্রত্যঙ্গগুলির সাহায্যে মাছটি জলের বাইরে কয়েক ঘন্টা বেঁচে থাকতে পারে কিংবা এক জলা থেকে অন্য জলায় পাড়ি দিতে পারে। এদের তাই জিওল মাছ বলে। বাচ্চা লালনের জন্য এরা আদিম ধরনের বাসা বানায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি প্রজাতির বর্ণনা নিচে দেওয়া হল।

চানা ম্যারুলিয়স (Channamarulius, Ham) বা **অফিওসেফালাস ম্যারুলিয়স** (Ophio-cephalus marulius, Day)

বাংলা—**শাল**, হিন্দি—**পুমুরি**, তেলুগু—**পুল-আ-মালি**, তামিল—**অভিরি**, কন্নড়—**মাদিনজি**, মলয়ালম—**ব্রাল**, পঞ্জাবি—**কুরব্যহ, সল**

এটাই ভারতে সবচেয়ে বড় মারেল। এর দৈর্ঘ্য গড়ে 45 সেমি, তবে তা এক মিটারেরও বেশি হতে পারে। সব বড় নদীতেই এদের পাওয়া যায়, এদের অনেক জ্ঞাতির সঙ্গে এদের তফাত এই যে এরা বেলে বা পাথুরে তলদেশ-ওয়ালা পরিষ্কার জল পছন্দ করে। ভারতের কোনও কোনও জায়গায় পুকুর ও সেচনালিতে এদের আবাদ করা হয়। খাবার হিসাবে কদর আছে।

চানা পাংকটেটাস (Channa punctuatus Bloch) বা **অফিওসেফালাস পাংকটেটাস** (Ophiocephalus punctatus, Day)

বাংলা—**টাকি,** হিন্দি—**ফুল-ঢোক,** তেলুগু—**মিত্তা,** তামিল—**কোরাবা,** মলয়ালম—**কায়িচিল,** পঞ্জাবি—**দুলুঙ্গা।**

ছোট আকারের ব্যাপক-বিস্তৃত জাতের মাছ। বদ্ধ জল পছন্দ করে। রঙের তারতম্য হয় ; সাধারণত উপর দিকটা সবুজে-বাদামি আর তলার দিকটা হলদে, তবে লালচে-বেগনি থেকে কালো পর্যন্ত হতে পারে। দৈর্ঘ্য পাহাড়ে 11 সেমি, সমতলে 31 সেমি। প্রচুর বাচ্চা হয়। খেতে ভাল।

চানা স্ট্রায়েটাস (Channa striatus Bloch) বা **অফিওসেফালাস স্ট্রায়েটাস** (Ophiocephalus striatus, Day)

বাংলা—**শোল,** হিন্দি—**মোরুল,** মরাঠি—**সোহর,** তেলুগু—**কোররামীন,** তামিল—**বিরাহল,** মলয়ালম—**কান্নন,** পঞ্জাবি—**শোল।**

গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই মাছের ব্যাপ্তি। মাঝারি আকারের মাছ। শরীরের উপরের দিকে গাঢ় বাদামি বা কালো, তলার দিকে হলদেটে বা কমলা। বদ্ধ, ঘোলা জল পছন্দ করে। খায় কীট, পতঙ্গ, ব্যাঙাচি আর ব্যাং। অন্য মাছেদের মতো এরও খাদ্য হিসাবে কদর আছে।

মারেলরা প্রধানত জিওল মাছ। তাদের নরম ও চর্বিহীন মাংসের ঔষধগুণ আছে বলে মনে করা হয় ; বিশেষত অসুস্থ লোকের তা পুষ্টিকর পথ্য।

নোটপটেরিডি গোত্র (Notopteridae, চিতল)

নোটপটেরিডি গোত্রের চিতল জাতীয় মাছেরা মিঠে-জলের মৎস্য-ব্যবসায়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাই তাদের এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হল। এরা যে বর্গের অংশ সেই আইসোস্পন্ডিলি বা ক্লিউপিডফর্ম বর্গটি প্রধানত সামুদ্রিক। কিছু গোত্র এবং কোনও কোনও গণ বা প্রজাতি হয় মিঠে-জলে প্রজনন করেছে কিংবা আদিমকাল থেকে সেখানেই বিবর্তিত হয়েছে। **হিলসা ইলিশ** (Hilsa ilisha) হল প্রথম দলের উদাহরণ আর গ্যাডুসিয়া চাপরা (Gadusia chapra) দ্বিতীয় দলের।

এই গোত্রের মাছেদের গড়নটা বিশেষ রকমের— মাথা ছোট, চ্যাপটা শরীর, চাকুর মতো উপরে-বাঁকানো লেজ। শরীর খুদে-খুদে আঁশে ঢাকা। পিঠের ছোট পাখনা পালকের মতো উঁচিয়ে থাকে বলে ইংরেজিতে এদের চলতি নাম হয়েছে ‘ফেদারব্যাক’ (featherback)।

বুক আর শ্রোণী দু জায়গায় জোড়-বাঁধা পাখনা খুব ছোট। পায়ুর পাখনা লম্বা হয়ে লেজের পাখনার সঙ্গে জুড়ে মাছটির বিশিষ্ট আকার গড়ে তুলেছে। ভারতে দুটি প্রজাতি দেখা যায়।

নোটপটেরস চিতল (Notopterus chitala, Ham)

বাংলা—**চিতল**, হিন্দি (বিহার)—**মোহি**, তামিল—**আমবুতানঅলা**, ওড়িয়া—**পুল্লি**, পঞ্জাবি—**পুরি**

এই প্রজাতির পিঠ খুব কুঁজো। শরীর পিঠ বরাবর তামাটে-বাদামি কিংবা ধূসর, তাতে 15 বা 16টি আড়াআড়ি রুপোলি ডোরা। দৈর্ঘ্য গড়ে 25 সেমি, তবে তা এক মিটার পর্যন্ত হতে পারে। খাওয়ার মাছ হিসাবে ব্যবসায়িক গুরুত্ব আছে।

নোটপটেরস নোটপটেরস (Notopterus notopterus, Pallas) বা **নোটপটেরস ক্যাপিরাট** (N. Kapriat, Pallas Day)

বাংলা—**ফলুই**, হিন্দি—**ফলি**, তেলুগু—**উলাকতাত্তা**, তামিল—**আমবাতানকাতি**, পঞ্জাবি—**মোহ**

এ দেশের নোনা বা মিঠে জলে পাওয়া যায়। শরীর রুপোলি সাদা, পিঠ-বরাবর ছোট ছোট ধূসর ফুটকি। দৈর্ঘ্য গড়ে 25-45 সেমি, তবে তা 60 সেমি পর্যন্ত হতে পারে। তামিলনাড়ুর বড় বড় হ্রদ ও জলাধারে এর চাষ হয়। খাওয়ার মাছ হিসাবে চাহিদা আছে।

গ্রে মালেট (Grey Mullet) বা **মিউজিল** (Mugil) : **মিউজিলিডি গোত্র**

পার্সিফর্ম (Perciforme) বর্গ ও মিউজিলিডি গোত্রের এই মাছেরা ক্লিউপিফর্ম (Clupeiforme) বর্গের সাদা মালেট বা চানোস-এর (Chanos) থেকে আলাদা। গ্রে মালেটদের দেহ-মাথা দুইই বড় বড় গোল বা চিরনদাঁতি (Ctenoid) আঁশে ঢাকা। ভারতে যে 26টি প্রজাতির খবর পাওয়া গেছে তাদের বেশির ভাগই মোহনা ও সমুদ্রের বাসিন্দা, তবে কেউ কেউ নদীতে প্রব্রজন করে। বড় পুকুর ও দিঘিতে কিছু প্রজাতির চাষ হয়। মিঠে-জলের মৎস্য-ব্যবসায়ে যে তিনটি প্রজাতি গুরুত্বপূর্ণ তাদের বর্ণনা দেওয়া হল।

মিউজিল সেফালাস (Mugil cephalus, Linn) বা **মিউজিলওয়র** (Mugil oeur, Day)

বাংলা—**আঁই**, তেলুগু—**কাতিপারেগা**, তামিল—**মাদবাই**, কন্নড়—**মালা**, মলয়ালম—**টিরুতা**, বোম্বাই—**বোল**

গ্রে মালেটদের মধ্যে এই মাছই সবচেয়ে বড় এবং উপকূলের কাছাকাছি জলে সবচেয়ে ব্যাপক এলাকা জুড়ে ছড়ানো। এরা মোহনা ও নদীতে প্রব্রজন করে। দৈর্ঘ্য হয় গড়ে প্রায় 90 সেমি। তামিলনাড়ু ও কেরালার পুকুরে এদের চাষ হয়।

মিউজিল ম্যাক্রোলেপিস (Mugil macrolepis, Smith) বা **মিউজিল ট্রশেলি** (M. troschelli, Day)

বোম্বাই উপকূলে এবং দক্ষিণে মান্নার উপসাগর পর্যন্ত এদের পাওয়া যায়। নোনা-মিঠে দু রকম জলে খাপ খাইয়ে নিতে পারে বলে তামিলনাড়ুর হ্রদে-পুকুরে এর ব্যাপক চাষ হয়।

মিউজিল পার্সিয়া (Mugil parsia, Ham) বা **মিউজিল ডুসুমিয়েরি** (M. dussumieri, Day)

মাঝারি আকারের মালেট, দৈর্ঘ্য গড়ে 12-15 সেমি, তবে তা 25 সেমি পর্যন্ত হতে পারে। রং উপরের দিকে সবজে, শরীর বরাবর 3-6টি ডোরা। ভারতের উপকূলে সর্বত্রই এদের পাওয়া যায়, তবে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলেই বেশি।

স্ফাইরিনিডি গোত্র (Sphyraenidae): **ব্যারাকিউডা** (Barracuda)

ব্যারাকিউডা বা 'সি পাইক'রা (Sea pikes) মিউজিলদের আত্মীয়, তবে সামুদ্রিক। বড় আকারের ছিপছিপে এই সামুদ্রিক মাছটিকে ভারতের সমগ্র উপকূল জুড়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এর ব্যাপ্তি সারা পৃথিবী জুড়েই। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চারটি সুপরিচিত প্রজাতি আছে—ব্যারাকিউডা (Sphyraena barracuda, Walbaum), জেলা (S. jella, Cuvier), ফস্টেরি (S fosteri, Cuvier) ও অবটিউসাটা (S. obtusata, Cuvier)। প্রথম দুটির দৈর্ঘ্য প্রায় 1.5 মিটার, শেষ দুটির 40-60 সেমি। সচরাচর অবশ্য 20-30 সেমি-র চেয়ে বড় ধরা পড়ে না। ধরার সরঞ্জাম হল বঁড়শি আর সুতো, ফুলকো জাল (gill net), ভাসানে জাল (drift net) আর ট্রলার।

ব্যারাকিউডাদের শক্তিশালী চোয়াল, চ্যাপটা ধারাল ছোরার মতো দাঁত। শিকারি মাছ, অন্য মাছ খেয়ে বাঁচে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাসিন্দা বড় জাতের ব্যারাকিউডাগুলো হিংস্র ও নির্ভয়, তারা মানুষকে আক্রমণ করে বলে শোনা যায়, জেলেরা হাঙরের চাইতেও এদেরই বেশি ভয় পায়।

1969-80 সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধরা পড়েছিল 1974 সালে—4812 টন; 2265 টন ধরা পড়েছিল 1979 সালে, যার একটা বড় অংশই তামিলনাড়ুর। মোলায়েম মাংসের জন্য বড় জাতগুলোর চাহিদা আছে, সেগুলো টাটকাই বিক্রি হয়।

সামুদ্রিক মাছ

আইসোস্পন্ডিলি বর্গ (Isospondyli বা **ক্লিউপিফর্ম** (Clupeiformes)

এই বর্গে পড়ে সার্ডিন, হেরিং, অ্যাংকোভি (anchovies), স্যামন ও তাদের জ্ঞাতিরা। এরা প্রধানত সামুদ্রিক, কেউ কেউ মোহনা বা মিঠে-জলের অধিবাসী। বিশাল এই বর্গে

অনেক গোত্র, অনেক গণ। তাদের মধ্যে যেগুলো খাদ্য, তেল বা অন্য উপজাত দ্রব্যের উৎস হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ, এখানে কেবল সেগুলোরই আলোচনা করা হবে।

ব্যবসায়িক দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সার্ডিন আর হেরিং মাছ ক্লিউপিডি বর্গের অংশ। এরা বড় বড় ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায়। তুলনায় ছোট, প্রায় 15 সেমি লম্বা, এই সব মাছের শরীর সরু লম্বা ও দু পাশে চাপা, পেটের তলার কিনারা বরাবর কাঁটার মতো আঁশের সারি। মুখ বড়, চোয়াল দুটো সমান; আঁশ গোলাকার, সহজে ঝরে পড়ে। এই দলের বেশির ভাগ গুরুত্বপূর্ণ মাছ পড়ে সার্ডিনেলা (Sardinella), ডুসুমিয়েরিয়া হিলসা (Dussumieria Hilsa) এবং ইলিশ কিংবা পেলোনা (Pellona) গণে।

সার্ডিনেলার গোটা সাতেক প্রজাতি।

সার্ডিনেলা লঞ্জিসেপস (Sardinella longiceps) বা **ক্লিউপিয়া লঞ্জিসেপস** (Clupea longiceps).

সবচেয়ে পরিচিত। চলতি নাম অয়েল সার্ডিন বা মালাবার সার্ডিন।

মরাঠি—**হেয়ারড**, তেলুগু—**নুনা-কোভাল্লু**, তামিল—**পইচালাই**, মলয়ালয়ম—**নাল্লামাতি**

সিন্ধু থেকে অন্ধ্র উপকূল পর্যন্ত অয়েল সার্ডিন পাওয়া গেলেও তাদের সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় মালাবার ও কোংকন অঞ্চলে। এ মাছের শরীর লম্বাটে, মাথা বড়। পিঠের দিকে রঙ নীলচে-বাদামি, তাতে সোনালি আভা; পেট রুপোলি, তাতে লালচে-বেগনির আভাস। কানকোর উপরে একটা বড় সোনালি-সবুজ ছোপ হল এর বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন। টাটকা বা কৌটোবন্দি দুভাবেই খেতে চমৎকার। শরীরে তেল প্রচুর।

অন্য প্রজাতিগুলো হল ফিমব্রিয়াটা (S.fimbriata), অ্যালবেলা (S. albella), গিবোসা (S. gibbosa), মেলানিউরা (S. melanura), সিন্ডেনসিয়া (S. sindensia) এবং স্যর্ম (S. sirm)। এরাও খাওয়ার যোগ্য এবং তেল, মাছ-চারা (fish-meal) ও সারের উৎস।

রেনবো সার্ডিন বা সাধারণ স্প্র্যাট (common sprat) ডুসুমিয়েরিয়া (Dussumieria) গণের অন্তর্ভুক্ত। এদের দুটো প্রজাতি সুপরিচিত।

ডুসুমিয়েরিয়া অ্যাকিউটা (Dussumieria acuta, Val)

পূর্ব উপকূলের চিল্কা থেকে বোম্বাই পর্যন্ত এদের দেখা যায়।

দেখতে অয়েল সার্ডিনের মতোই, শুধু পেটে 'স্কিউট' (scutes) বা খোলস নেই, শরীরও বেশি গোলগাল। পিঠ-বরাবর রং নীলাভ সবুজ, তলার রং রুপোলি, দুইয়ের মাঝে একটা সোনালি পাড়, মাথা পান্না-সবুজ। এই বর্ণময় চেহারার কারণেই মনে হয় চলতি নাম হয়েছে রেনবো সার্ডিন।

ডুসুমিয়েরিয়া হাসেলটি (Dussumieria hasselti, Blkr)

এটি হল দ্বিতীয় প্রজাতি, পাওয়া যায় অন্ধ্র উপকূল থেকে কানাড়া অবধি।

সার্ডিন ব্যবসায়ে দুই প্রজাতিরই অবদান আছে।

ইলিশ (Hilsa) সারা ভারতে বিখ্যাত, বিশেষ করে বাংলায়। এরাই সবচেয়ে বড় সার্ডিন। ভারতে তিনটি প্রজাতি আছে।

হিলসা-ইলিশ (Hilsa ilisha, Ham) বা **ক্লিউপিয়া ইলিশ** (Clupea ilisha, Day)

বাংলা—**ইলিশ**, হিন্দি—**হিলসা**, তেলুগু—**পলাশা**, মরাঠি—**পালা**, তামিল—**উলাম**, কন্নড়—**পালিয়া**, মলয়ালম—**পালভা**, বোম্বাই—**চাকসি**, **পালভা**

শরীর দু পাশে চাপা ও আয়তাকার, পিঠ ও পেট সমানভাবে বাইরের দিকে বাঁকানো। এদের পাওয়া যায় পারস্য উপসাগর থেকে শুরু করে মায়ানমার (ব্রহ্মদেশ) পর্যন্ত ভারতের সারা উপকূল ধরে। নদীর উজানে এরা জোয়ার-সীমা পেরিয়ে চলে যায়—গঙ্গায় এদের এলাহাবাদ পর্যন্ত উঠে আসতে দেখা গেছে। রং রুপোলি, তাতে সোনালি ও লালচে-বেগনি আভা, উপরের দিকে সবজে-ভাব। গড় দৈর্ঘ্য 38-46 সেমি, সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য প্রায় 60 সেমি, ওজন 2.50 কেজি।

হিলসা ক্যানাগুর্টা (Hilsa kanagurta, Day) বা **ক্লিউপিয়া ক্যানাগুর্টা** (Clupia kanagurta, Day)

তেলুগু—**কীলী**, মলয়ালম—**আয়লে**

পিঠ নীলচে সবুজ, দু পাশ সোনালি, তাতে লালচে-বেগনি ফুটকি। কাঁধে একটা কালো ছোপ। বাচ্চা মাছের পায়ু-পাখনার কাছে 3-8টি ছোপ থাকতে পারে। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে পাওয়া যায় তবে ধরা পড়ে বেশি করমণ্ডল উপকূলে।

হিলসা টোলি (Hilsa toli, Val) বা **ক্লিউপিয়া টোলি** (Clupea toli, Day)

বাংলা—**চন্দনা-ইলিশ**, বোম্বাই—**ভিঙ**

বোম্বাই উপকূলেই বেশি দেখা যায়। ইলিশের চেয়ে এর লেজের পাখনা লম্বা, মাথা ছোট, আঁশ বড়। এর রং রুপোলি, তাতে হলুদ ও লালচে-বেগনি আভাস, পিঠ কালচে। দৈর্ঘ্য 60-90 সেমি। ক্যাম্বে ও বোম্বাই উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক মাছ।

পেলোনা ডিচেলা (Pellona ditchella, Val) বা **পেলোনা হিভেনিআই** (Pellona hoevenii, Day)

অন্ধ্র আর করমণ্ডল উপকূলে প্রচুর পাওয়া যায়।

এঙগ্রোলিডি গোত্র (Engraulidae): **অ্যাংকোভি** (Anchovies)

অ্যাংকোভিরা হল দ্বিতীয় বড় গোত্র, তার সদস্যরা হল প্রধানত অর্ধস্বচ্ছ, সামুদ্রিক, দলবদ্ধ ক্লিউপিডরা, যাদের উপরের চোয়ালের হনু (maxillary portion) পিছন দিকে চোখ পেরিয়ে প্রসারিত; মুখ চওড়া ও তেরচা। পার্শ্বরেখা নেই। পেটে অনেক তলিযুক্ত খোলস বা 'স্কিউট' (kelled scutes)।

অ্যাংকোভিদের মধ্যে চারটি প্রধান গণ: সেটিপিনা (Setipinna), কয়লিয়া (Coilia), থ্রিসোক্লেস (Thrissocles) ও অ্যাংকোভিয়েলা (Anchoviella)।

সেটিপিনা ব্রেভিসেপ্স (Setipinna breviceps, Cantor) বা **এংগ্রোলিস ব্রেভিসেপস** (Engraulis breviceps, Day)

মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের জলে ও মোহনাগুলোতে এদের পাওয়া যায়। দেহের উপরিভাগ তুণ্ড ও পিঠ-পাখনার মাঝখানটায় রীতিমতো কুঁজো, নিম্নভাগ প্রায় সোজা। মুখ খুবই তেরচা, নীচের চোয়াল বাইরে বের করা। শরীর রুপোলি-সবজে- হলুদ; পিঠ-পাখনা, লেজের পাখনা এবং পায়ু-পাখনার পিছনের অংশ কালো কিনারা-দেওয়া।

সেটিপিনা ফ্যাসা (Setipinna phasa, Ham) বা **এংগ্রোলিস টেলারা** (Engraulis telara, Day)

বাংলা—**ফ্যাঁসা**, হিন্দি—**বিন্দি**

সাধারণত এদের গাঙ্গেয় অ্যাংকোভি বলে অভিহিত করা হয়, বাংলা ও ওড়িশার উপকূলে পাওয়া যায়, মোহনা পেরিয়ে নদীর উজানে জোয়ার-সীমা পর্যন্ত উঠে আসে। পিঠ-বরাবর সবজে রং, দু পাশ রুপোলি, পেট সোনালি। দৈর্ঘ্য 40 সেমি বা তারও কম।

সেটিপিনা টেটি (Setipinna taty, Val) বা **এংগ্রোলিস টেটি** (Engraulis taty, Day)

শরীর আয়তাকার ও ভীষণ চাপা, বোম্বাই ও ওড়িশার সমুদ্রে-মোহনায় পাওয়া যায়। দেহের উপর দিক গাঢ় সবুজ বা সবজে হলুদ, বাকিটা রুপোলি। দৈর্ঘ্য 15 সেমি।

কয়লিয়া গণের অ্যাংকোভিদের সহজে চেনা যায় তাদের বিশিষ্ট গড়ন দিয়ে। এদের লেজের দিকটা লম্বা ও ক্রমশ সরু হয়ে গেছে, পায়ু-পাখনা জুড়ে গেছে লেজের পাখনার সঙ্গে। বুকের পাখনায় কটি আলগা তন্তু।

কয়লিয়া ডুসুমিয়েরি (Coilia dussumieri, Val)

ওড়িয়া—**উরিআম্লি**, বোম্বাই—**মান্ডেলি**

এই প্রজাতিটিই সবচেয়ে পরিচিত। ওড়িশা ও বোম্বাইয়ের মোহনাগুলোয় প্রায়ই দেখা যায়। সোনালি রং, শরীরের নিম্নাংশ বরাবর দু-তিনটি উজ্জ্বল চকচকে ফুটকির সারি। 5-6টি

আলগা বুকের অস্থ শরীরের প্রায় মাঝখান অবধি বিস্তৃত।

আর যে দুটি **প্রজাতি** সচরাচর দেখা যায় সেগুলো হল— **করমণ্ডল** উপকূলে কয়লিয়া বোর্নিনসিস (Coilia borneensis) এবং বাংলার উপকূলে কয়লিয়া র‍্যামক্যারাট (C. ramcarat)।

থ্রিসোক্লেস গণেও (আগে এদের এংগ্রোলিস-এ ফেলা হত) প্রতিনিধিস্থানীয় অ্যাংকোভিরা রয়েছে। ভারতে এই গণের আটটি প্রজাতি সুপরিচিত।

বিলেমা (T. boelema, Forsk)— শরীর রুপোলি, উপর দিকটা নীলচে, মাথা সোনালি, কাঁধে একটা কালচে ছোপ। আন্দামানে প্রচুর পাওয়া যায়।

ডুসুমিয়েরি (T. dussumieri, Val)— তামিলনাড়ু ও মালাবার উপকূলের একটি সাধারণ অ্যাংকোভি।

হ্যামিলটনি (T. hamiltoni, Gray)

তেলুগু—**পুরুবা**, মলয়ালম—**চারলে**

ভারতের সমুদ্রে ও মোহনাগুলোতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে এরা। শরীর রুপোলি, পিঠ কালচে; কাঁধে কালো ডোরা; বুকের পাখনা পর্যন্ত চোয়াল; পিঠ আর লেজের পাখনার কালো কিনারা। দৈর্ঘ্য 15 সেমি। বোম্বাই উপকূলে খুব খাওয়া হয় এদের।

ক্যামেলেনসিস (T. kammelensis, Blkr)

অন্য জায়গার চেয়ে বঙ্গোপসাগরেই বেশি দেখা যায়। শরীর সোনালি, পিঠ কালচে, কাঁধে সাধারণত একটি কালো ছোপ।

ম্যালাবারিকাস (T. malabaricus, Bloch)

ভারতের সব সমুদ্রেই ছড়িয়ে আছে। শরীর রুপোলি, তাতে সোনালি আর লালচে-বেগনি আভা। কাঁধে একগোছা উপশিরার কালো ছোপ। দৈর্ঘ্য প্রায় 17 সেমি।

মাইস্ট্যাকস (T. mystax, Sch)

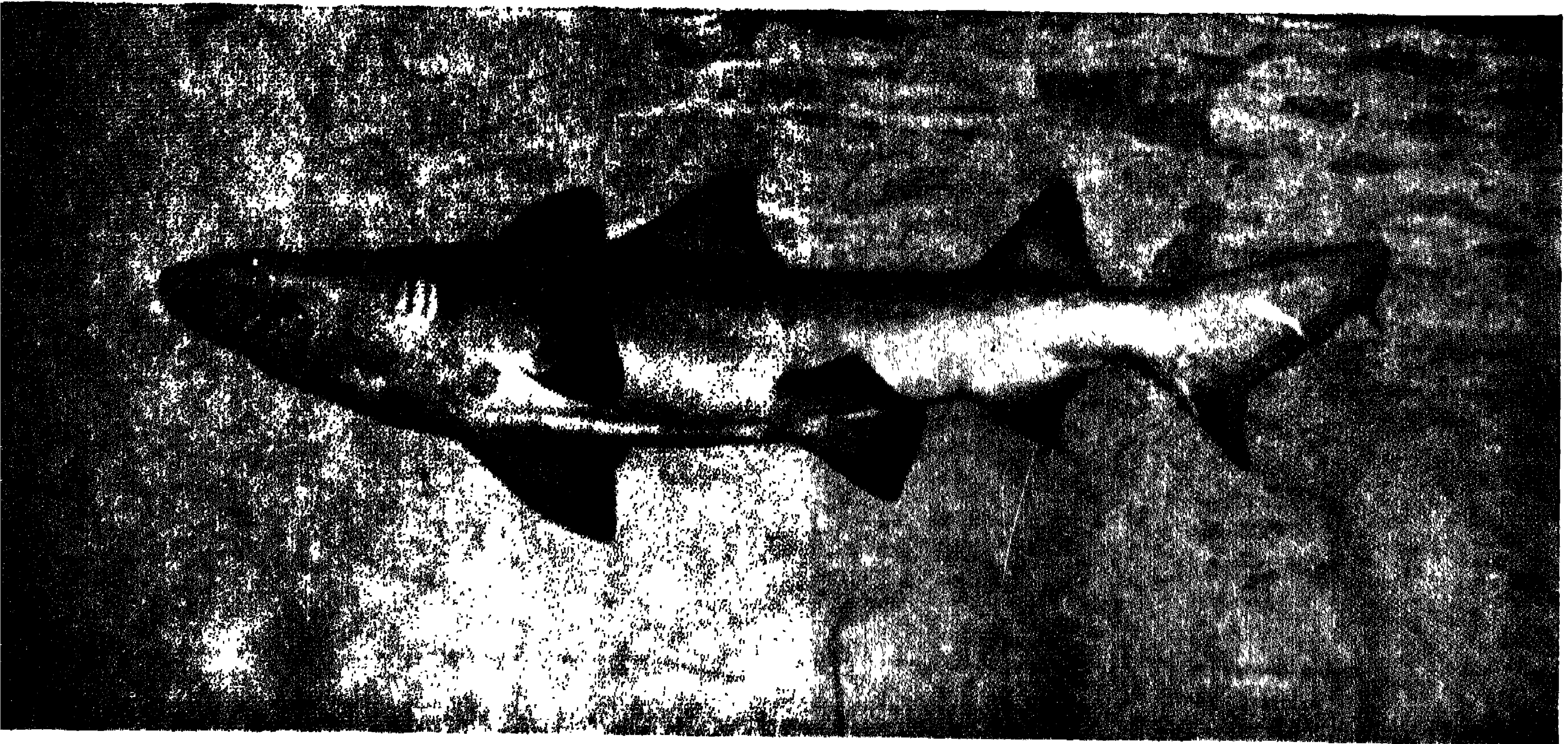
তেলুগু—**পোরাকালু**, তামিল—**পোরুভা**, মলয়ালম—**নেড়ুমানানগু**

শরীর চাপা আর সরু। সমুদ্রে ও মোহনায় থাকে। দৈর্ঘ্য 15-18 সেমি।

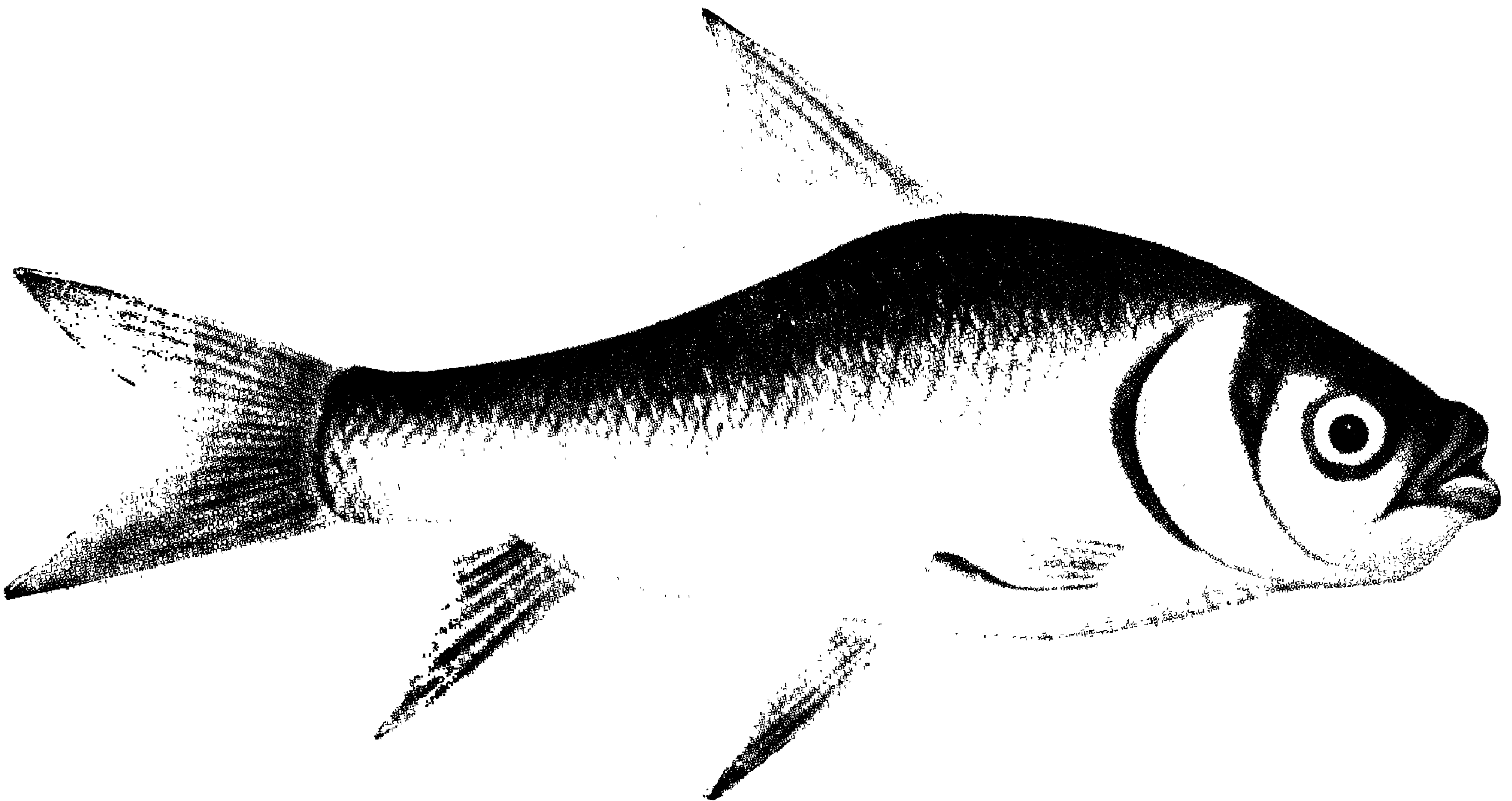
পুরাভা (T. purava, Ham)

তামিল—**নাথাল**, মরাঠি—**কাতিল**, তেলুগু—**পেড্ডাপুরাবা**, মলয়ালম—**কাভাচেল্লা**

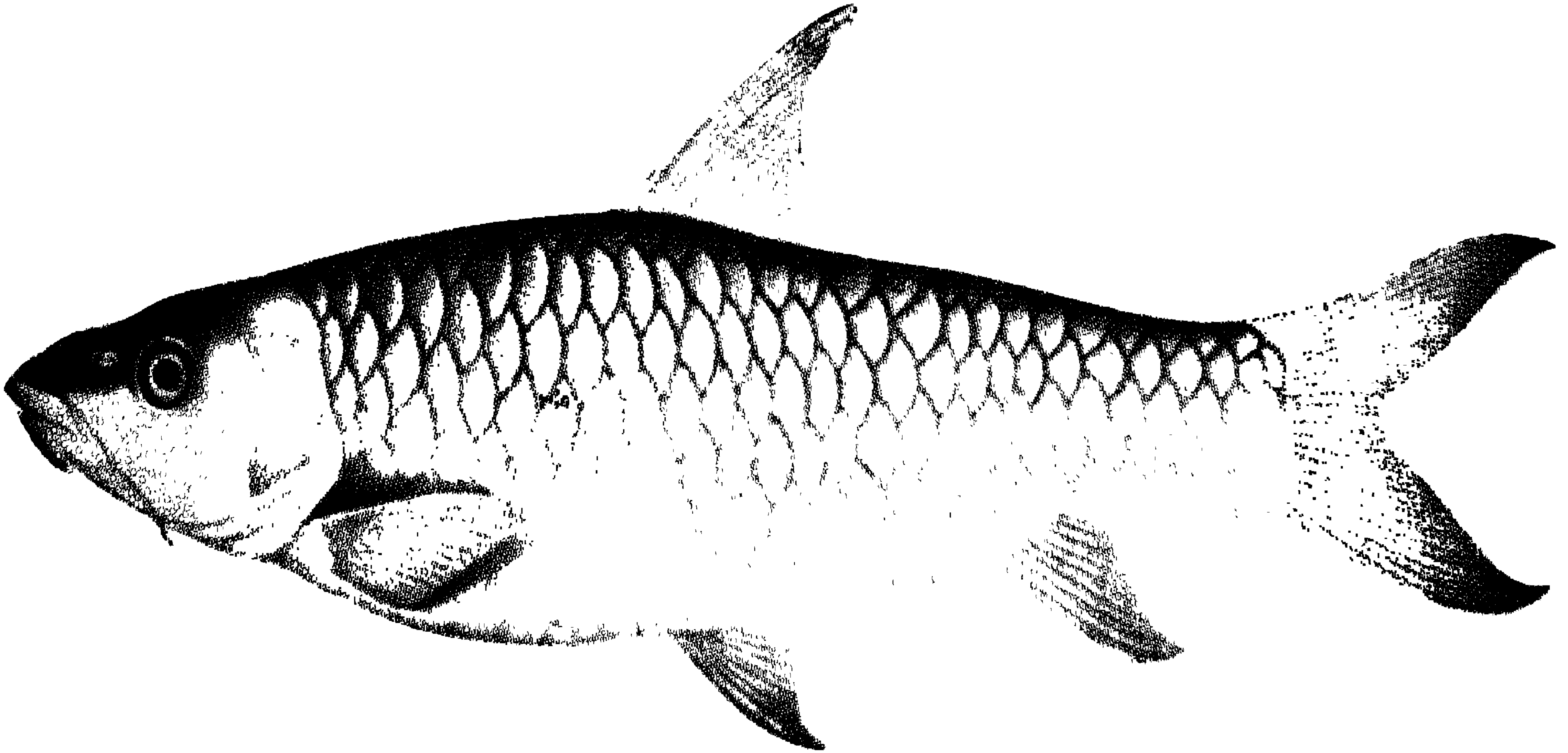
পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমুদ্র ও মোহনা জুড়ে ব্যাপকভাবে ছড়ানো। শরীর দু পাশে চাপা, রং রুপোলি, পিঠ ইস্পাত-নীল, মাথায় সোনালি আভাস। দৈর্ঘ্য প্রায় 30 সেমি। মোহনায় এবং নদীর জোয়ার-সীমার মধ্যে বংশবৃদ্ধি করে। খাবার মাছ হিসাবে কদর আছে।



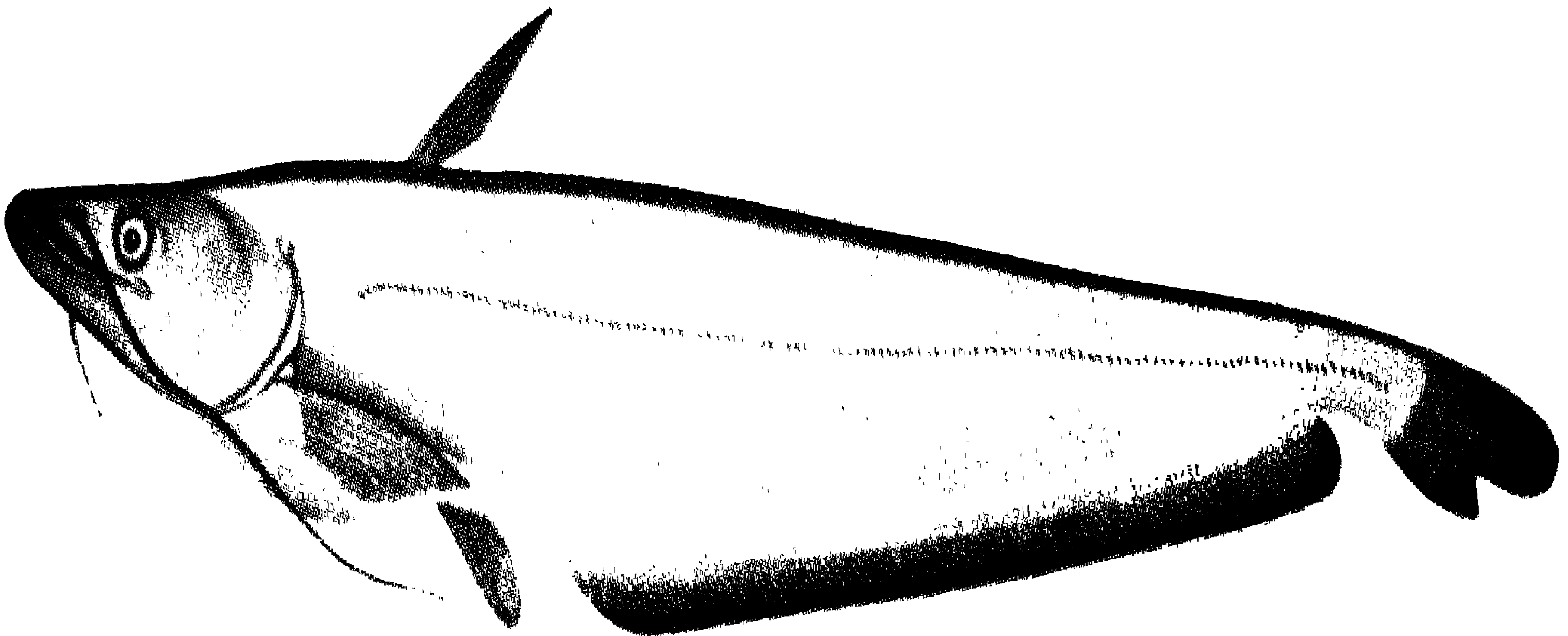
চিত্র। ভারতীয় নীল হাঙর



চিত্র ॥ কাতলা



চিত্র ।।। মহাশোল



চিত্র IV মিঠে জলের ক্যাটফিশ— বোয়াল

সেটিরেস্ট্রিস (T. setirostris, Brouss)

তেলুগু—**য়েকাপুরবা,** মলয়ালম—**চিরুমানানগু**

বঙ্গোপসাগর থেকে কেরালা অবধি ভারতের সমুদ্রজলে পাওয়া যায়। শরীর চাপা ও লম্বা। রং রুপোলি, পিঠে সবজে ভাব। লম্বা চোয়াল পেটের পাখনা পেরিয়ে গেছে।

অ্যাংকোভিদের চতুর্থ গোষ্ঠীটি হল অ্যাংকোভিয়েলা গণ, ভারতে যার দুটি প্রজাতি দেখা যায়।

অ্যাংকোভিয়েলা কমার্সোনিআই (A. commersonii, Lacep) বা **এংগ্রোলিস কমার্সোনিয়েনস** (E. commersonianus, Day)

মলয়ালম—**নিথোলি**

বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে পাওয়া যায়। পেটে 6-7টি 'স্কিউট'।

অ্যাংকোভিয়েলা ইন্ডিকা (A. indica, v Hass) বা **এংগ্রোলিস ইন্ডিকাস** (E. indicus, Day)

তেলুগু—**নাত্তু,** তামিল—**নেত্তেলি,** মলয়ালম—**কো-নেথ্যেলি**

ভারতের উপকূল জুড়ে পাওয়া যায়, চিল্কাতে বেশি। পেটে 4-5টি 'স্কিউট'।

বোম্বাই উপকূলের 'ডোরাব' (Dorab) কিরোসেন্ট্রিডি (Chirocentridae) গোত্রের মাছ, ক্লিউপয়ডদের দলের এক অসাধারণ সদস্য। মাংসাশী ও শিকারি স্বভাবের জন্য একে উলফ হেরিং (wolf-herring) বা নেকড়ে হেরিং বলা হয়। এদের একটি গণ, একটিই প্রজাতি।

কিরোসেন্ট্রাস ডোরাব (Chirocentrus dorab, Forsk)

বাংলা—**খন্দা,** মরাঠি—**কারলি,** তেলুগু—**মুল্লুভালাই** তামিল—**ভালাই,** কন্নড়—**কারলি,** মলয়ালম—**মুল্লুভালা**

শরীর চাপা ও লম্বা। মুখ বড়, নীচের চোয়াল সামনে বের-করা, তাতে তীক্ষ্ণ ধারাল দাঁত। দৈর্ঘ্য গড়ে 1.2 মিটার তবে তা 3.7 মিটার পর্যন্ত হতে পারে। ভারতের চারপাশের সমুদ্রে পাওয়া যায়, চিন পর্যন্ত। চলতি ইংরেজি নাম সিলভার-বার ফিশ, তবে বোম্বাইতে পরিচিত ডোরাব বলে।

চানোস চানোস (Chanos chanos, Forsk) বা **চানোস স্যালমোনিয়স** (Chanos salmoneus, Day)

তেলুগু—**পল্লবহ্বা,** তামিল—**পলাইমীন,** কন্নড়—**হুমিনু,** মলয়ালম—**পোমীন**

শরীর চাপা, সুঠাম গড়ন, আঁশ ছোট, মুখও ছোট এবং তাতে দাঁত নেই। পিঠ-বরাবর

রুপোলি-সবুজ। মালাবার উপকূলেই বেশি পাওয়া যায়। বংশবৃদ্ধি করে মোহনায়। খাবার হিসাবে দারুণ কদর, বাঁধ-দিয়ে-আটকানো নোনা জলে যে মাছ চাষ হয় তাতে এর গুরুত্ব আছে।

মিল্ক ফিশ বা সাদা মালেট হল চ্যানিডি (Chanidae) গোত্রের মাছ, ভারতে এই গোত্রের একটাই গণ, একটাই প্রজাতি।

এবার ট্রাউটদের সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ দেওয়া হচ্ছে। ট্রাউট বা স্যামন হল সারা পৃথিবীর ঠাণ্ডা পার্বত্য অঞ্চলে বিখ্যাত ছিপশিকারের মাছ। এরা ক্লিউপয়ডদের দলে পড়ে। ভারতে কোনও দেশি ট্রাউট নেই। এদের বিদেশ থেকে এনে হিমালয় ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালার নদীগুলোতে ছাড়া হয়েছিল, বেশ ক বছর ধরে এরা সেখানে বংশবৃদ্ধি করে ট্রাউটের আবাদ সম্ভব করে তুলেছে।

স্যালমো গেয়ার্ডনেরিআই (Salmo gairdnerii, Richardson)

এদের চলতি নাম স্টিল হেড (Steel Head)। এরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা। এদের এনে কাশ্মীর ও নীলগিরির নদীতে ছাড়া হয়েছিল। 1800 মিটার উচ্চতায় এবং শীতে 3.3°C ও গ্রীষ্মে 15-21°C উষ্ণতায় এরা বাড়তে পারে। এদের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য 70 সেমি এবং ওজন 5.5 কেজি। অন্য প্রজাতিটি হল স্কটল্যান্ডের লখ্ লেভেন ট্রাউট। এদের বেশ বৃদ্ধি হয়েছে নীলগিরিতে।

পার্সিফর্ম বর্গ: (Perciformes): **পার্চ** (Perch) **ও তার জ্ঞাতিরা**

পার্চ এবং পার্চের মতো মাছেদের বিরাট দলটিতে নানা গোত্র। এরা প্রধানত সামুদ্রিক, তবে কেউ কেউ মোহনা ও মিঠে-জলেরও বাসিন্দা। বেশির ভাগই খেতে চমৎকার এবং আমাদের সামুদ্রিক মৎস্য-ব্যবসায়ের একটা বড় অংশ এরাই।

বর্গটিতে অনেকগুলি গোত্র। গুরুত্বপূর্ণ গোত্রগুলির বিবরণ দেওয়া হল।

সেন্ট্রোপমিডি গোত্র [Centropomidae **সামুদ্রিক পার্চ**]

এইসব মাছের চোয়ালের হাড় খোলা। আঁশ চিরনদাঁতি (ctenoid)। শ্রোণীয় পাখনায় কাক্ষিক (axillary) আঁশ। পায়ু-পাখনায় তিনটি কাঁটা, পিঠ-পাখনা একটানা বা ভাগ করা।

ল্যাটেস ক্যালকেরিফার্স (Lates calcarifers, Bloch)

বাংলা—**ভেটকি** মরাঠি—**ফিতাদার**, তেলুগু—**পাণ্ডু**-চাপা, তামিল—**পইনিমীন**, কন্নড়—**কলিজি**, মলয়ালম—**চেমপাল্লি**, **নারীমীন**

ভারত থেকে চিন পর্যন্ত সমুদ্রজলে পাওয়া যায়, বিশেষত পূর্ব উপকূলের বড় বড় নদীর মোহনায়; জোয়ার-সীমা পেরিয়ে উঠে আসে। রং ধূসর, পিঠ গাঢ় সবুজ, তলাটা রুপোলি।

দৈর্ঘ্য গড়ে 45-60 সেমি, তবে তা 150 সেমি পর্যন্ত হতে পারে। পুকুরেও এ মাছের চাষ করা যায়। ছিপশিকারের পক্ষে ভাল মাছ, খাবার হিসাবেও খুবই কদর আছে।

এপিনেফেলিডি গোত্র (Epinephelidae) [**রক পার্চ**]

উজ্জ্বল রংচঙে শরীর। সমস্ত উপকূল বরাবর পাওয়া যায়। কোনও কোনও জাত বড় এবং খেতে ভাল। এপিনেফেলাস বিন্যাক (Epinephelus boenack, Bloch) তথা সেরেনাস বিন্যাক (Serranus boenack, Day) সবচেয়ে বেশি পরিচিত।

সিল্যাজিনিডি গোত্র (স্যান্ড হোয়াইটিং বা লেডিজ ফিংগার)

এদের চলতি নাম এসেছে এদের গর্ত খোড়ার স্বভাব ও স্বচ্ছ সাদা রং থেকে। লম্বাটে সাদা মাছ, নলাকার শরীরটা লেজের দিকে সরু হয়ে এসেছে। ছোট আঁশ। ছুঁচলো তুণ্ড, ছোট মুখ। এদের দুটি প্রজাতি সুপরিচিত।

সিল্যাগো সিহামা (Sillago sihama, Forskal)

মরাঠি—**মুরদি**, তেলুগু—**সোরাঙ্গী**, তামিল—**কেলাকন**, কন্নড়—**কানে**, মলয়ালম—**ফুঝন**

ভারত থেকে চিন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সমুদ্রজলে এই মাছ পাওয়া যায়। চিল্কা হ্রদে এবং সারা করমণ্ডল ও কেরালা-মালাবার উপকূলে মৎস্য-ব্যবসায়ে এদের ছোটখাটো ভূমিকা আছে। খেতে চমৎকার।

সিল্যাজিনপসিস প্যাংস (Sillaginopsis pangh, Ham) বা **সিল্যাগো ডোমিনা** (Sillago domina, Day)

তামিল—**জারা-সোরিঙ্গা**, ওড়িয়া—**তৌলদাঁত**

বঙ্গোপসাগরে প্রচুর পাওয়া যায়। গাঙ্গেয় বদ্বীপ ও ওড়িশা উপকূল দিয়ে উজিয়ে ওঠে। বাংলা ও ওড়িশায় প্রচুর ধরা পড়ে এবং মৎস্য-ব্যবসায়ে বড় অংশ নেয়।

ল্যাকটারিডি গোত্র (Lactaridae) [**বিগ-জড জাম্পার,** (Big-Jawed Jumper)]

পার্চের মতো দেখতে, শরীর চাপা, আঁশ গোলাকার, মুখ বড়, পিঠ-পাখনা দুটো—প্রথমটায় 7-৪টা কমজোরি কাঁটা। ভারতে একটাই গণ ও একটাই প্রজাতি।

ল্যাকটারিয়াস ল্যাকটারিয়াস (Lactarius lactarius Sch) বা **ল্যাকটারিয়াস ডেলিক্যাটুলাস** (Lactarius delicatulus, Day)

তেলুগু—**সুনডুমু**, তামিল—**শুথিপু**, কন্নড়—**আদাইমীনু**, মলায়লম—**আদাভু**, **পুরুবা**

চলতি ইংরেজি নাম হোয়াইট ফিশ।

পার্শ্বরেখা পর্যন্ত পিঠের রং সিসের মতো। সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য 25 সেমি। খাদ্য হিসাবে কদর আছে। ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ায়, সারা বছর ধরা গেলেও সবচেয়ে বড় মরসুম জুন থেকে ডিসেম্বর।

ক্যারাংগিডি গোত্র (Carangidae) (**হর্স ম্যাকেরেল**)

এদের দলে পড়ে ক্যারাংগিড ও তাদের নানা জ্ঞাতি যেমন কোরিনেমিড (chorinemid), পাইলট ফিশ ও ডার্ট। শরীর মোটমুটি চাপা, পাতলা গোলাকার আঁশে ঢাকা কিংবা কখনও-কখনও আঁশহীন। পার্শ্বরেখার উপরের আঁশগুলো বড়, পায়ু-পাখনায় দুটি কাঁটা। লেজের পাখনা জোরালো ও দু ভাগে বিভক্ত। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম দুই উপকূল জুড়েই বেশ কিছু সুপরিচিত প্রজাতির বাস।

সেলার ক্যারাংক্স ক্রুমেনোফথ্যালামাস (Selar Caranx crumenophthalamus, Bloch)

মরাঠি—**ল্যবি**, কন্নড়—**বুঙ্গুড়া হিড্ডে**, মলয়ালম—**চম্বন**

শরীরের উপরটা রুপোলি, তলার দিকে সোনালি হয়ে এসেছে। লেজের পাখনার ডগা কালো। মালাবার উপকূলে শুটকি বা জরানো মাছ হিসাবে ব্যবসায়িক গুরুত্ব আছে।

অন্য উল্লেখযোগ্য প্রজাতিগুলি হল ক্রিজোফ্রিস (C. chrysophrys), মেলামপাইগাস (C. melampygus), ডিয়েডাবা (C. djeddaba), লেপটোলেপিস (C. leptolepis), কুরা (C. kura) এবং রটলেরি (C. rottleri)।

ক্যারাংগিডদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ গণটি হল কোরিনেমাস তথা স্কোম্বেরয়ড (Scomberoides)—বঙ্গোপসাগরে এবং চিন সাগর পর্যন্ত ভারত মহাসাগরে পাওয়া যায়।

স্কোম্বেরয়ড লাইসান (Scomberoides lysan, Forsk)

হিন্দি—**পরস**, তামিল—**তোল-পারা**

বড়-সড় মাছ, পার্শ্বরেখার উপরে আঙুলের ছাপের মতো 6-8টি খয়েরি দাগ। পিঠ-পাখনার ডগা কালো।

অন্য সুপরিচিত প্রজাতিগুলি হল স্যাংটিপেট্রি (S. sanctipetri)— বিশেষভাবে পাওয়া যায় অন্ধ্র উপকূলে; ট্যালা (S. tala) এবং টোল (S. tol)।

ফর্মিওনিড গোত্র (Formionid) [**কালো পমফেট**]

ফর্মিও নাইগার (Formio niger, Bleeker) তথা **স্ট্রোমোটিয়স নাইগার** (Stromateus niger, Day)

মরাঠি—**হালবা**, তামিল—**কুরুপীভোল**, কন্নড়—**চন্দ্রত্যা**,
মলয়ালম—**কারুপ্পাভালি**

ফর্মিও গণটি ক্যারাংগিডদের আত্মীয় হলেও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে তাকে স্ট্রোমেটিডদের দলভুক্ত করা হয়। কালো পমফ্রেট খুব ভাল খাবার মাছ— প্রোটিন, চর্বি, ক্যালসিয়ম ও ফসফরাসে সমৃদ্ধ।

কোরিফিনিড গোত্র (Coryphaenidae) [**শুশুক মাছ বা ডলফিন ফিশ**]

শরীর লম্বাটে ও চাপা। আঁশ ছোট। মুখ বড় ও তেরচা; পিঠ-পাখনা লম্বা ও মাথা থেকে শুরু হয়েছে; লেজের পাখনায় গভীর ভাগ।

কোরিফিনা হিপুরাস (Coryphaena hippurus, Linnaeus)

তামিল—**বাদাহালন**

সামুদ্রিক মাছ, মাংসাশী ও পেটুক। খোলা উষ্ণমণ্ডলীয় সমুদ্রে ব্যপকভাবে ছড়িয়ে আছে। শরীর সবুজাভ, দু পাশে ও তলার দিকে সোনালি হয়ে এসেছে; গায়ে ছোট ছোট নীল ফুটকি, বুকের উপরেরগুলো একটু বড়। দৈর্ঘ্য গড়ে 90 সেমি, সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য 150সেমি। অন্ধ্র উপকূলে অল্প পরিমাণে ধরা হয়।

লুটিয়াজিনি গোত্র (Lutianidae) [**স্ন্যাপার**]

শিকারি সামুদ্রিক মাছ, উজ্জ্বল রংচঙে চাপা শরীর; মুখ বেশ বড়; পিঠ-পাখনায় 10-12টি কাঁটা। বেশ কিছু প্রজাতি আছে, তাদের মধ্যে ছটা খেতে ভাল ও সুপরিচিত।

লুটিয়েনাস আর্জেন্টিম্যাকুলাটা (Lutianus argentimaculata, Forsk) **বা লুটিয়েনাস রোজিয়স** (L. roseus, Day)

সাধারণ নাম রেড স্ন্যাপার, বোম্বাই ও অন্যান্য উপকূলে পাওয়া যায়। রং গাঢ় গোলপি বা লালচে-বাদামি, তলার দিকে চাপা-লাল। পাখনাগুলোর কিনারা কালো। অন্য প্রজাতিগুলো হল লিনেওলেটাস (L. lineolatus, Rupp) বা সোনালি-ডোরা স্ন্যাপার; লুটিয়েনাস লুটিয়েনাস (L. lutianus, Bl) বা গোলাপি স্ন্যাপার; ম্যালাব্যারিকাস (L. malabaricus, Bl ও Sch) বা মালাবার স্ন্যাপার; সাংগুনিয়া (L. sangunea, Cuv) বা এরিথ্রোপটেরস (L. erythropterus, Day)।

লেয়োগন্যাথিডি গোত্র (Leiognathidae) **রুপো-পেটি,** (Silver Bellies)

ছোট রুপোলি-সাদা মাছ; শরীর চাপা, খুদে খুদে আঁশ; মুখ সংকোচন-প্রসারণক্ষম (protractile)। বড় বড় ঝাঁকে থাকে। এদের শুটকি বা নোনা করা হয়, ব্যবসায়িক মূল্য আছে। ভারতে গোটা-বারো প্রজাতি পাওয়া গেছে।

লেয়োগনেথাস একিউলাস (L. equulus, Forsk) বা **একিউলা এডেন্টুলা** (Equula edentula, Day)

ভারতীয় প্রজাতিগুলোর মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড়। সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য 20 সেমি। বঙ্গোপসাগরের মৎস্য-ব্যবসায়ে এর অবদান আছে।

অন্য পরিচিত প্রজাতিগুলো হল ইনসিডেটর (L. insidator, Bl), যা মান্নার উপসাগর থেকে পশ্চিম উপকূল অবধি বেশি পাওয়া যায়; রুকোনিয়স (L. ruconius, Ham), যা হুগলি নদীমুখের সাধারণ প্রজাতি; স্পেণ্ডেনস (L. splendens, C), যা সারা পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল জুড়েই ছড়িয়ে আছে।

সায়ানেনিডি গোত্র (Scianenidae) [**জু ফিশ** বা **ক্রোশর** বা **ঘোল**]

এই গোত্রের মাছ খাওয়ার যোগ্য সামুদ্রিক মাছেদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ, পূর্ব-পশ্চিম দুই উপকূলেই ব্যবসায়িক দিক দিয়েও লাভজনক। মাঝারি থেকে বড় আকারের মাছ, প্রধানত অগভীর জলের বাসিন্দা। শরীর লম্বাটে, ছোট বা মাঝারি আঁশ। পিঠের প্রথম ও দ্বিতীয় পাখনার মাঝখানে গভীর খাঁজ, গোটা দশেক প্রজাতি সুপরিচিত। বেশ কটি গণ আছে।

সায়েনা ডুসুমিয়েরি (Sciaena dussumieri, Val) তথা **আমব্রিনা ডুসুমিয়েরি** (Umbrina dussumieri, Day)

তামিল—**তারুকাত্তিলি**

মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে পাওয়া যায়। দৈর্ঘ্য 20-23 সেমি। রং গাঢ় খয়েরি-তামাটে থেকে কালো, তাতে সোনালি আভা।

সিউডো-সায়েনা কয়বর (Pseudo-sciaena coibor, Ham) বা **সায়েনা এলবেডা** (Sciaena elbeda, Day)

তামিল—**ভেল্লাকাত্তিলি**, মলয়ালম— **কোরা**

সমুদ্র, মোহনা এবং নদীর জোয়ার অঞ্চলের বাসিন্দা। বড় আকারের জু ফিশ, বোম্বাইতে দৈর্ঘ্য হয় 152-183 সেমি, অন্য জায়গায় আরও ছোট।

অন্য প্রজাতিগুলি হল ডায়াক্যানথাস (P. diacanthus, Lacep), সিনা (P. sina, Cuv) ও সোলডাডো (P. soldado, Lacep)।

সায়ানেনিডি গোত্রের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ গণ হল অটোলিথ ব্রুনেয়স (Otolithes brunneus), বোম্বাইতে যার চলতি নাম 'কোঠ' (Koth)। মহারাষ্ট্রর উপকূলে এর তেজি ব্যবসা। পিঠ-বরাবর বাদামি, বাকিটা সোনালি। পাখনা ধূসর বা কালচে। 60 সেমি লম্বা হতে পারো। যদিও গড় দৈর্ঘ্য 45 সেমি। অন্য দুই প্রজাতি হল আর্জেন্টিয়স (O. argenteus) ও ম্যাকুলেটস (O. maculatus)।

সিক্লিডি গোত্র (Cichlidea [**ক্রোমাইড**, Chromides]

পার্চ-গোছের মাছ। এদের দলে আছে পার্লস্পট (Pearlspot), অরেঞ্জ ক্রোমাইড ও তেলাপিয়া— প্রতিটিরই খাওয়ার মাছ হিসাবে কদর আছে। শরীর চাপা, চিরনদাঁতি আঁশে ঢাকা। পিঠের পাখনায় অনেক কাঁটা, পায়ুরটাতে তিন-চারটি।

এট্রোপ্লাস সুরাটেনসিস (Etroplus suratensis, Bloch)

হিন্দি—**পিটুলকাস**, তেলুগু—**কাশিমেরা**, তামিল—**কারাসার**, মলয়ায়ম—**কারিমীন**

সারা শরীরে মুক্তোর মতো সাদা ও অস্বচ্ছ ফুটকির জন্য চলতি ইংরেজি নাম পার্লস্পট (Pearlspot)। রং সবুজাভ বা গাঢ় লালচে-বেগনি, শরীরের আড়াআড়ি আটটি খাড়া ডোরা। সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য 30 সেমি, ওজন 1.4 কেজি। মোলায়েম স্বাদ-গন্ধের জন্য দারুণ কদর এর। পুকুরে-হ্রদেও এর চাষ ভাল হয়। এরা উপাদেয়, মজবুত মাছ, এদের শিকারি স্বভাব নেই, সন্তান-বাৎসল্য ও নীড়-বাঁধার প্রবৃত্তি আছে—এইসব কারণে দেশের ভিতরের দিকের জলাশয়েও সাফল্যের সঙ্গে এদের চাষ করা যায়।

এট্রোপ্লাস ম্যাকুলেটস (Etroplus maculatus, Bloch), **অরেঞ্জ ক্রোমাইড**

তামিল—**বুরাকাস**, মলয়ালম—**পাল্লাতি**

দক্ষিণ ভারতের উপকূলের আশেপাশে এই মাছটিকে খুব দেখা যায়— কর্নাটক, মালাবার, কেরালা ও মাদ্রাজের ধান খেতে, ছোট ছোট পুকুর-ডোবায়, এমনকি নালার জলে। হলদে শরীর পিঠের দিকে সবুজ হয়ে এসেছে, তাতে সারি সারি সোনালি ফুটকি। ছোট হলেও খেতে ভাল।

তেলাপিয়া মোসাম্বিকা (Tilapia mossambica, Peters)

বিদেশি এই প্রজাতিটিকে 1952 সালে ভারতে এনে ছাড়া হয় দক্ষিণ ভারতের মণ্ডপম-এর সেন্ট্রাল মেরিন ফিশারিজ রিসার্চ স্টেশন-এর উদ্যোগে। মাছটির আদি নিবাস আফ্রিকায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা জায়গায়— যেমন থাইল্যান্ডে, মালয়েশিয়ায়— ছাড়া হয়েছে একে। চাষ করলে খুব বাড়ে, বংশবৃদ্ধি করে প্রচুর।

প্রায় 35 সেমি লম্বা হয়। পার্লস্পটদের মতো এদেরও কৃষকরা সহজে চাষ করতে পারে পুকুর-দিঘিতে। কেরালায় তা করাও হয়েছে ব্যাপকভাবে; সেখানকার মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত, তাদের জন্য এ মাছ প্রোটিনের একটি মূল্যবান উৎস।

ট্রিচিউরিডি গোত্র (Trichiuridae [**রিবন ফিশ**]

চলতি নামেই বোঝা যায় মাছটি ফিতের আকারের—খুব সরু শরীর। দু পাশে চ্যাপটা, 30 সেমি বা তার বেশি লম্বা। পিঠ ও পায়ুর পাখনা সরু, তাতে অনেক নরম ডাঁটি। লেজের

পাখনা নেই। ধড়টা ক্রমশ সরু হয়ে একটা লম্বা সুতোর আকার ধারণ করেছে, মাছ চলার সময় ওটাও ভেসে চলে পিছন-পিছন। সামুদ্রিক মাছ হলেও মোহনায় ঢোকে। ভারতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি আছে।

ট্রিচিউরস হাউমেলা (Trichiurus haumela, Forsk)

বাংলা—**রুপো-পাতিয়া**, মরাঠি—**পিঠুরাতি**, তেলুগু—**সাভাল্লু**, কন্নড়—**পামবোলে**, তামিল—**সাভালাই**, মলয়ালম—**ভেল্লিভালায়ম**

আরব সাগরে সচরাচর দেখা গেলেও বিস্তৃতি ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বা তারও বেশি। দৈর্ঘ্য প্রায় 90 সেমি।

অন্য দুটি প্রজাতি হল: মিউটিয়স (T. mutius, Gray), যা বঙ্গোপসাগরে বেশি দেখা যায়; এবং সাভালা (T. savala, Cuv), যা বেশি দেখা যায় কেরালা, কোঙ্কন, মহারাষ্ট্র ও ওড়িশায়।

সামুদ্রিক মৎস্য-ব্যবসায়ে রিবন ফিশের স্থান চার নম্বরে। প্রধানত রোদে শুকিয়ে বিক্রি করা হয়।

স্কোমব্রিডি গোত্র (Scombridae) [**ম্যাকেরেল**]

ম্যাকেরেল এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক মাছ— বৎসরে মোট যত টন সামুদ্রিক মাছ ধরা হয় তার মধ্যে এদের স্থান দ্বিতীয়। এরা বড় বড় ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায়, খাওয়ার মাছ হিসাবে এদের কদর আছে। ম্যাকেরেলদের শরীর মূলকাকার, খুদে-খুদে আঁশে ঢাকা। একটা বৈশিষ্ট্য হল পিঠ ও পায়ুর পাখনার পিছনে 5-7টি আলাদা আলাদা উপ-পাখনা। ভারতে এদের গণ একটি, প্রজাতিও একটি।

র‍্যাস্ট্রেলিজার ক্যানাগুর্টা (Rastrelliger kanagurta, Cuv) বা **স্কোম্বার মাইক্রোলেপিডোটাস** (Scomber microlepidotus, Day)

মরাঠি—**কৌলাগেদার**, তামিল—**কানন-কেলুতি**, কন্নড়—**বঙ্গাদেই** মলয়ালম—**আইলা**

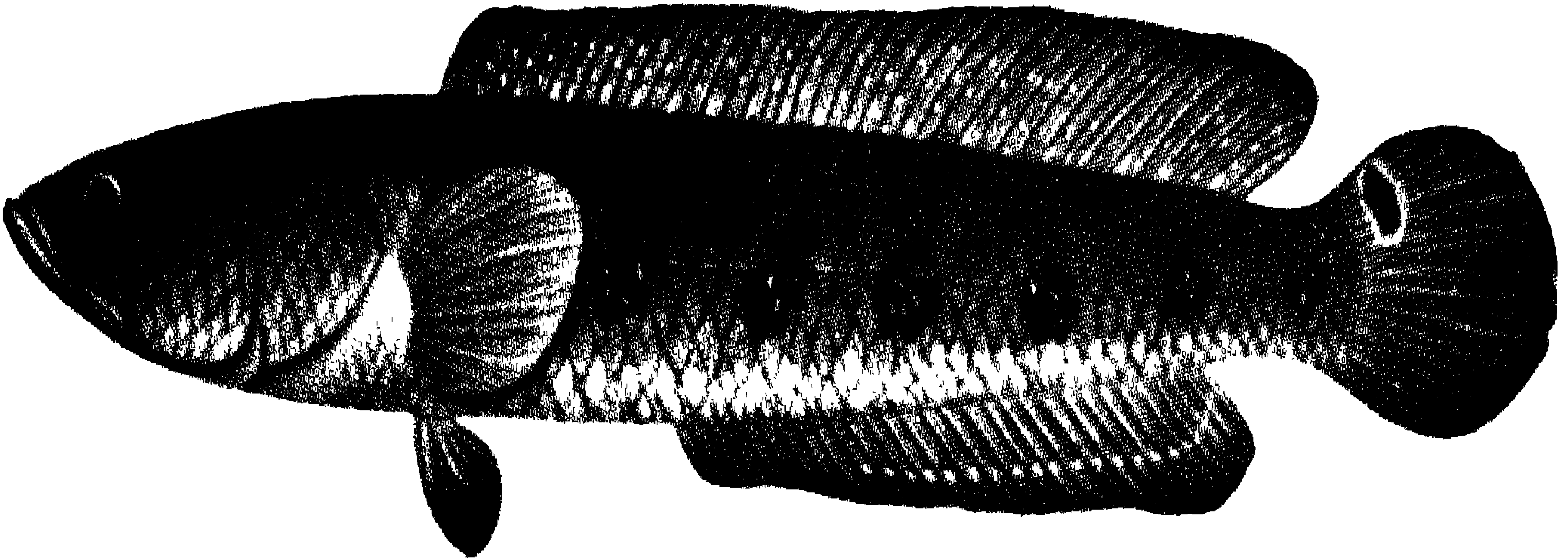
দৈর্ঘ্য 20-30 সেমি। ওজন প্রায় 90 গ্রাম। ভারতের পশ্চিম উপকূলে, বিশেষত বোম্বাই থেকে কারওয়ার অঞ্চলে, বেশ বর্ধিষ্ণু শিল্প গড়ে উঠেছে।

সাইবিডি গোত্র (Cybidae) [**সিয়ার ফিশ**, Seer Fish]

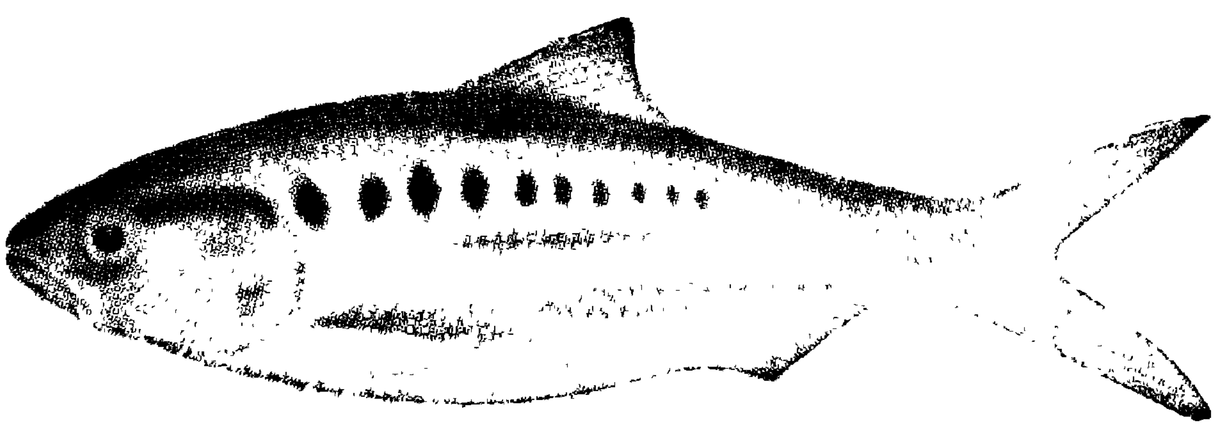
ছিপশিকারের মাছ এবং খাওয়ার মাছ হিসাবে এই সব মাছ বিখ্যাত। বেশ বড় আকারের, দ্রুত-সাঁতারু, মাংসাশী মাছ—সার্ডিন ও ম্যাকেরেলের মতো ছোট মাছ শিকার করে। ভারতের চারপাশের সমুদ্রে তিন-চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি দেখা যায়।

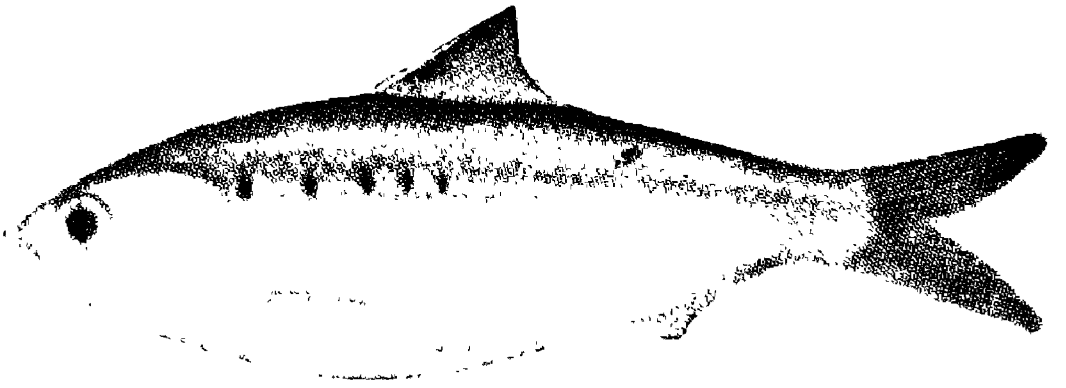


চিত্র V সিয়ামিজ ফাইটার (Siamese Fighter) (অ্যাকোয়ারিয়ামের একটি জনপ্রিয় মাছ)



চিত্র VI সাপমুখো মাছ- শাল







চিত্র VII ইলিশ ক. পূর্ণবয়স্ক, খ ও গ. বাচ্চা



চিত্র VIII স্পটেড ইল (Spotted Eel)

স্কোম্বেরোমোরাস কমার্সোনিআই (Scomberomorus commersonii, Lacep) বা **সাইবিয়াম কমার্সোনিআই** (Cybium commersonii, Day)

বাংলা—**চম্পা,** মরাঠি—**তুভার-আপ্তেরি,** তেলুগু—**কোনেমা** তামিল—**মাওবা-লাচি,** কন্নড়—**আরকুলাই** মলয়ালম—**অ্যায়াকারু,** বোম্বাই—**সুরমাই**

সুঠাম শরীর, পিঠ ও পেটের বাঁক সমান, শরীর ক্রমশ সরু হয়ে মিশেছে একটি ছিপছিপে পুচ্ছদণ্ডে (peduncle)। লেজের পাখনায় সমান দুটি বড় বড় পর্ব। পিঠ বরাবর রং নীল, পেট রুপোলি সাদা। দৈর্ঘ্য 150 সেমি পর্যন্ত হতে পারে।

অন্য প্রজাতিগুলি হল : গুটেটাস (S. guttatus, Sch) বা সাইবিয়াম গুটেটাম (Cybium guttatum, Day), যা আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে প্রচুর মেলে ; কুলি (S. kuhli, Cuv) এবং ইনটেরেপটাস (S. interruptus)।

স্ট্রোম্যাটিডি গোত্র (Stromateidae) [পমফ্রেট]

সারা প্রাচ্য জুড়েই পমফ্রেট বিখ্যাত। মোলায়েম সুস্বাদু মাংসের জন্য একে কখনও-কখনও 'বাটারফিশ'-ও বলা হয়, খাওয়ার মাছ হিসাবে এর কদর খুব।

শরীর উপবৃত্তাকার ও দুপাশে চাপা, পাতলা ছোট ছোট আঁশে ঢাকা। পিঠের পাখনায় পরিষ্কার একটি কাঁটাওয়ালা অংশ, চামড়ার তলায় লুকোনো। ভারতে দুটি প্রজাতি দেখা যায়।

স্ট্রোমেটিয়স সিনেনসিস (Stromateus sinensis, Day)

বাংলা—**চাঁদা,** মরাঠি—**চাদাভা,** তেলুগু—**চান্দুর,** বোম্বাই—**সারঙ্গা,** তামিল—**মোহঙ্গ-ভাভ্‌ভাল,** মলয়ালম—**ভেল্লাআরউলি**

এটাই সাদা পমফ্রেট। পুরো ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল জুড়ে এর ব্যাপ্তি। শরীর উপবৃত্তাকার, গাঢ় ধূসর থেকে ফিকে বাদামি, তলায় ধূসর ও রুপোলি।

স্ট্রোমেটিয়স আর্জেন্টিয়স (Stromateus argenteus, Euphr) বা **স্ট্রোমেটিয়স সিনেরিয়স** (S. cinereus, Day)

সাধারণ নাম গ্রে বা সিলভার পমফ্রেট। উপরের অংশ রুপোলি ধূসর, মাথায় আর শরীরে রুপোলি জমিতে সূক্ষ্ম কালো ফুটকি। কানকোয় একটা কালো দাগ।

থুনিফর্ম বর্গ (Thunniformes) [টিউনা]

টিউনা হল মহাসমুদ্রের বিশ্ববিখ্যাত মাছ (গড়ন ম্যাকেরেলের মতো, তবে আকারে অনেক বড়, ওজন কখনও-কখনও 80-82 কেজি। পিঠ আর পায়ুর পাখনার পরে 6-9টি আলাদা

আলাদা উপ-পাখনা। আঁশ ছোট বা নেই। টিউনার মাংসের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হল তার লাল রং, যার জন্য দায়ী চামড়ার বিশেষ রক্তনালি। এ মাছের 'শক্তিশালী চর্মীয় রক্তসংবাহনতন্ত্রটি পার্শ্বদেশের পেশিগুলিতে গঠিত সংবাহন জালকের (plexus) সঙ্গে যুক্ত। মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত পার্শ্ব-পেশিগুলির এইসব অংশ গাঢ় লাল' (বর্গ 1947)।

টিউনা বিদেশে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং টিনজাত খাদ্য শিল্পের একটি ভিত্তি। অথচ ভারতে তা সবচেয়ে কম কাজে-লাগানো মাছেদের দলে পড়ে— মোট যত সামুদ্রিক মাছ ধরা হয় টিউনা তার 2%-ও নয়। জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলিতে অনেক দিন ধরে যন্ত্রচালিত জলযানের সাহায্যে ব্যাপক হারে টিউনা ধরা চলছে। তাইওয়ান এবং থাইল্যান্ডও ভারত মহাসাগরের টিউনা সম্পদ আহরণ করছে।

তবে ভারতে মৎস্যশিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজি-নিবিড় টিউনা ব্যবসায়েও আগ্রহ বাড়ছে। সার্ডিনকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে 400-500 মিটার লম্বা সুতো দিয়ে এদের ধরা হয়। প্রধান কেন্দ্রগুলি হল মালদ্বীপ ও লক্ষদ্বীপ; তা ছাড়া কেরালায় আমাদের দেশের মোট টিউনার 55.3% ধরা হয়ে থাকে।

টিউনা ধরার জন্য নানা রকম যান বা নৌকো ব্যবহৃত হয়। নৌকোগুলো সাধারণত ছোট, 6-15 মিটার লম্ব, এবং যন্ত্রচালিত। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে তুতিকোরিনের আশেপাশে কাঠ-কুঁদে-তৈরি তুতিকোরিন-জাতীয় নৌকোর এক উন্নত সংস্করণও ব্যবহৃত হয়। সাধারণ দেশি নৌকো, কাঠ-কুঁদে-তৈরি ডিঙি, এমনকি ক্যাটাম্যারান-ও জনপ্রিয়। সরঞ্জাম হল বড়শি আর সুতো, ভাসানে জাল, বেড়াজাল বা টানা জাল। আধুনিক উপকরণে সজ্জিত গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জলযান ব্যবহার করে সমৃদ্ধ টিউনা-অঞ্চলগুলি থেকে টিউনা ধরার জন্য সরকার ও শিল্পপতিদের তরফ থেকে প্রচেষ্টা চলছে।

ভারত মহাসাগরে গোটা-বারো প্রজাতি দেখা যায়, এখানে শুধু গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।

থুনাস অ্যালালুঙ্গা (Thunnus alalunga, Bonnatere)— চলতি নাম অ্যালবাকোর (Albacore)। মোটামুটি শক্তসমর্থ শরীর। বুকের পাখনা খুব লম্বা। শরীরের উপরের অংশ ধাতব-নীল, তলার অংশ ও পেট রুপোলি। দৈর্ঘ্য 40-100 সেমি।

থুনাস অ্যালবাক্যারেস (Thunnus albacares, Bonnaterre) বা ইয়েলো ফিন।—শরীর লম্বাটে। পিঠের দিক ধাতব-নীল বা নীলচে-কালো। গোটা-কুড়ি ভাঙা-ভাঙা খাড়া ডোরা। পাখনা হলুদ। দৈর্ঘ্য 50-100 সেমি।

থুনাস ম্যাকেআই (Thunnus maccayii, Castelnau) বা সাদার্ন ব্লুফিন।— শরীর বড় ও মূলকাকার। পিঠের দিক নীলচে কালো। তলার দিক ও পেট রুপোলি। দু পাশে আড়াআড়ি হালকা রেখা ও ফুটকি। দৈর্ঘ্য 160-200 সেমি।

ইউথাইনাস অ্যাফিনিস (Euthynnus affinis, Cantor) বা থাইনাস থুনিনি (Thynnus thunini, Day), লিটল টিউনা কিংবা ম্যাকেরেল টিউনা, তামিলে সুর্লি (Surly)।—শরীর লম্বাটে, মূলকাকার ও বলিষ্ঠ। বুকের ও শ্রোণীয় পাখনার মাঝখানে কালো কালো ফুটকি। পিঠের দিকে কিছু ভাঙা-ভাঙা ঢেউ-খেলানো রেখা। দৈর্ঘ্য 40-60 সেমি।

ক্যাটসুওনাস পেলামিস (Katsuwonus pelamis, Linn); স্ট্রাইপড বোনিটো বা স্কিপজ্যাক।—শরীর বলিষ্ঠ গোল ও লম্বাটে। পিঠ ধাতব-নীল ও বেগনি, রুপোলি পেটে 3-5টি লম্বালম্বি ডোরা। দৈর্ঘ্য 40-86 সেমি।

অক্সিস থুজার্ড (Auxis thuzard, Lacepede) বা ফ্রিগেট টিউনা।—বলিষ্ঠ শরীর, পাশে একটু চাপা। পিঠ নীলচে, মাথা কালো। পার্শ্বরেখা অবধি 15টি বা তার বেশি সরু কালো ডোরা, তেরচা থেকে প্রায়-অনুভূমিক। দৈর্ঘ্য 25-40 সেমি।

পালিনেমিফর্ম বর্গ (Polynemiforme)

উষ্ণমণ্ডলীয় মাছ, সমুদ্র ও মোহনার বাসিন্দা, কখনও-কখনও নদীতেও ঢোকে। দুটো আলাদা পিঠ-পাখনা, প্রথমটিতে 7 বা তারও বেশি নমনীয় কাঁটার মতো ডাঁটি; লেজের পাখনা গভীরভাবে খাঁজকাটা। লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত পার্শ্বরেখা। আঁশ চিরনদাঁতি।

পলিনেমিডি গোত্র (Polynemidae) [**থ্রেড-ফিন বা ভারতীয় স্যামন**]

বুকের পাখনাগুলো তলায় নামানো ও দু ভাগে বিভক্ত—উপরের অংশটি প্রথম দুই অরীয় অস্থির (radial bones) সঙ্গে যুক্ত; তলার অংশে কয়েকটি আলগা তন্তু, সেটা যুক্ত চতুর্থ অরীয় অস্থির সঙ্গে; তৃতীয় অরীয় অস্থির কোনও পাখনা-ডাঁটি নেই। আলগা তন্তুগুলো স্পর্শেন্দ্রিয়, প্রজাতিভেদে তাদের সংখ্যার হেরফের হয়। এগুলোর কারণেই এ সব মাছের চলতি নাম হয়েছে 'থ্রেড-ফিন'।

পলিনেমিডদের দৈর্ঘ্য হয় 15 সেমি থেকে 1.8 মিটার, এবং বড় নমুনাগুলোর সর্বোচ্চ যে ওজন জানা গেছে তা 140 কেজির কাছাকাছি। খাদ্য হিসাবে দারুণ কদর। পটকা আইজিংগ্লাস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে গোটা বারো প্রজাতি দেখা যায়; গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতিগুলো নীচে উল্লেখ করা হল।

পলিনেমাস প্যারাডাইসিয়স (Polynemus paradiseus, Linn)

বাংলায় তপসে, ইংরেজিতে ম্যাঙ্গো ফিশ। পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার উপকূলে ও মোহনায় পাওয়া যায়। হুগলি নদীতেও প্রচুর মেলে—বংশবৃদ্ধির জন্য 240 কিমি পর্যন্ত উজিয়ে আসে এরা। শরীর সোনালি, পিঠে ও পাখনায় ধূসরের আভাস। দৈর্ঘ্য 15-25 সেমি। পশ্চিমবঙ্গে খাবার হিসাবে দারুণ কদর।

এলিউথেরোনেমা টেট্রাড্যাকটিলাস (Eleutheronema tetradactylus, Shaw) তথা **পলিনেমাস টেট্রাড্যাকটিলাস** (Polynemus tetradactylus, Day)

চলতি ইংরেজি নাম ইন্ডিয়ান স্যামন। বাংলায় গুড়জালি। ভারত থেকে চিন পর্যন্ত সমুদ্রের জলে ব্যাপকভাবে ছড়ানো। শরীর রুপোলি সবুজ, দু পাশে ও পেটে হলদেটে-সাদা। দৈর্ঘ্যে 1.8 মিটার। সর্বোচ্চ ওজন জানা গেছে 140.6 কেজি। খেতে চমৎকার।

পলিড্যাকটিলাস হেপটাড্যাকটিলাস (Polydactylus heptadactylus, Cuv) তথা **পলিনেমাস হেপটাড্যাকটিলাস** (Polynemus heptadactylus, Day)

মলয়ালম—**বাহমীন**

ভারত থেকে মালয় অবধি সমুদ্রে পাওয়া যায়। গড় দৈর্ঘ্য 15 সেমি। ছোট হলেও মালাবারে সুস্বাদু মাছ হিসাবে কদর আছে।

পলিনেমাস ইন্ডিকাস (Polynemus indicus, Shaw)

চলতি ইংরেজি নাম 'জায়েন্ট থ্রেড-ফিন'। সমুদ্রেই প্রধানত পাওয়া যায়, তবে কখনও-কখনও মোহনায় ও নদীতেও ঢোকে। সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য 1.2 মিটার, সর্বোচ্চ ওজন 9 কেজি। খাদ্য হিসাবে কদর আছে। পটকা বড়, তা থেকে আইজিংগ্লাস তৈরি হয়।

প্লিউরোনেকটিফর্ম বর্গ (Pleuronectiformes) [**পাতা মাছ** বা Heterosomata]

হ্যালিবাট, ফ্লাউন্ডার ও সোল এই বর্গে পড়ে। এই বর্গের মাছেরা জিভের মতো চ্যাপ্টা বলে ইংরেজিতে এদের 'টাংফিশ'ও বলে। এরা তলদেশের বাসিন্দা, উপরের দিকটায় রং থাকে, তলার দিক সাদা। পিঠ আর পেটের দিকের পাখনাগুলো লম্বা, লেজের পাখনার সঙ্গে জোড়া। দুটি চোখই উপরের দিকে। মুখ অপ্রতিসম (asymmetrical)। খাওয়ার মাছ হিসাবে চাহিদা থাকায় বর্গটার বাণিজ্যিক গুরুত্ব আছে। হ্যালিবাট থেকে মূল্যবান যকৃৎ-তেল বের করা হয়, বিশেষত ইউরোপে। ভারতে অবশ্য হাঙর আর রে থেকেই বেশি ভাল যকৃৎ-তেল পাওয়া যায় বলে দেখা গেছে। বর্গটিতে চারটি গোত্র, বেশ কিছু সুপরিচিত গণ।

সেটোডেস এরুমেই (Psettodes erumei, Schn)

এটাই প্রতিনিধিস্থানীয় হ্যালিবাট। প্রতিসম শরীর, বড় মুখ, সুগঠিত দাঁতগুলো মাংসাশী স্বভাবের পরিচয় দেয়। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল জুড়ে এদের পাওয়া যায়। উপরের দিক কালচে বা বাদামি। চোখ দুটো হয় ডান বা বাঁ দিকে। দৈর্ঘ্য প্রায় 40 সেমি।

সিউডোরম্বস (Pseudorhombus) হল ফ্লাউন্ডারের প্রতিনিধিস্থানীয় দৃষ্টান্ত। এই পাতামাছের শরীর উপবৃত্তাকার, চোখদুটো সব সময় বাঁ দিকে। সোলিয়া (Solea) নামক পাতামাছের দু চোখ থাকে ডান দিকে। সোলিয়া ওভাটা (Solea ovata, Richardson)

দেখা যায় মালাবার উপকূল থেকে দক্ষিণ চিন সাগর পর্যন্ত। সাইনোগ্লসাস-এর (Cynoglossus) চলতি ইংরেজি নাম 'টাং সোল'। এদের দু চোখ বাঁ দিকে, বড় গোত্র এটা।

সাইনোগ্লসাস সেমিফ্যাসিয়াটস (Cynoglossus semifasciatus) বা 'মালাবার সোল' প্রায়ই দেখা যায় পশ্চিম উপকূলে।

পাতা মাছগুলো খেতে ভাল, এরা ভারতের পনেরোটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক মাছের একটি।

অ্যাপোডা গোত্র (Apoda) বা **অ্যাঙ্গুয়িলিফর্ম** (Anguilliformes)—**ইল** (Eel)

সাপের মতো দেখতে ইল বা বানজাতীয় মাছ তাদের প্রব্রজন ও কৌতূহলজনক জীবন-ইতিহাসের জন্য বিখ্যাত, ব্যবসায়িক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। শরীর লম্বা, নলাকার। মধ্যক পাখনাগুলো সরু ও লম্বা। বুকের পাখনা ছোট, শ্রোণীয় পাখনা নেই। পাখনায় ডাঁটি আছে, কাঁটা নেই। ভারত মহাসাগরের ইল-রা চারটি গোত্রে পড়ে : অ্যাঙ্গুয়িলিডি (Anguillidae) বা সাধারণ ইল, মিউরিনেসোসিডি (Muraenesocidae) বা সামুদ্রিক ইল, অফিকথাইডি (Ophicthyidae) বা সাপ ইল এবং মিউরিনিডি (Muraenidae) বা মোরে ইল (Morayeel)।

অ্যাঙ্গুয়িলা বেঙ্গলেনসিস (Anguilla bengalensis, Gray and Hardw)

মরাঠি—**আহির**, তেলুগু—**মালুঙ্গুলু**, তামিল—**সেরামপামবু** মলয়ালম—**মানিয়ানগল**

সবচেয়ে সাধারণ ইল। গাঙ্গেয় মোহনায়, বঙ্গোপসাগরে এবং চিন পর্যন্ত বিস্তৃত ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বা তারও ওপারে সুপরিচিত। রং বাদামি, পিঠে ফুটকি থাকতে পারে বা না-ও পারে। তলার দিক হলদেটে। লেজ লম্বা। 120 সেমি পর্যন্ত লম্বা হয়।

অ্যাঙ্গুয়িলা বাইকালার (Anguilla bicolor, McClelland), আরেকটু ছোট আকারের প্রজাতি, 60 সেমি লম্বা, ভারতের সমুদ্রে পাওয়া যায়।

মিউরিনেসোসিডি গোত্রে পড়ে সামুদ্রিক ইল, যারা মোহনা ও নদীর ভিতরেও এসে ঢোকে। খাদ্য হিসাবে কদর আছে, আকারও বড় হয়, তাই বাণিজ্যিক গুরুত্ব আছে। শরীর লম্বা, লেজ চাপা। তুণ্ড লম্বাটে, মুখ বড়, জোরালো দাঁত, স্বভাবে মাংসাশী।

মিউরিনেসোক্স সিনেরিয়স (Muraenesox cinereus, Forsk)

বাংলা—**বান**, মরাঠি—**বাম**, তামিল—**ভিলাঙ্গু**, মলয়ালম— **পম্বুমীন**

সমুদ্রে ও মোহনায় পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্যেই বেশি। রং রুপোলি থেকে সাদা। দৈর্ঘ্য 150 সেমি পর্যন্ত হয়। অন্য দুই সাধারণ প্রজাতি হল ট্যালাবন (M. talabon, Cuv) ও ট্যালাবনয়ড (M. talabonoides, Blkr)। অফিকথাইডি গোত্রে পড়ে মোহনা ও তার কাছাকাছি জলার গর্ত-খোঁড়া ইল-রা। শরীরে আঁশ নেই, পিঠ আর পায়ুর পাখনা ছোট হয়ে গেছে;

ছুঁচলো লেজের সাহায্যে তলদেশের বেলেমাটিতে গর্ত খোড়ে।

পিসোডনোফিস হিজালা (Pisodonophis hijala, Ham) বা **অফিকথিস বোরো** (Ophicthys boro, Day)

সাপ ইল-দের প্রতিনিধিস্থানীয়, বঙ্গোপসাগর থেকে চিন সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। নদীতে প্রব্রজন করে। সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য 60 সেমি। পাড়ে, বাঁধে গর্ত খোড়ে, চাষিদের সর্বনাশ করে।

মিউরিনিডি গোত্র (Muraenidae): **মোরে ইল**

অগভীর জল ও প্রবাল-প্রাচীরের বাসিন্দা সামুদ্রিক ইলদের প্রতিনিধিস্থানীয়। শরীর নলাকার; চামড়া মোটা ও আঁশবিহীন। উজ্জ্বল রং, মুখ বড়, জোরালো দাঁত। বুকের পাখনা নেই।

ভারতীয় সমুদ্রে তিনটি প্রজাতি সুপরিচিত।

মিউরিনা পাংকটাটা (Muraena punctata, Bl ও Schn)

ফুটকিওয়ালা বড় আকারের ইল। লেজ ধড়ের সমান লম্বা। করমণ্ডল উপকূলে বেশি পাওয়া যায়।

জিমনোথোরাক্স ফ্যাভিজিনিয়স (Gymnothorax favigineus, Bl ও Schn)

বোম্বাই উপকূলে প্রচুর পাওয়া যায়। গড় দৈর্ঘ্য 75 সেমি; রং হলদে।

থিরসয়ডিয়া ম্যাক্রুরস (Thyrsoidea macrurus, Bleeker)

লেজ লম্বা ও চোখে পড়ার মতো। রং বাদামি। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম দুই উপকূলেই পাওয়া যায়।

বেলোনিফর্ম বর্গ (Beloniformes) [**গাংদাড়া, কেঁকলে, সুবর্ণ-খড়কে ও উড়ুক্কু মাছ**]

এই সব মাছের শরীর লম্বাটে, চোয়াল পাখির ঠোঁটের মতো—যেমন দেখা যায় এদের প্রতিনিধিস্থানীয় গাংদাড়া বা কেঁকলে (Garfishes, Belone) এবং সুবর্ণ-খড়কের (Halfbeaks, Hemiramphus) মধ্যে। সব পাখনাই ভাল রকম বিকশিত, পিঠ ও পায়ুর পাখনা পিছনে-সরানো ও পরস্পরের বিপরীতে অবস্থিত; লেজের পাখনা গভীরভাবে খাঁজকাটা। আঁশ পাতলা, গোলাকার এবং ঝরে গিয়ে আবার গজায়। এরা সবাই হাওয়ায় লাফাতে পারে, বিশেষ করে উড়ুক্কু মাছ 1.8 মিটার বা তারও বেশি ভেসে যেতে পারে। খেতে চমৎকার, ভারতের সামুদ্রিক মৎস্য-ব্যবসায়ে স্থান আছে। প্রধান তিনটি গোত্র।

বেলোনিডি গোত্র (Belonidae)

এই গোত্রে পড়ে প্রতিনিধিস্থানীয় গাংদাড়া বা কেঁকলেরা। এদের দুই চোয়ালই লম্বা এবং সমান বিকশিত।

স্ট্রঙ্গিল্যুরা স্ট্রঙ্গিল্যুরস (Strongylura strongylurus, V Hass) বা **বেলোন স্ট্রঙ্গিল্যুরস** (Belone Strongylurus, Day)

মরাঠি—**টোল**, তেলুগু—**মুদ্দেরা**, তামিল—**ভেল্লাই মুরেল**, মলয়ালম—**পালানকোলি**

ভারত মহাসাগরে ব্যাপকভাবে ছড়ানো—চিনের সাগর পর্যন্ত। 60 সেমি অবধি লম্বা হয়। ছোট ক্লিউপিড, চিংড়ি আর কাঁকড়া খায়। ঝাঁক বেঁধে ঘোরে। পূর্ব ও পশ্চিম দুই উপকূলেই এদের ব্যবসা ভাল।

জেনেনটোডন ক্যাংকিলা (Xenentodon cancila, Ham) বা **বেলোন ক্যাংকিলা** (Belone cancila, Day)

বাংলা—**কেঁকলে**, হিন্দি—**কাওয়া**, তেলুগু—**ভাদ্দালা মুক্কু**, তামিল—**কোক্কুমীন**, কন্নড়—**কোন্টি**, মলয়ালম— **কোলান**

শরীর গোল, বেশ শক্তসমর্থ, চোখ থেকে লেজ পর্যন্ত কালো কিনারাওয়ালা একটি রুপোলি ডোরা। 50 সেমি অবধি লম্বা হয়। খাদ্য হিসাবে কদর আছে। এটি মিঠে-জলের প্রজাতি, ভারত, মায়ানমার (ব্রহ্মদেশ) ও শ্রীলঙ্কায় পাওয়া যায়।

হেমিরামফিডি গোত্র (Hemirhamphidae)

এই গোত্রে পড়ে সুবর্ণ-খড়কেরা (Halfbeaks) যাদের কেবল তলার চোয়ালটা লম্বা ও স্পষ্ট। শরীর লম্বাটে, কমবেশি চাপা। ঝাঁক বেঁধে ঘোরে। ভাল খাওয়ার মাছ, ব্যবসায়িক দিক দিয়েও অল্প গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে গোটা-দশেক প্রজাতি দেখা যায়।

হেমিরামফাস জর্জিআই (Hemiramphus georgii, Val)

তেলুগু—**গোনিয়া**, তামিল—**কোঝুভা, মুরেল**, কন্নড়—**কান্ডে**, মলয়ালম—**কোয়ালা**

প্রজাতিটি প্রায় 30 সেমি লম্বা, দু পাশে দুটি করে ডোরা—একটা রুপোলি, অন্যটা কালো। দক্ষিণপূর্ব উপকূলের পক প্রণালীতে প্রচুর পাওয়া যায়, স্থানীয় ব্যবসাও গড়ে উঠেছে।

একসোসিটিডি গোত্র (Exocoetidae) [**উড়ুক্কু মাছ**]

মজার মাছ। উপকূলের কাছাকাছি কিংবা খোলা সাগরে দেখা যায়। বাতাসে ভেসে যাওয়ার ক্ষমতা আছে। মাঝারি রকমের লম্বাটে চাপা শরীর, বুক ও শ্রোণীয় পাখনা লম্বা হয়ে ডানার

আকার নিয়েছে। সামুদ্রিক ঝাঁকবাঁধা মাছ, খায় চিংড়ি এবং পূর্ণাস্থি মাছের বাচ্চা ও ডিম। খেতে ভাল, মরসুমি ব্যবসার মাছ।

সাইপসেল্যুরস (Cypselurus) ও একসোসিটস (Exocoetus) নামে দুটি গণ দেখা যায়।

সাইপসেল্যুরস পিসিলপটেরস (Cypselurus poecilopterus, Val) বা **একসোসিটস পিসিলপটেরস** (Exocoetus poecilopterus, Day)

করমণ্ডল উপকূলের সাধারণ উড়ুক্কু মাছ। রঙ নীলচে, নীচটা রুপোলি। বুকের পাখনায় কালো ছিট। ভারত মহাসাগর থেকে চিন সাগর অবধি পাওয়া যায়।

একসোসিটস ভলিট্যানস (Exocoetus volitans, Linn)

এই প্রজাতিটি উড়ুক্কু মাছের ছোট সংস্করণ। বঙ্গোপসাগরে, বিশেষত তার দক্ষিণ অংশে, বেশি পাওয়া যায়।

নয়

ভারতের মৎস্যশিল্প

অনেক, অনেক কাল আগে অন্ন বস্ত্র ও আবাসের সংস্থানের উদ্দেশ্যে মানুষ গাছপালা আবাদের কৌশল আয়ত্ত করেছিল। খাওয়ার জন্য মাংস এবং পরার জন্য চামড়া ও পশম জোগাড় করতে সে দক্ষ হয়ে উঠেছিল পশু শিকারে। মাছকেও সে চিনেছিল খাদ্যের মূল্যবান উৎস হিসাবে এবং মাছ ধরার জন্য উদ্ভাবন করেছিল বল্লম, জাল ও ফাঁদের মতো নানা সহজ উপকরণ। পাকিস্তানের মোহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, আফ্রিকার নীলনদ-উপত্যকা, পশ্চিম এশিয়ার ব্যাবিলন এবং গ্রিসের এথেন্সের মতো প্রাচীন মানবসভ্যতার কেন্দ্রগুলির মৃৎপাত্র ও অন্যান্য নিদর্শনে মাছের ছবি দেখা যায়। কোনও কোনও ছবিতে মাছ ধরার নৌকো, ফাঁদ এবং জালও রয়েছে— যা থেকে বোঝা যায় যে সেই প্রাচীন যুগেও মানুষ মাছ ধরার বিদ্যা জানত।

খাদ্য হিসাবে মাছের গুরুত্ব মানুষ প্রাচীন কাল থেকেই বুঝেছে। সব রকমের প্রাকৃতিক জলাশয়েই প্রচুর মাছ মেলে। মাছ ফলাতে তার শ্রম লাগে না, আবাদ না করেও এ ফসল তোলা যায়। অল্প জলে টেঁটা, ছোট জাল বা ঘুনি ব্যবহার করা চলে। বড় বন্য জন্তু শিকারে ক্ষিপ্রতা ও সাহস লাগে, মাছ ধরা সেই তুলনায় ঢের সহজ। আদিম মানুষ সম্ভবত মাংসের মতো মাছও কাঁচাই খেত— সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ছিল এ-খাবার। জাপান, ফিলিপাইন ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলির অধিবাসীরা আজও কাঁচা মাছ খায়। খাদ্য হিসাবে মাছের গুরুত্বের কারণ তার মাংসের রাসায়নিক গঠন—তা প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লোহার মতো নানা খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। তা ছাড়াও নানা মাছে থাকে নানা মাত্রায় চর্বি ও তেল।

খাদ্যের উৎস হিসাবে মাছের গুরুত্ব ও মূল্য সত্ত্বেও ভারতে মৎস্য-শিল্পের সীমাবদ্ধতার দরুন মাছ কিন্তু এখানে খুব বেশি পাওয়া যায় না। বিভিন্ন দেশের ধরা মাছের মোট বাৎসরিক পরিমাণের (লক্ষ মেট্রিক টনে) দিকে তাকালেই এ সত্য ধরা পড়ে: জাপান 4.7, যুক্তরাষ্ট্র 2.9, সোভিয়েত রাশিয়া 20.6, চিন 20.5, নরওয়ে 20.1, কানাডা 10.07, ব্রিটেন 10.05; ভারতের বিপুল জলসম্পদ সত্ত্বেও তার পরিমাণ মোটে 10.10 মেট্রিক টন।

ভারতে মাথা-পিছু মাছ খাওয়ার পরিমাণও বোধহয় সারা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কম— মাত্র বার্ষিক 1.52 কেজি। আমাদের সাগর-নদী-হ্রদে মাছ এত প্রচুর থাকলেও তা জনপ্রিয় হয়েছে শুধু সেইসব রাজ্যেই যেগুলো সমুদ্রের ধারে কিংবা যেখানে বড় বড় নদী ও তাদের শাখাপ্রশাখা রয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং যানবাহন ও হিমায়নের (refrigeration) সুযোগসুবিধার অভাবের কারণে দেশের অভ্যন্তরভাগে টাটকা মাছ পৌঁছায় না বললেই চলে।

স্বাধীনতার বছর অর্থাৎ 1947 পর্যন্ত ভারতের মৎস্যশিল্পের পদ্ধতি-প্রণালী ছিল সেকেলে। কেবল বিশেষ বিশেষ জাতের লোকেরাই মাছ ধরার বিদ্যা জানে। নৌকোগুলো তৈরি মান্ধাতার আমলের কায়দায়। মাছ ধরার জাল, ছিপসুতো শত শত বছর আগে যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে, সবই হাতে তৈরি। জাপান, নরওয়ে, সুইডেন, গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো দেশগুলো এগিয়ে গেছে আধুনিক নৌকো আর জাল নিয়ে, আর ভারত আটকে রয়েছে তার মান্ধাতার আমলের কায়দা-কানুনে। অন্যান্য দেশের অগ্রগতি হয়েছে যন্ত্রচালিত নৌকো, মোটর-যান, বরফের সাহায্যে এবং হিমায়িত গুদাম ও ভ্যানে আধুনিক সংরক্ষণ-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। 1950-এর আগে অবধি ভারতে এইসব আধুনিক সুযোগসুবিধা ছিল না।

ভারতীয় মৎস্য-শিল্প একটি বিশাল বিষয়। সংক্ষেপে, নীচে কটি ভাগে ভাগ করে বিষয়টির আলোচনা করা হবে :

সামুদ্রিক মৎস্যশিল্প (1) উপকূলে (2) অগভীর ও গভীর সমুদ্রে
অন্তর্দেশীয় মৎস্যশিল্প (1) মোহনায় (2) নদীতে (3) পুকুরে
মাছ ধরার যান ও সরঞ্জাম
সংরক্ষণ ও অন্যান্য প্রক্রিয়া (processing) **এবং ব্যবহার**

সামুদ্রিক মৎস্যশিল্প

উপকূলে

একটি দেশের সামুদ্রিক মৎস্যশিল্পের সম্পদ অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সাগরের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি মৎস্যকুল (fish fauna) ও মৎস্য-ব্যবসায়ের প্রকৃতিকে সরাসরি প্রভাবিত করে। জলের রাসায়নিক প্রকৃতি, তাতে লবণ ও পুষ্টির পরিমাণের সঙ্গে মাছেদের খাদ্য প্ল্যাংকটন সৃষ্টির নিবিড় যোগ আছে। স্রোত, বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রজলের ঊর্ধ্বগতি (upwelling) মাছ ও মাছের বাচ্চার চলাফেরার উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। তা ছাড়া সমুদ্রতলের মহাদেশ-সংলগ্ন থাক (contiental shelf), তার ব্যাপ্তি ও ঢালের উপরেও মৎস্যশিল্পের সুবিধা-অসুবিধা কিছু পরিমাণে নির্ভর করে। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর—এই দুই প্রধান সাগরের মধ্যে রয়েছে আমূল তফাত।

পূর্ব বা করমণ্ডল উপকূলের মহাদেশ-সংলগ্ন থাকটি সরু, দ্রুত তা নেমে গেছে অগভীর ও গভীর সমুদ্রের দিকে। জলের সঞ্চালন এই উপকূলে কম প্রবল। বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রবাহ মৃদু ও স্বল্পস্থায়ী। বঙ্গোপসাগরে যে সব বড় নদী এসে পড়েছে তাদের বদ্বীপগুলি এবং উপকূলের হ্রদগুলি মোহনার মৎস্য-সম্পদকে দিয়েছে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। অত্র এলাকায় খানিকটা ঊর্ধ্বগতি চোখে পড়ে। বঙ্গোপসাগরে প্ল্যাংকটন অপেক্ষাকৃত কম তৈরি হয়। এইসব ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে মাছের পরিমাণে ও বৈচিত্র্যে।

পশ্চিম বা মালাবার উপকূলে মাছ বেশি। মহাদেশ-সংলগ্ন থাক চওড়া। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবল ও দীর্ঘস্থায়ী। জলের ঊর্ধ্বগতিও বেশি জোরালো, ফলে সমুদ্রে সঞ্চালন আরও ভাল হয়। আফ্রিকার পূর্ব উপকূল থেকে উত্তরমুখে প্রবাহিত সোমালি সমুদ্র স্রোত আরব সাগরের মাথার কাছে পাক খেয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূল বেয়ে নেমে যায়। আরব সাগরের জলের মরসুমি আবর্তন অনেক বেশি, ফলে প্ল্যাংকটনও বেশি তৈরি হয়। এ সবের মিলিত ফল হল সমৃদ্ধতর মৎস্যকুল—কী পরিমাণে, কী বৈচিত্র্যে। মোটামুটি হিসাব হল, সারা দেশে মোট ধরা মাছের 75%- এর বেশি আসে পশ্চিম উপকূল থেকে।

মৎস্যশিল্পের পরিসংখ্যানের সুবিধার জন্য ভারতের বিস্তীর্ণ উপকূলকে নীচের 12টি অঞ্চলে ভাগ করা হয় :

1. পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা
2. অন্ধ্র উপকূল (ক) গোপালপুরের দক্ষিণ থেকে বিশাখাপতনমের উত্তর
3. অন্ধ্র-উপকূল (খ) বিশাখাপতনম থেকে মাসুলিপতনম
4. অন্ধ্র-উপকূল (গ) মাসুলিপত্তনমের দক্ষিণ থেকে উত্তর পুলিকাট
5. করমণ্ডল উপকূল (ক) পুলিকাট হ্রদ থেকে কুড্ডালোর
6. করমণ্ডল উপকূল (খ) কুড্ডালোরের দক্ষিণ থেকে দেবীপতনম
7. পক প্রণালী ও মান্নার উপসাগর
8. কেরালা ও দক্ষিণ মালাবার—কন্যাকুমারী থেকে পোন্নানি নদী
9. মালাবার ও দক্ষিণ কর্নাটক—উত্তর পোন্নানি থেকে ম্যাঙ্গালোর
10. কোঙ্কন উপকূল—উত্তর ম্যাঙ্গালোর থেকে দক্ষিণ রত্নগিরি
11. মহারাষ্ট্র ও গুজরাত উপকূল—রত্নগিরি থেকে ব্রোচ
12. কাথিয়াওয়াড় উপকূল

ইল্যাজমোব্র্যাংক মৎস্যশিল্প

বাণিজ্যিক দিক দিয়ে হাঙরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতিগুলি হল রিংকোডন, গ্যালেওসের্ডো, ক্যার্কারাইনাস, স্কোলিওডন, স্ফিরনা ও স্টেগাস্টোমা। রে-দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ড্যাসিয়াটিস, ইটোব্যাটাস, ইটোমাইয়ালাস, রাইনোপটেরা, প্রিস্টিস, রাইনোবেটস এবং রিংকোব্যাটাস।

প্রধান প্রধান যেসব অঞ্চলে হাঙর আছে সেগুলো হল কাথিয়াওয়াড়, বোম্বাই, কেরালা, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূল। পশ্চিম উপকূলে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে কোডিনাই, ভেরাভাল, বোম্বাই, কারওয়ার, ম্যাঙ্গালোর, তেল্লিচেরি, কোজিকোড়ে ও ত্রিবান্দ্রমে ; পূর্ব উপকূলে তুতিকোরিন, আদিরামপতনম, পয়েন্ট ক্যালিমেরে, নাগপতনম, কোকনদ, মাসুলিপতনম, বিশাখাপতনম ও কাঁথিতে।

হাঙর সারা বছরই পাওয়া যায়, তবে পশ্চিম উপকূলে তুঙ্গ মরসুম জুলাই থেকে মার্চ, আর পূর্ব উপকূলে মে থেকে জানুয়ারি। এদের সাধারণত দেখা যায় 250-300 ফ্যাদম (45-55

মিটার) গভীর জলে। চ্যাপটা চেহারার রে-দের অবশ্য দেখা যায় 10-15 ফ্যাদমের (4.5-7 মিটার) অগভীর জলে। হাঙর ধরার জন্য সাধারণত লম্বা সুতো আর মাছ বা গোমাংসের টোপ লাগানো বঁড়শি ব্যবহৃত হয়— পূর্ব উপকূলে ছোট নৌকো থেকে পশ্চিম উপকূলে গুঁড়ি-কুঁদে-তৈরি শালতি-জাতীয় ডিঙি থেকে, আর বোম্বাই উপকূলে তক্তা দিয়ে বানানো বড় বড় নৌকো থেকে। ইদানীং অনেক জায়গায় ইল্যাজমোব্র্যাংক মৎস্যশিল্পে যন্ত্রচালিত নৌকোও সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে।

হাঙর আর রে-র আসল মূল্য তাদের যকৃৎ-তেলে। এদের মাংসে 'ইউরিয়া'র গন্ধ থাকে বলে খাদ্য হিসাবে এদের স্থান অস্থিবিশিষ্ট মাছের নীচে। বাণিজ্যিক দিক থেকে, হাঙর যত বড় হয় তার যকৃৎও তত ভাল হয়, বেশি তেল পাওয়া যায় তা থেকে।

পূর্ণাস্থি মৎস্যশিল্প

সার্ডিন ও তাদের নিকট-সম্পর্কিত গণসমূহ

আগেই বলা হয়েছে, খাদ্য আর তেলের উৎস হিসাবে ক্লিউপয়ড মাছেদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুব বেশি। ভারতের সমুদ্রগুলিতে এদের বেশ কিছু জাত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। এই মাছের ব্যবসায়ে সাফল্যের আরেকটি কারণ হল, ক্লিউপয়ডরা ঘুরে বেড়ায় হাজারে-হাজারে ঝাঁক বেঁধে। শ্রমিক-পিছু প্রতি ঘণ্টায় মাছ যত বেশি ধরা পড়বে মাছের ব্যবসা হবে তত লাভজনক।

সার্ডিন ব্যবসায়ে যে সব গুরুত্বপূর্ণ ক্লিউপয়ড মাছ জড়িত সেগুলো হল: সার্ডিনেলা লঞ্জিসেপস বা অয়েল সার্ডিন, সার্ডিনেলা ফিমব্রিয়াটা এবং সার্ডিনেলা গিবোসা। এই তিন প্রজাতিই খুব বড় বড় ঝাঁক বেঁধে ঘোরে। রেনবো সার্ডিন বা ডুসুমিয়েরা এবং সাদা সার্ডিন বা কোয়ালারও স্থান আছে এই ব্যবসায়ে।

অয়েল সার্ডিনের ব্যবসা মোটামুটিভাবে পশ্চিম উপকূলেই সীমাবদ্ধ, মালাবার ও কেরালা অঞ্চলেই এদের বড় বড় ঝাঁক দেখা যায়। এই ব্যবসার একটা আগ্রহজনক বৈশিষ্ট্য হল পর্যায়ক্রমিক প্রাচুর্য আর আকাল। 1941-42 সালে প্রচুর সার্ডিন পাওয়া যাচ্ছিল ; 1942-49 সালে ছিল মন্দা ; 1949 থেকে ধরা সার্ডিনের পরিমাণ আবার বেড়েছে। প্রাচুর্য আর আকালের এই পর্যাবৃত্তির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এখনও অনুসন্ধান করা হচ্ছে। মাছের সংখ্যা প্রভাবিত হয় জলের তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, স্রোত, ঊর্ধ্বগতি এবং প্ল্যাংকটনের লভ্যতা দিয়ে। নির্বিচারে বাচ্চা ও ভাবী-মা মাছ শিকারও মৎস্য-সম্পদ কমিয়ে দেয়।

মালাবার-কেরালা উপকূলে সার্ডিনের মরসুম আগস্ট থেকে মার্চ, তা তুঙ্গে ওঠে সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারিতে। সার্ডিন শিকারের সরঞ্জাম হল দু ধরনের জাল। প্রথমটির স্থানীয় নাম 'মাতি-চালা-ভালা', দ্বিতীয়টি এক বিশেষ ধরনের টানাজাল যার নাম 'মাতি-হোল্লি-ভালা'। সামুদ্রিক পাখিদের উত্তেজনা, কাছাকাছি হাঙর বা শুশুকদের উপস্থিতি, ইত্যাদি নানা লক্ষণের সাহায্যে মাছের ঝাঁকের অবস্থান ঠিক করা হয়।

সব ধরনের সার্ডিনই খেতে ভাল, ধনী-দরিদ্র সবারই প্রিয়। টাটকা রান্না করলেই খেতে সবচেয়ে ভাল লাগে, তবে নুনে জারিয়ে বা টিনজাত করে সংরক্ষণও করা যায়। টিনজাত করার কারখানা গজিয়ে উঠেছে মালবার ও কেরালা উপকূলের কোনও কোনও জায়গায়। তেল নিষ্কাশনের ব্যবসাও জমে উঠেছে। বাড়তি মাছ থেকে প্রায়ই 'ফিশমিল' বা মাছচারা এবং সার তৈরি হয়।

ক্লিউপয়ডদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী হল অ্যাংকোভি বা এংগ্রোলিড-রা। ভারতের মৎস্য-সম্পদ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে এদের গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতিগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। এংগ্রোলিস মাইস্ট্যাক্স ও এংগ্রোলিস পুরাভা হল অ্যাংকোভিদের দুটি সুপরিচিত জাত— ছিপছিপে কাঁটাওয়ালা মাছ, শুটকি বা 'ভর্তা' করে খেতেই সবচেয়ে ভাল। এদের ব্যবসা দেখা যায় মালাবার, দক্ষিণ কর্নাটক, কেরালা ও বোম্বাই অঞ্চলে। মরসুম আগস্ট থেকে ডিসেম্বর।

নিকটাত্মীয় অন্যান্য গণ যেমন পেলোনা, ইলিশ, সেটিপিনা, কয়লিয়া ইত্যাদিরও সার্ডিন ব্যবসায়ে অবদান আছে, এরা কিন্তু অতটা পরিচিত নয়।

ম্যাকেরেল শিল্প

ভারতের সামুদ্রিক অস্থিবিশিষ্ট মাছেদের মধ্যে বাণিজ্যিক গুরুত্বের দিক দিয়ে ম্যাকেরেলদের স্থান দ্বিতীয়। উপমহাদেশের চারপাশের সাগরে এই গণের একটিমাত্র প্রজাতিকেই দেখা যায়— ভারতীয় ম্যাকেরেল বা র‍্যাস্ট্রেলিজার কানাগুর্টা। ম্যাকেরেল শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হল মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি ও কেরালার কুইলনের মধ্যবর্তী এলাকা। পূর্ব উপকূলে একে বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায় মণ্ডপম, মাদ্রাজ, কাকিনাড়া, বিশাখাপতনম এবং ওড়িশার কোনও কোনও অঞ্চলে।

পশ্চিম উপকূলে নানা ঋতুতে নানা জায়গায় ম্যাকেরেল পাওয়া যায়। কন্যাকুমারী ও পোন্নানি নদীর মাঝখানে ঝাঁক দেখা যায়, আগস্ট থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নানা অনিয়মিত সময়ে। শালতি থেকে টানা জাল দিয়ে এদের ধরা হয়। পোন্নানি নদী ও ম্যাঙ্গালোরের মধ্যবর্তী দ্বিতীয় এলাকাটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—মরসুম এখানে শুরু হয় আগে, আগস্টে বা সেপ্টেম্বরে, এবং থাকে মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত। বাহন হল শালতি, আর উপকরণ হল 'ওড়াম-ভালা' বা 'আয়িলা-চালা-ভালা' নামের টানা বা বেড়াজাল, দুইই স্থানীয়ভাবে হাতে-বানানো। তৃতীয় এলাকাটি ম্যাঙ্গালোর আর রত্নাগিরির মাঝখানে, এটাও ম্যাকেরেল শিল্পের জমজমাট কেন্দ্র। মরসুম এখানে শুরু হয় একটু দেরিতে, অক্টোবর-নভেম্বরে, চলে ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত। ম্যাকেরেল ধরতে ব্যবহৃত হয় 'পাট্টাবালে' নামে টানাজাল এবং 'রামপানি' নামে খুবই বিশেষ এক ধরনের বেড়াজাল। 'রামপানি' খুবই লম্বা, ব্যবহার করতে লাগে প্রায় আশিজন লোক ও পাঁচটা শালতি। এইসব দেশি নৌকো আর সরঞ্জাম দিয়ে পাড় থেকে চার কিলোমিটারের মধ্যে শুধু মাছ ধরা যায়।

মৎস্যশিল্পে এই মাছের অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণে ভারত সরকার মহারাষ্ট্রের কারওয়ারে ভারতীয় ম্যাকেরেলের জন্য একটি জীবতাত্ত্বিক গবেষণাকেন্দ্র খুলেছেন। এই সামুদ্রিক মাছের বিশাল ঝাঁক দূর থেকেই চোখে পড়ে। দিনের বেলায় ঝাঁকগুলিকে দেখায় কালো ছায়ার মতো, জলে থাকে ছোট ছোট ঢেউ। রাত্রিবেলা মাছগুলোকে দেখা যায় তাদের শরীর থেকে বেরোনো অনুপ্রভার জন্য।

ম্যাকেরেল খেতে চমৎকার, বিশেষত টাটকা অবস্থায়। ধরা মাছের একটা বড় অংশ (40%) বরফে ঠাণ্ডা করে ট্রেনে ট্রাকে দেশের ভিতরের নানা শহরে চালান দেওয়া হয়। প্রায় 60% লবণে বা অন্যভাবে জরানো হয়ে থাকে—তার এক অংশ দেশেই খাওয়া হয়, বাকিটা রপ্তানি হয় শ্রীলঙ্কার মতো কাছাকাছি দেশে। খুব বেশি পরিমাণ ধরা পড়লে, বাড়তি মাছ থেকে সার বানানো হয়। পাখনা, ফুলকো আর অন্ত্র দিয়ে প্রধানত তৈরি হয় মাছচারা।

‘বম্বে ডাক’ মৎস্যশিল্প

‘বম্বে ডাক’ হল হারপোডন নেহেরিয়াস (Harpodon neherias) নামক স্কোপলিড (Scoplid) মাছের চলতি নাম। ভারতের একটি সুপরিচিত বাণিজ্যিক মাছ এটা। সামুদ্রিক মৎস্য-ব্যবসায়ের এই 10% অংশভাগী মাছ রত্নগিরি থেকে ব্রোচ (সৌরাষ্ট্র) পর্যন্ত বোম্বাই উপকূলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— বার্ষিক পরিমাণে ম্যাকেরেলের পরেই। বম্বে ডাক প্রব্রজক মাছ, পূর্ব উপকূলে ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত এদের দেখা যায়।

বোম্বাই উপকূলে এ মাছের মরসুম অক্টোবর-ডিসেম্বর থেকে মে-জুনের শেষ পর্যন্ত। ধরার সরঞ্জাম শুধু একটা বড় জাল, যা তীর থেকে 6-8 কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে নৌকো থেকে ছোড়া হয়। বোম্বাই অঞ্চলের জেলে ও অন্যান্য জাতের লোকেরা এ মাছ খুব পছন্দ করে, তারাই ধরা মাছের প্রায় 20% টাটকা খেয়ে নেয়, বাকি 80% রোদে শুকোনো হয়। ধরা মাছের দৈর্ঘ্য 90-300 মিমি।

রিবন ফিশ বা ফিতে মাছ

সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের তুলনামূলক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ধরা মাছের মোট বার্ষিক পরিমাণের একটা বড় অংশ রিবন ফিশ— 3700 থেকে 3800 টন। ভারতের সাগরগুলোতে তিনটি প্রজাতির প্রাধান্য, তারা সবাই মাংসাশী এবং অসম্ভব পেটুক। প্রজাতিগুলো আলাদা আলাদা ঝাঁকে আলাদা আলাদা ঋতুতে ঘুরে বেড়ায়। সারা উপকূল জুড়েই এরা ব্যাপকভাবে ছড়ানো, সব অঞ্চলেই টানা জাল দিয়ে এদের ধরা হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল কেরালা, তার পরেই মাদ্রাজ ও অন্ধ্র উপকূল। প্রধানত উপকূলের গরিব লোকেরাই রিবন ফিশ টাটকা খায়। প্রায় 40-45% রোদে শুকিয়ে শুটকি মাছ হিসাবে বিক্রি হয়।

ইহুদি মাছ

সামুদ্রিক মৎস্য-ব্যবসায়ে জু ফিশ (ইহুদি মাছ, Jew Fish) বা সায়িনিডদের অবদান বেশ বড়, বিশেষত বোম্বাই ও কাথিয়াওয়াড় উপকূলে। এই গোত্রের মিঠে-জলের প্রজাতিরাও গঙ্গা ও তার মোহনা-বদ্বীপের মৎস্যশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ।

এই গোত্রে বহু প্রজাতি থাকলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে শুধু কয়েকটিই গুরুত্বপূর্ণ। বোম্বাইতেই এ সব মাছ সবচেয়ে বেশি, সেখানকার জেলেরা এদের তিন জাতে ভাগ করে: (1) 'ঘোল' অর্থাৎ সিউডোসায়িনা (Pseudosciaena) —বড় জাত; (2) 'কোঠ' অর্থাৎ অটোলিথয়ডস ব্রুনিয়স (Otolithoides brunneus, Day); এবং (৩) 'ঢোমা' তথা সব রকমের ছোট সায়িনিড।

গাঙ্গেয় অঞ্চলে পামা পামা (Pama pama, Ham) এবং সিউডোসায়িনা কয়বর (Pseudosciaena coibor, Ham) হল বাণিজ্যিক দিক দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি।

সায়িনিডরা মূল্যবান খাদ্যের উৎস তো বটেই, তা ছাড়াও তাদের বড় বড় পটকা শুকিয়ে তা থেকে বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন আইজিংগ্লাস পাওয়া যায়।

পমফ্রেট

পমফ্রেট বা 'বাটারফিশ'দের এখন তিনটি আলাদা গণে ফেলা হয়। আসল পমফ্রেট হল ধূসর রঙের, স্ট্রোমেটিয়স গণভুক্ত; সাদা পমফ্রেট হল কোনড্রোপ্লাইট (Chondroplites) গণের। কালো পমফ্রেট বা ফর্মিও (Formio) সম্ভবত আসলে এই গোত্রেরই নয়। তবে মৎস্যশিল্পে এদের সকলকে এক নামেই ডাকা হয়। নরম মাংস, মোলায়েম স্বাদ এবং শক্ত কাঁটা না থাকার কারণে খাদ্য হিসাবে পমফ্রেটের স্থান খুব উঁচু। ভারতের সবচেয়ে দামি তিনটি সামুদ্রিক মাছের মধ্যে পড়ে পমফ্রেট।

পশ্চিম উপকূলে পমফ্রেট ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি হল দক্ষিণ কর্নাটক ও মালাবার; পূর্ব উপকূলে বিশাখাপতনম ও জেল্লোর জেলা। বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশেও পমফ্রেট ধরা হয়।

ভারতীয় স্যামন

পলিনেমিডি গোত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হল এলিউথেরোনেমা টেট্রাড্যাকটিলাস বা পলিনেমাস টেট্রাড্যাকটিলাস, বোম্বাইতে যার নাম 'রাওয়া' (বাংলায় গুড়জালি)। ভারতের সমুদ্রে আরও তিনটি প্রজাতি দেখা যায়। এরা মাংসাশী, চিংড়ি কাঁকড়া আর পূর্ণাস্থি মাছের বাচ্চা খায়। পূর্ণবয়স্ক মাছেরা শীতকালে নদীর উজানে জোয়ারসীমা পর্যন্ত উঠে আসে, হুগলি নদীর মোহনায় তাদের পাওয়া যায়। পূর্ব উপকূলে এদের দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, গোপালপুর ও গঞ্জামে এবং পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই ও গুজরাতে। পূর্ব উপকূলে মরসুম হল ফেব্রুয়ারি থেকে মে, পশ্চিম উপকূলে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর।

মোহনায় এবং উপকূলের ভিতরের অগভীর জলে এদের ধরার সরঞ্জাম হল বেড়াজাল আর টানাজাল, আর সমুদ্রে লম্বা সুতোর আগায় ছোট মাছের টোপ।

সিয়ারফিশ

ব্যবসায়িক দিক দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতিগুলি হল স্কোম্বেরেমোরাস কমার্সোনিআই, গুটেটাস, কুলি এবং ইনটেরেপটাস। সার্ডিন, অ্যাংকোভি বা চিংড়ির টোপ লাগিয়ে লম্বা সুতোর সাহায্যে সিয়ারফিশ ধরা হয় পুরো উপকূল জুড়েই। সারা ভারতে খাওয়ার মাছ হিসাবে এর কদর খুব। এরা ম্যাকেরেলের আত্মীয় এবং ম্যাকেরেলের মতো এদেরও মাংস লালচে ও চর্বিভরা। আকারে বড় হওয়ায় অনেক সময়েই এদের কেটে বিক্রি করা হয়। নুনে জরিয়ে শুকনোও হয় প্রচুর পরিমাণে।

সোল ও তাদের জ্ঞাতিরা

এই প্লিউরোনেকটিডি মাছেদের চলতি নাম পাতামাছ। এদের অনেকগুলি গণ। তবে ভারতের সোল মাছের চাষ প্রধানত একটি প্রজাতির উপরই নির্ভরশীল—সাইনোগ্লসাস সেমিফ্যাসিয়াটস, যা মেলে মালাবার, কেরালা ও দক্ষিণ কর্নাটক উপকূলে। এদের স্থানীয় নাম উত্তরে 'নাঙ্গু' আর দক্ষিণে 'মন্থল'। এ ছাড়া কাথিয়াওয়াড় উপকূলও অন্যান্য জাতের পাতামাছের জন্য পরিচিত। সস্তা বলে গরিব লোকেরা এ মাছ টাটকা ও নোনা দুভাবেই খেয়ে থাকে। সারা উপকূলে মরসুমের শুরু দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি-বর্ষার পরে পরেই, চলে নভেম্বর অবধি। এ সব মাছ ধরার সরঞ্জাম হল বেড়াজাল, টানাজাল আর নৌকো থেকে ছাড়া খেপলা-জাল।

টিউনা

টিউনা (থুনিডি) হল মহাসমুদ্রের বিশ্ববিখ্যাত মাছ। জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলিতে যন্ত্রচালিত নৌযান-সমন্বিত বৃহৎ টিউনা শিল্প গড়ে উঠেছে, ভারতে তা শুরু হয়েছে সবে। টিউনারা বিরাট মাছ, টিনজাত মৎস্য ব্যবসায়ে গুরুত্বপূর্ণ।

উপরের গুরুত্বপূর্ণ গোত্রগুলি ছাড়া উপকূলের মৎস্য ব্যবসায়ে ক্যারাঙ্গিড, রুপো-পেটি (silver bellies), ইল, উড়ুক্কু মাছ এবং লাল মালেটদেরও ভূমিকা আছে।

অগভীর ও গভীর সমুদ্রে

মহাদেশ-সংলগ্ন থাকের পরে বিশাল মহাসমুদ্র, নানা বিচিত্র ধরনের মাছে ভরা। এদের কেউ কেউ থাকে জলের উপরিভাগে, কেউ কেউ মাঝামাঝি, কেউ কেউ গভীর জলে বা একেবারে তলদেশে। অগভীর ও গভীর সমুদ্রের মৎস্যশিল্প এই মৎস্য-সম্পদকেই কাজে লাগায়। যন্ত্রচালিত নৌকো আর উদ্যোগী ব্যবসায়ীর অভাবে ভারতে আগে এ দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়নি। জেলেদের আর্থিক অবস্থাও যন্ত্রচালিত মৎস্য-শিকারের বিপুল মূলধন জোগাতে পারত না।

এই শতকের গোড়ার দিকে অবশ্য গভীর ও অগভীর সমুদ্রের মৎস্য-সম্পদ জরিপের চেষ্টা হয়েছিল। ট্রলারের সাহায্যে প্রাথমিক সমীক্ষা চালানো হয়েছিল বঙ্গোপসাগরে, বোম্বাই

ও কাথিয়াওয়াড় উপকূলবর্তী আরব সাগরে, কোঙ্কন ও কমণ্ডল উপকূলের কিছু কিছু অংশে। এই সব সমীক্ষায় বিপুল মৎস্য-সম্পদ আবিষ্কৃত হল, ভবিষ্যতের জন্য চিহ্নিত হল মৎস্য-শিকারের নানা সমৃদ্ধ কেন্দ্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে এ দিকে আর নতুন কোনও প্রয়াস নেওয়া হয়নি। 1946-এ ভারত সরকার বোম্বাইতে পরীক্ষামূলকভাবে একটি গভীর সমুদ্রের মৎস্যশিল্প কার্যালয় স্থাপন করলেন। পরবর্তী বছরগুলিতে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের মতো কিছু কিছু রাজ্য সরকারও নিজস্ব সামুদ্রিক মৎস্যশিল্প কার্যালয় গঠন করলেন। 1958-র মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার আরও দুটি কার্যালয় যোগ করলেন—একটা কোচিনে, অন্যটা বিশাখাপতনমে। কাজের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দিকগুলিতে সহযোগিতা করছেন নরওয়ে, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো নানা দেশের বিশেষজ্ঞরা। বর্তমানে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রলিং-ক্ষেত্র আছে—বোম্বাই, ক্যাম্বে, ভেরাভাল, পোরবন্দর ও দ্বারকায়।

অগভীর ও গভীর সমুদ্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাছগুলি হল 'রাওয়া' (ভারতীয় স্যামন, বাংলায় 'গুড়জালি', এলিউথেরোনেমা টেট্রাড্যাকটিলাস), 'দারা' ('জায়েন্ট হেডফিন', পলিড্যাকটিলাস ইন্ডিকাস), 'ঘোল' (জু ফিশ, সিউডোসায়িনা ডায়াক্যান্থাস), 'কোঠ' (অটোলিথয়ডস ব্রুনিয়স, বড় জাতের সায়িনিড), 'ওয়াম' (সামুদ্রিক ইল বা বান, মিউরিনোসক্স), 'কার্কারা' (গ্রান্টার, জু ফিশ) এবং পমফ্রেট। এ সব ছাড়া ক্যাটফিশ, রে এবং ছোট জাতের সায়িনিডও ওঠে।

দেখা গেছে, সবচেয়ে লাভজনক গভীরতা হল প্রায় 20 ফ্যাদম (37 মিটার), শিকার বেশি হয় রাত্রির চেয়ে দিনে এবং ভরাকটালের চেয়ে মরাকটালে। অগভীর ও গভীর সমুদ্রে ব্যাপকহারে মাছ ধরার জন্য ট্রলার ব্যবহৃত হয়। নানা ধরনের ট্রলিং-জাল প্রচলিত, সবচেয়ে পুরোনো হল আটার (Otter) ধরনের জাল। জাপানি কায়দায় বুল-ট্রলিংই (bull-trawling) দেখা গেছে বেশি ফলপ্রদ, বোম্বাই-সৌরাষ্ট্রের সমুদ্রে এই পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হয়।

পরীক্ষামূলক ট্রলিং-এর অন্য দুই কেন্দ্র হল কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গ। কেরালায় যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তার নাম 'ডোরি ফিশিং'। এতে একটি মূল জাহাজ ছোট ছোট নৌকো টেনে নিয়ে যায় মাছ ধরার জায়গায়। মাছ আসলে ধরা হয় সুতো-বঁড়শিতে। এ ছাড়া ট্রলিংও বেশ চলে। এইসব অনুসন্ধানের ফলে আরব সাগরে পার্চ ধরার নানা লাভজনক জায়গার হদিশ মিলেছে।

গভীর ও অগভীর সমুদ্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাছ হল—পূর্ণাস্থিদের মধ্যে নানা জাতের পার্চ যেমন এপিনেফেলাস ও লুটিয়েনাস এবং হাঙরদের মধ্যে ক্যার্কারাইনাস ও প্রিস্টিস।

বঙ্গোপসাগরে গভীর-সমুদ্র মৎস্য-শিকারের কার্যালয়গুলি রয়েছে ব্ল্যাক প্যাগোডা, স্যান্ডহেড, টাইগার পয়েন্ট, ফলস বে পয়েন্ট, দেবী নদীর মোহনা, প্রাচী নদীর মোহনা এবং বৈতরণী নদীর মোহনায়। সাধারণত ধরা পড়ে সায়িনিড, পার্চ, রিবন ফিশ, ইল, হাঙর ও রে।

গভীর সমুদ্র মৎস্যশিল্পের সাফল্যের জন্য চাই পোতাশ্রয় ও নোঙর ফেলার জায়গা; ঘাট থেকে বিতরণ ও পরিভোগের কেন্দ্রগুলি পর্যন্ত মোটর-যান; বিপণন ও সংরক্ষণের

সুবিধা ; বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মিদল। বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার এ সবই বিচার করে দেখছেন। বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় এবং যে সব দেশে মৎস্যশিল্প বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নতিলাভ করেছে সে সব দেশের প্রযুক্তিগত সহায়তায় ভারতেও অচিরে আধুনিক প্রণালীর মৎস্যশিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

অন্তর্দেশীয় মৎস্যশিল্প

আগেই বলা হয়েছে, ভারতে বহু নদী, অসংখ্য সেচনালি, পুকুর, জলাধার, দিঘি। তা ছাড়াও রয়েছে বিস্তীর্ণ মোহনা-অঞ্চল (বদ্বীপ বা নদীমুখ), উপহ্রদ, বদ্ধজলা, নোনা জলের হ্রদ। ছোট বড় এই সব রকমের জলাশয়ে রয়েছে অন্তর্দেশীয় মৎস্যশিল্পের বিপুল সম্পদ। সুবিধার খাতিরে এই মৎস্যশিল্পকে তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হবে : (১) মোহনার মৎস্যশিল্প (২) নদীর মৎস্যশিল্প (৩) পুকুরের মাছ চাষ।

মোহনার মৎস্যশিল্প

মোহনার মৎস্যশিল্পগুলি পূর্ব উপকূলে গঙ্গা, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর মোহনায় এবং পশ্চিম উপকূলে নর্মদা ও তাপ্তীর মোহনায় অবস্থিত। তা ছাড়া চিল্কা ও পুলিকটের মতো হ্রদ এবং এবং কেরালায় ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের উপকূলবর্তী বদ্ধ জলাগুলিও সুপরিচিত। মোহনায় এবং তার কাছাকাছি হ্রদগুলিতে জল নোনা; লবণাক্ততার তারতম্য যে সব মাছ সহ্য করতে পারে তারাই এখানে সবচেয়ে ভাল বাড়ে। সার্ডিন ও অ্যাংকোভিদের কোনও কোনও প্রজাতি (যেমন হিলসা ইলিশ, অ্যাংকোভিয়েলা, থ্রিসোক্লেস, নেমাটোলোসা ও সেটিপিনা) ; কিছু কিছু মালেট (যেমন লিজা করসুলা, মিউজিল সেফালাস) ; ক্যাটফিশ (যেমন ট্যাকিসিউরাস বা এরিয়স, প্যাঙ্গাসিয়স, মাইস্টাস), পার্চ (যেমন ল্যাটেস ক্যালকেরিফার, এপিনেফেলাস), পার্লস্পট বা এট্রোপ্লাস—এ সবই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

ওড়িশার চিল্কা হ্রদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি ভারতের বৃহত্তম মুক্ত-মোহনা-হ্রদগুলির একটি, বিশুষ্ক গ্রীষ্মেও এর ব্যাপ্তি 906 বর্গ কিলোমিটার। বর্ষায় তা ফেঁপে দাঁড়ায় 1,165 বর্গকিলোমিটার। 23 কিলোমিটার লম্বা একটি খাল একে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এ জল পায় প্রধানত দয়া নামে মহনদীর একক শাখানদী থেকে। এর গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক মাছগুলি হল গেরেস, অ্যাম্ব্যাসিস, স্ট্রঙ্গিল্যুরা, জেনেনটোডন, থেরাপন, সিল্যাগো এবং মেগালপ; আর মিঠে-জলের জাতগুলির মধ্যে রয়েছে কার্প, ক্যাটফিশ ও মারেল। ধরা মাছের বার্ষিক পরিমাণ প্রায় 3000 টন, তার 90% টাটকা রফতানি হয়, বাকিটা স্থানীয়ভাবে খাওয়া হয় অথবা নুনে জারানো হয়।

আরেক ধরনের মোহনা-হ্রদ হল কৃত্রিম বাঁধ দিয়ে আটকানো নোনা জল। এই রকম মৎস্যশিল্প জাভা ও ফিলিপাইনেই বিশেষ বিকাশ লাভ করেছে। ভারতে তা চালু আছে পশ্চিমবঙ্গে। সেখানে এর নাম 'ভাসাবান্ধা' বা 'ভেড়ি'। মোহনা এলাকায় বাঁধ বা দেওয়াল তুলে বান ও জোয়ারের জল ঠেকিয়ে জমি উদ্ধার করা হয় এবং তাতে একটি বা দুটি ফসলের চাষ হয়। জমিতে যখন ফসল থাকে না তখন স্লুইস গেট খুলে নদীর মিঠে-জলে এ সব জমি ভরিয়ে তাতে মাছের আবাদ চলে। নদীর জলে ভেসে আসে মাছ আর মাছের বাচ্চা, বদ্ধ জলের নিরাপদ আশ্রয়ে বেড়ে ওঠে তারা। ভাল রকম বাড়লে পরে এদের ধরে বিক্রি করা হয়।

মালাবারও ভেড়ির জন্য বিখ্যাত। কেরালার বদ্ধজলা ভেম্পানাড কায়ালের কাছাকাছি এলাকাগুলিতে ধান চাষের জমি উদ্ধার করা হয়েছে। একটাই ফসল হয়— জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর। ফসল উঠে গেলে বাঁধ বা দেওয়ালগুলো উঁচু করে জোরদার করা হয়। জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল এসে ঢোকে। সেই সঙ্গে ভেসে আসে হাজার হাজার মাছ আর চিংড়ি, ঘোরওয়ের মধ্যে মাস-ছয়েক বাড়ার পর তারা ধরার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। মাছের মধ্যে সবচেয়ে বেশি থাকে মালেট আর পার্লস্পট— প্রায় 20%—বাকিটা চিংড়ি।

ভারতের মাছ চাষে নারাক্কাল ভেড়ি গুরুত্ব অর্জন করেছে। নারাক্কাল আদতে ছিল কেরালার এক জলাভূমি। সরকার (সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ স্টেশন) সেটাকে অধিগ্রহণ করে মালেট (মিউজিল) ও মিল্কফিশ (চানোস) চাষের ভেড়ি বানিয়েছেন। বেশ কিছু দিঘি, বাঁধ আর স্লুইস-গেট নিয়ে এই ভেড়ির ব্যাপ্তি 50 বর্গ কিমি। জোয়ারের সঙ্গে মাছ ঢুকিয়ে নেওয়া হয়। প্রধান প্রজাতি হল মিউজিল সেফালাস— প্রায় 75%। খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এ মাছ—এক বছরে 45 সেমি লম্বা হয়ে যায়।

দক্ষিণ কেরালার আয়িরামথেঙ্গুতে কায়ামকুলাম হ্রদের কাছে ওই রকমই আরেকটি ভেড়ি বানানো হয়েছে। 0.08 বর্গ কিমি ব্যাপ্তির এই ভেড়িতে এট্রোপ্লাস-এর আবাদ হয়।

নোনা জলে আবাদ করার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী মাছ হল চানোস, মিউজিল, এট্রোপ্লাস, ল্যাটেস, তেলাপিয়া এবং অসফ্রোনেমাস বা গুর‍্যামি (gouramy)।

নদীর মৎস্যশিল্প

সিন্ধু, গঙ্গা, মহানদী, কাবেরী, কৃষ্ণা প্রভৃতি ভারতের বড় বড় নদী এবং অন্যান্য ছোটখাট নদী ও তাদের শাখাপ্রশাখা, খাল, অন্তর্দেশীয় হ্রদ, ঝিল, বিল, দিঘি, পুকুর— এই সবে রয়েছে বিপুল সংখ্যক মাছের জীবনধারণের বিচিত্র পরিবেশ। তাদের অর্থনৈতিক গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রধান প্রধান কার্প

এই দলে পড়ে কাতলা, রুই, কালবাউশ, ল্যাবেও ফিমব্রিয়েটাস, মৃগেল, মহাশোল এবং পুনটিয়াস।

সব কার্পই মূল্যবান খাওয়ার মাছ, দেশের শহরগুলিতে এদের বিরাট চাহিদা। উত্তর ভারতের সব জায়গায় সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এদের প্রচুর ধরা হয়, বাজারে মিঠে-জলের মাছেদের এরাই বড় অংশ। কার্পদের পুকুরে চাষ করা যায়। পুকুরে মাছচাষ অবশ্য মিঠে-জলে মাছচাষের এক বিশিষ্ট অঙ্গ, আলাদাভাবে তার আলোচনা করা হবে।

ক্যাটফিশ

বাণিজ্যিক দিক থেকে যে সব ক্যাটফিশ গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হল বোয়াল, পাবদা, পাঙাশ, সিলোনিয়া সিলোনডিয়া, আড়, মাইস্টাস আওর এবং বাচা। এ সব মাছের আঁশ নেই, মাংস নরম, কাঁটা কম। তবে এদের বিরুদ্ধে সংস্কার আছে কিছু পরিমাণে—ইহুদিদের এগুলো খাওয়া নিষিদ্ধ। এ সব মাছ আবর্জনা খায় বা ময়লা জলে থাকে, এই ভুল ধারণাও প্রচলিত আছে।

জিওল মাছ

জিওল মাছেরা হল একটি পাঁচমিশেলি দল, তাতে পড়ে দু জাতের ক্যাটফিশ, তিন-চার জাতের ওফিসেফালিড এবং এক জাতের ল্যাবেরেনথিসি। এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি হল সহায়ক শ্বাসযন্ত্রের অস্তিত্ব, যার সাহায্যে এরা জলের বাইরে বেশ কিছুক্ষণ বাঁচতে পারে বলেই এদের নাম 'জিওল মাছ' (প্রথম খণ্ড, অধ্যায় চার দ্রষ্টব্য)। বাজারে এদের বড় বড় জল ভরা মাটির পাত্রে রেখে জ্যান্ত বিক্রি করা হয়। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই সব মাছে বিশেষ পুষ্টি ও নিরাময়গুণ আছে এবং এরা রোগীর পক্ষে হিতকর।

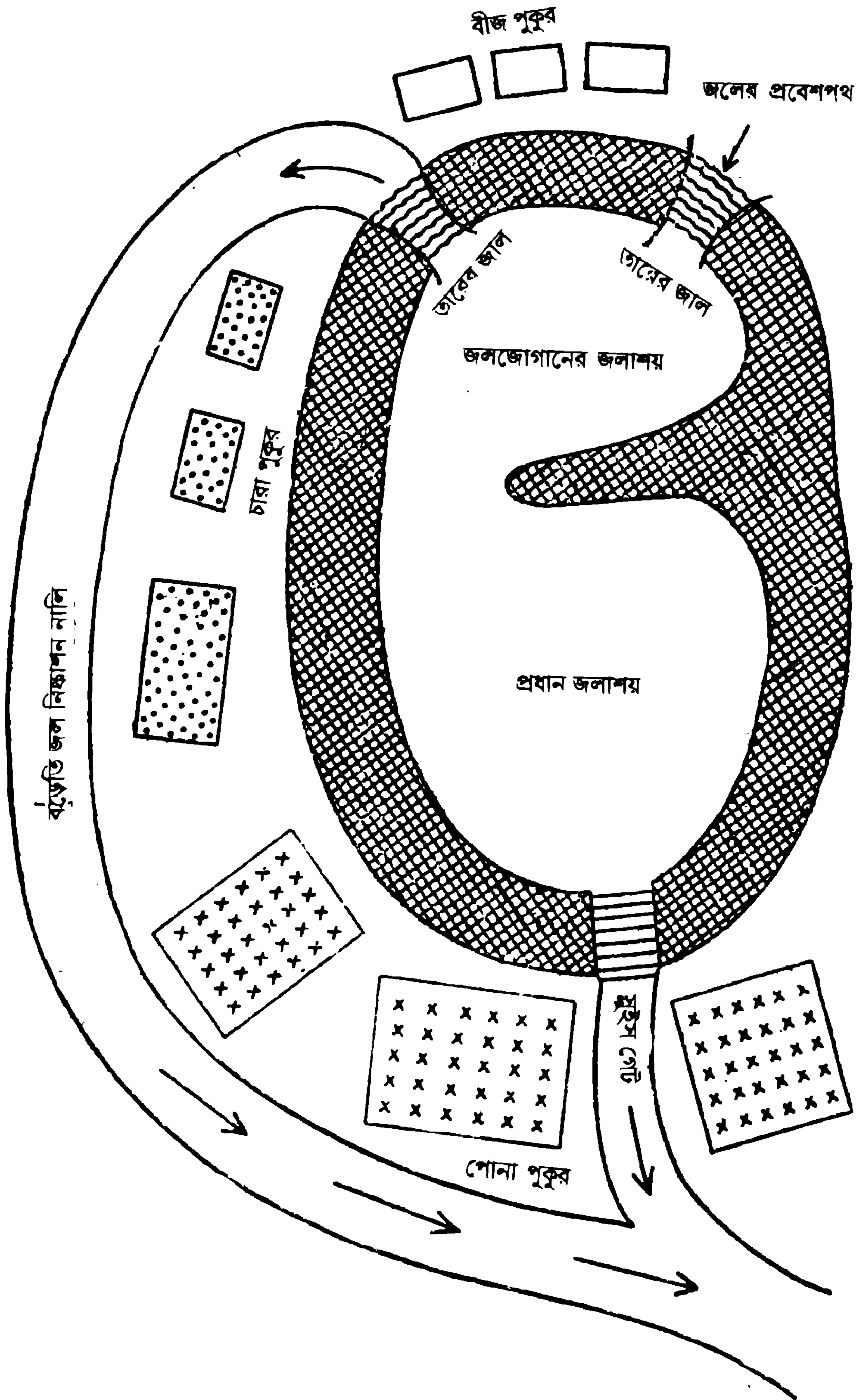
জিওল মাছের তালিকাটি এই: ক্যাটফিশদের মধ্যে মাগুর আর শিঙি, সাপমুখো বা ওফিসেফালিডদের মধ্যে শোল, চানা গ্যাচুয়া (Channa gachua) টাকি, শাল; আর ল্যারেরিনথিসিদের মধ্যে অ্যানাবাস টেস্টুডিনিয়স (Anabas testudineus)। ভারতের মোট বিক্রয়যোগ্য মিঠে-জলের মাছের প্রায় 10% হল জিওল মাছ। গ্রামের যে সব পুকুর ও সেচকূপে কার্প চাষ সম্ভব নয় সেখানে এই সব মাছের চাষ উৎসাহিত করার জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্নাটক ও কেরালার রাজ্য সরকার গত 10 বছর যাবৎ চেষ্টা করে আসছেন।

ভারতের মিঠে-জলের মাছ চাষে আরও কটি জাতের উল্লেখ করা যেতে পারে— যেমন চিতল বা নোটপটেরস, কিছু কিছু মিঠে-জলের মালেট (মিউজিল) এবং মিঠে-জলের ইল অ্যাঙ্গুয়িলা বেঙ্গলেনসিস।

পুকুরের মাছচাষ

মাছের আবাদ ভারতের একটি প্রাচীন শিল্প। তবে আরও পুরোনো সভ্যতার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় চিনারা ও রোমানরা এই আবাদ করত আরও আগে।

কুয়ো, বাগান বাড়ি বা মন্দিরের পুকুরে মাছ পোষা ভারতে অনেক দিন ধরেই চলে আসছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে সব রাজ্যে মিঠে-জলের মাছ প্রধানত খাওয়া হয়—যেমন



চিত্র 20 · মাছের ভেড়ির নকশা

বাংলা, আসাম, বিহার ও ওড়িশায়—সেখানে তা খুবই জনপ্রিয় ছিল। এ সব রাজ্যে মাটি স্বভাবতই সমৃদ্ধ, বৃষ্টিপাত তুলনায় বেশি, ছোটবড় পুকুর, সেচ-জলাধার, খাল ইত্যাদি অজস্র জলাশয়ের সমাবেশ। এই সব পারিপার্শ্বিক কারণ এবং তার সঙ্গে এখানকার লোকজনের খাদ্যাভ্যাস ছিল স্থানীয় মাছের চাষের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল।

পুরোনো কায়দা ছিল কার্পের খুব ছোট, 4.25 সেমি খানেক লম্বা, পোনা ধরে পুকুর বা বাঁধ-দিয়ে-আটকানো জলে ছেড়ে দেওয়া। বছর দুয়েক বাড়ার পর সেগুলোকে জাল ফেলে ধরা হত।

দেশের মানুষের খাদ্যে মাছের পুষ্টিমূল্য উপলব্ধি করে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মাছচাষের উন্নতিসাধন মারফত বিপুল জলসম্পদ কাজে লাগানোর জন্য অনেক রাজ্য মৎস্যশিল্প বিভাগ স্থাপন করেছে। এই বিভাগগুলি নদী থেকে মাছের বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি, আগ্রহী পুকুর মালিকদের মধ্যে মাছের বীজ বিতরণ এবং নানা ধরনের আবদ্ধ জলাশয়ে মাছের চাষ উন্নত করার দায়িত্ব গ্রহণ করল।

মাছের চাষে ভাল ফলন পেতে গেলে উপযুক্ত প্রজাতি বাছাই করাটা গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে উপযুক্ত প্রজাতি হল সেগুলোই যেগুলো শুধু দ্রুত বাড়ে না বরং অনেক বড়ও হয় ; সেই সঙ্গে এমন সব জাতের মাছ পছন্দ করা উচিত যেগুলো খাদ্যের জন্য একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দেবে না বা পরস্পরকে আক্রমণ করবে না। সনাতন পদ্ধতি হল কাতলা, রুই, মৃগেল, কালবাউশের মতো কার্পের সঙ্গে কিছু ছোট কার্পের আবাদ করা। এগুলো ছাড়া সাধারণ কার্প এবং দু-জাতের চিনা কার্প, এই দুটি বিদেশি কার্পও চাষ করার উপযোগী।

বড় বড় পুকুর-দিঘিতে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মাছ চাষের ধারণা গত কয়েক দশকে বেশ কটি রাজ্যে শিকড় গেড়েছে। ব্যাপকহারে সফলভাবে মাছ চাষের জন্য চার ধরনের জলাশয় লাগে: (1) বীজ পুকুর।* (2) চারা পুকুর (3) পোনা পুকুর (4) প্রধান জলাশয়। চাষের মরসুম শুরু হওয়ার দিন তিরিশেক আগে এই জলাশয়গুলোকে তৈরি করতে হয়।

প্রমাণ সাইজের বীজ পুকুর হয় 13x1.5–2.4 মিটার এবং 0.6 মিটার গভীর। জল হওয়া চাই পরিষ্কার, তাতে যেন কোনও ক্ষতিকর প্রাণী বা উদ্ভিদ না থাকে। বর্ষার প্রথমে নদীর খানাখন্দ থেকে ডিম আর সদ্যোজাত শূককীট তুলে এনে এই পুকুরে ছাড়া হয়। উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে শূককীটদের অন্তত 50%কে চারা করে তোলা যায়। ডিম পাড়া এবং শূককীটদের প্রাথমিক বিকাশের পর্যায়টি খুবই ছোট, মোটামুটিভাবে 18-24 ঘণ্টা। এই বয়সের ছানাগুলো খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে, রোজ খাওয়ানো উচিত এদের। 15-20 দিনে যখন এরা 25 মিমি হয় তখন এদের নিয়ে যাওয়া হয় চারা পুকুরে।

চারা পুকুর প্রায় 0.05 হেক্টর বিস্তৃত, 1.0 মিটার গভীর। জল সব সময় পরিষ্কার রাখা

---

* আজকাল পুকুরটি বাদ দেওয়া হয়। ছানাগুলোকে সারাসরি চারা পুকুরেই ছাড়া হয়। পুকুরের মাছচাষে এখন তিনটে পর্যায়।

উচিত। জলে আগে থেকেই প্রচুর জৈব ও অজৈব সার ফেলে রাখতে হয়, যাতে চারা মাছের স্বাভাবিক খাদ্য যেসব আণুবীক্ষণিক প্রাণী ও উদ্ভিদ (প্ল্যাংকটন) তারা অঢেল জন্মাতে পারে। চারা যাতে ভালভাবে বেড়ে পোনা হতে পারে সে জন্য খোল, তুষ, ভূষি এ সবও ফেলা দরকার। 100-150 মিমি লম্বা হলে চারামাছ পোনাপুকুরে যাওয়ার উপযুক্ত হয়। এই পর্যায়টি পার হতে মাস তিনেক সময় লাগে। কড়া আলো, তাপ, বৃষ্টি এবং শিকারি পাখিকে ঠেকানোর জন্য পাতার একটা অস্থায়ী ছাউনি দেওয়া উচিত।

তৃতীয় জলাশয়টি, অর্থাৎ পোনা পুকুর, আরও বড় এবং গভীর— যথাক্রমে প্রায় 0.1 হেক্টর ও 1.5 মিটার। পোনাগুলোকে চারাপুকুর থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়। আসল উদ্দেশ্য, প্রধান জলাশয়ে ছাড়ার আগে তাদের গা-সইয়ে নেওয়া। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় জাল ফেলার মহড়া চলে। বিশেষ ধরনের মশারি-জালে পোনাগুলোকে ধরে আবার ছেড়ে দেওয়া হয়। এইভাবে ওরা শেষ দিনের জাল-ধরা আর স্থান-বদলের ধকল সহ্য করতে শেখে। এই পোনা পুকুরে পোনাগুলো 4-6 মাস থেকে বেড়ে শক্তপোক্ত হয় এবং প্রায় পূর্ণবয়স্ক মাছের আকার ধারণ করে।

প্রধান জলাশয় হওয়া উচিত 0.20–2 হেক্টর বড় এবং 2–2.5 মিটার গভীর। বারো মাসেই পোনাগুলো বিক্রির সাইজে এসে যায়, কিলোখানেক ওজন নিয়ে খাওয়ার উপযোগী হয়ে ওঠে। মাছ অবশ্য আরও রাখা যায়, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছর অবধি, কিন্তু তখন তাদের বাড় আস্তে হয়ে যাওয়ায় তা আর লাভজনক থাকে না।

এই রকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে হেক্টর পিছু বছরে আগেকার 800 কেজি-র জায়গায় 3,000–10,000 কেজি অবধি ফলন পাওয়া যেতে পারে।

সংঘটিত প্রজনন

তা হলে দেখা গেল, কার্পেরা বন্দি অবস্থায় বৃদ্ধি ও পরিণতি লাভ করতে পারলেও বদ্ধ জলে বংশবৃদ্ধি করে না। আগেকার দিনে মাছচাষীরা বর্ষার সময় প্লাবিত নদী থেকে দেশি কায়দায় ডিম আর ছানা সংগ্রহ করত। আবহাওয়া আর বন্যার জলের খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করে এইভাবে নদী থেকে মাছের বীজ সংগ্রহ বিপজ্জনক, ব্যয়সাপেক্ষ এবং অনিশ্চিত। তা ছাড়া সংগৃহীত বীজকে জাত-অনুযায়ী পৃথক করা যায় না, চাষ করে তাই তত লাভও হয় না।

এই সব বাধা অতিক্রমের জন্য মৎস্যশিল্প গবেষকরা অনেক বছর ধরে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে শেষে 1957 সালে সাফল্য অর্জন করলেন। পুকুরে বা সিমেন্টের চৌবাচ্চায় কার্পদের কিছু বড়-ছোট জাত পোষা হল। প্রত্যেক প্রজাতির পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী কার্পকে পিটুইট্রিন নামে পিটুইটারি গ্রন্থির (এটি মধ্য-মস্তিষ্কের গোড়ায় অবস্থিত একটি এন্ডোক্রিন বা নালিহীন গ্রন্থি) এক রকম নির্যাস ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। ভ্রূণতত্ত্ব ও হর্মোনতত্ত্বের অগ্রগতির ফলে প্রজননক্রিয়ার হার বদলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পিটুইটারি হর্মোনের ইঞ্জেকশন জননাঙ্গগুলির বৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দেয়। স্ত্রী মাছের ডিমগুলি বেড়ে পাড়ার উপযুক্ত হয়ে ওঠে, পুরুষ মাছও তার শুক্র ছেড়ে দেয় জলে, সেখানেই নিষেক ঘটে। এই পদ্ধতিরই নাম সংঘটিত প্রজনন।

নিষিক্ত ডিমগুলি ফুলে একটা নৌকোর আকারের বস্তুতে পরিণত হয়, তার ভিতরে ভ্রূণগুলি বিকশিত হয়। 10–15 ঘণ্টার মধ্যে ডিম ফুটে শূকর্কীট বেরোয় ; আগেই বলা হয়েছে, এদের বীজ পুকুর বা চারা পুকুরে বড় করা যায়। এক-এক প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষ বেছে নিয়ে প্রত্যেক প্রজাতির লক্ষ লক্ষ বিশুদ্ধ ছানা ফোটানো যেতে পারে।

ভারতে এক নতুন ধরনের সংঘটিত প্রজনন নিয়ে পরীক্ষা চলছে। 1976 সালেই জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার রিপোর্টে জানা গিয়েছিল যে মানুষের কোরায়োনিক গোনাডোট্রোপিন (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) ব্যবহার করে কোনও কোনও চিনা মাছের প্রজনন ও বংশবৃদ্ধিতে উৎসাহজনক ফল পাওয়া গেছে। জরায়ুতে বিকাশমান ভ্রূণের ফুল এই হর্মোন তৈরি করে এবং তা অন্তঃসত্ত্বা মায়ের প্রসবের সঙ্গে বেরিয়ে আসে; পিটুইটারি গ্রন্থির লুটিনাইজিং হর্মোনের সঙ্গে এই হর্মোনের মিল আছে। পদ্ধতিটি কিছু দেশে ব্যবহৃত হয়েছে এবং দেখা গেছে যে তা জননাঙ্গগুলির বিকাশ ও পরিণতি এবং ডিম-পাড়া ত্বরান্বিত করতে সক্ষম। পিটুইট্রিনের তুলনায় HCG-র কয়েকটি সুবিধা আছে; প্রধান সুবিধাগুলি হল, তার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সহজতর, দামেও শস্তা। 1984-তে বোম্বাইয়ের কেন্দ্রীয় মৎস্যশিল্প-শিক্ষাসংস্থা (Central Institute of Fisheris Education) HCG-কে সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করলেন পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা ও মধ্যপ্রদেশে; প্রধান প্রধান কার্প ও সিলভার কার্পের ডিম পাওয়া গেল অজস্র। তবে এই সাম্প্রতিকতম পদ্ধতিটি ফলপ্রদ হতে গেলে তাকে মাছচাষীদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।

আরেকটি আগ্রহজনক পদ্ধতির উল্লেখ করা যেতে পারে, যার নাম দেওয়া যায় 'বাঁধ প্রজনন'। এখানে বাঁধের কৃত্রিম পরিবেশে মাছের প্রজননের স্বাভাবিক পরিমণ্ডলের অনুকরণ করা হয়। স্লুইসের সংকীর্ণ পথে সঞ্চিত বৃষ্টির জল বেরিয়ে আসে, আর এই রকম জলে প্রজননক্ষম স্ত্রী ও পুরুষ মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়। টাটকা বৃষ্টির জলের প্রবাহ তাদের স্বাভাবিকভাবে বংশবৃদ্ধি করতে প্ররোচিত করে বলে বিশ্বাস। এখান থেকে ডিম আর ছানা তুলে নিয়ে বড় করা হয়।

'মিশ্র মাছ চাষ' হল একটি সম্প্রতি-উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল পদ্ধতি। কার্পের একটিমাত্র প্রজাতির বদলে পাঁচ-ছটি প্রজাতিকে এক সঙ্গে একটা জলাশয়ে বড় করা হয়—প্রতি হেক্টর পরিমিত জলে থাকে যথাযথ অনুপাতে মেশানো নানা জাতের পাঁচ থেকে আট হাজার পোনা। অন্য সব রকম মাছ চাষের মতো এতেও জলাশয়টি পরিষ্কার রাখা দরকার ; আধুনিক রাসায়নিক বা জৈবিক নিয়ন্ত্রণ-প্রণালীর দ্বারা দূর করা যায় শিকারি মাছ ও বিপজ্জনক আগাছা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে জলাশয়ের জল ও মাটির গুণাগুণও নিরূপণ করা উচিত এবং কোনও ঘাটতি থাকলে মধ্যে মধ্যে জৈব বা অজৈব সার ফেলে তা পূরণ করে দেওয়া যেতে পারে। পোনাগুলোকে রোজ খাওয়ানো চাই। এই সব শর্ত পূরণ করতে পারলে দেখা গেছে ফলন অনেক বেশি হয়।

ভারতীয়, চিনা ও ইউরোপীয় কার্প ছাড়া মাগুর, শিঙি, পাঙাশ ও আড়ের মতো ক্যাটফিশের কিছু কিছু প্রজাতিরও চাষ করা যায়। তা ছাড়া গাছ-বাওয়া পার্চ 'অ্যানাবাস', শাল-শোল-টাকি

এবং চিতল-ফলুইয়ের কোথাও কোথাও কদর এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব থাকায় এদেরও চাষ হয়ে থাকে। কেরালার উপকূলবর্তী বদ্ধজলে মালেট, মিল্কফিশ আর পার্লস্পটের ব্যাপক চাষ হয়। তেলাপিয়া (এট্রোপ্লাসদের জ্ঞাতি, সিক্লিড জাতীয় মাছ, আদি নিবাস আফ্রিকায়। সেখান থেকে ভারতে আনা হয়েছে।) অপর্যাপ্তভাবে বংশবৃদ্ধি করে; আজকাল পুকুরে ও হ্রদে এর আবাদ করা হচ্ছে। একটানা আবাদের পক্ষে উপযোগী এ মাছ।

প্রধানত প্রাকৃতিক জলাশয় ও পুকুরে মাছ চাষ করা হলেও একটি অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে—ধানসুদ্ধ মাছ চাষ। ধানগাছ কয়েক সেন্টিমিটার বড় হলে আর্দ্রতা ও পুষ্টির জোগান অব্যাহত রাখার জন্য খেত জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় সেখানে উপযুক্ত জাতের মাছ ছাড়লে ধান আর মাছ দুইয়েরই ভাল ফলন পাওয়া যায় বলে জানা গেছে। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় এই পদ্ধতি কিছু পরিমাণে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

দশ

মৎস্য শিকারের যান ও সরঞ্জাম

ভারতের সমুদ্র-উপকূল লম্বা, তার নদী ও মোহনার জলরাশিও বিস্তীর্ণ, তেমনি বিপুল তার মৎস্য-সম্পদ। কোনও দেশের মৎস্যশিল্পের সাফল্য নির্ভর করে তার জল পাড়ি দেওয়ার নৌকো আর তার মাছ ধরার জালের উপর। বর্তমান সমীক্ষায় আমরা দেখব, ভারতে সামুদ্রিক ও অন্তর্দেশীয় মৎস্য শিকারের জন্য সাদামাটা ভেলা ও ডিঙি থেকে শুরু করে মজবুত নৌকো পর্যন্ত নানা ধরনের জলযান উদ্ভাবিত হয়েছে, সবই মানুষের চালানো। মাছ ধরার জাল ও অন্যান্য উপকরণও প্রচুর এবং বিচিত্র। তবে এই নৌকো, উপকরণ সবই উদ্ভাবিত হয়েছিল শত শত বৎসর আগে এবং অন্যান্য উপকূলবর্তী দেশের মতো ভারতে কিন্তু এগুলোর, বলতে গেলে, কোনও উন্নতিই সাধিত হয়নি। ফলে ব্যাহত হয়েছে আমাদের নদী ও সমুদ্রের ব্যবহার। সবে গত দুয়েক দশকে কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে মোটরবোট আর বাষ্পযান ব্যবহারের।

মাছ শিকারের যান আর সরঞ্জাম এই কটি ভাগে আলোচনা করা হবে:

- সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের যান ও সরঞ্জাম
- অন্তর্দেশীয় মৎস্য শিকারের যান ও সরঞ্জাম
- যন্ত্রচালিত যান

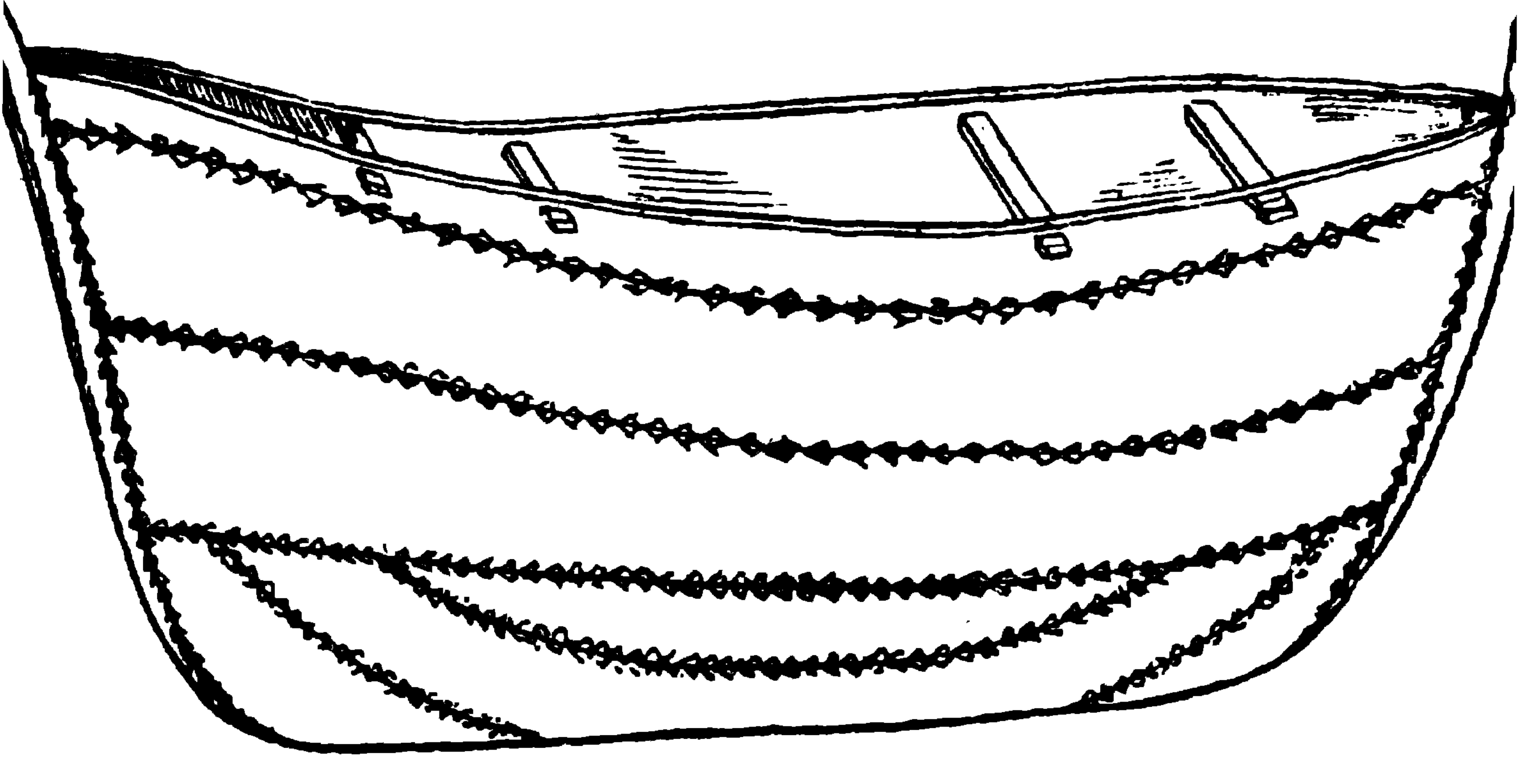
সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের যান ও সরঞ্জাম

মৎস্য শিকার যান

ভারতের সমুদ্রে নানা রকমের যান বা নৌকো ব্যবহার করা হয়। পূর্ব উপকূলে দেখা যায় ক্যাটাম্যারান, মাসুলা (masula) নৌকো, ডিঙি, নানকো আর তুতিকোরিন নৌকো।

ক্যাটাম্যারান হল আদিম এক ধরনের ভেলা, কয়েকটা গুঁড়ি বেঁকিয়ে ডিঙির আকারে বাঁধা। শঙ্কুর মতো গড়নের একটা গলুই জলের উপরে জেগে থাকে, ওখানেই হাল লাগানো থাকে। চার রকমের ক্যাটাম্যারান আছে: (1) করমণ্ডলের ক্যাটাম্যারান— এটাই বোধ হয় তামিলনাড়ুর আদি ক্যাটাম্যারান। 3-5টি গুঁড়ি বেঁধে তৈরি। এরই একটা প্রকারভেদ আছে, 7 গুঁড়ির, নাম কোলামরম, নাগপত্তনমের আশেপাশে উড়ুক্কু মাছ ধরতে ব্যবহৃত হয়। (2) ওড়িশা-গঞ্জামের ক্যাটাম্যারান—দু গুঁড়িতে তৈরি, গুঁড়িগুলো দড়ি দিয়ে না বেঁধে কাঠের

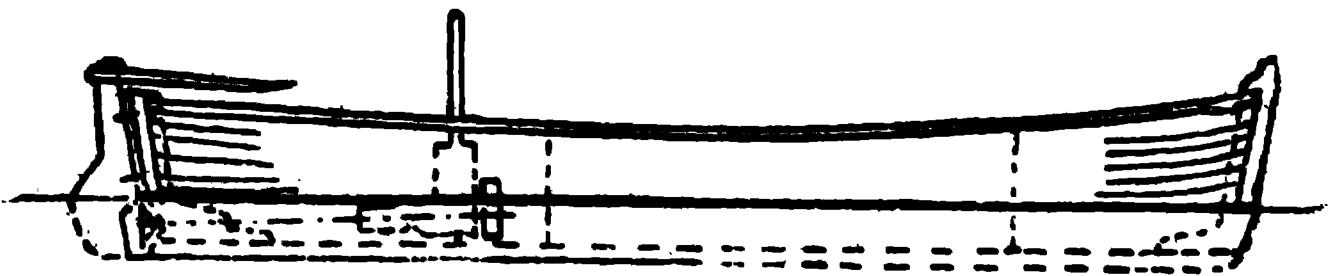
গোঁজ দিয়ে আঁটা এবং তক্তাগুলো এমনভাবে কাটা যাতে ক্যাটাম্যারানের আকার হয় নৌকোর মতো। (3) অন্ধ্রের ক্যাটাম্যারান—ওড়িশারটারই রকমফের, শুধু আরেকটু বড় (5-7 মিটার লম্বা), তক্তাগুলোও বেশি ভারী। দু পাশে লাগানো হয় মজবুত গুঁড়ি। (4) নৌকো-ক্যাটাম্যারান— 3 গুঁড়িতে তৈরি, গুঁড়িগুলো এমনভাবে কাটা ও লাগানো যে ক্যাটাম্যারানটা পুরোপুরি একটা নৌকোর চেহারা নিয়েছে। মণ্ডপম ও মুক্কুর অঞ্চলের আশেপাশে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র 21: অন্ধ্র উপকূলের একটি পাদাভা নৌকো

মাসুলা নৌকো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় করমণ্ডল উপকূলে। লম্বায় 9 মিটার বা তার কম। নারকেলের ছোবড়ার দড়ি দিয়ে তক্তাগুলো বাঁধা, সাধারণত কোনও কাঠামো বা খাঁচা থাকে না। এরও নানা রকমফের আছে। ওড়িশায় একে বলে 'বার' নৌকো, অন্ধ্রে 'পাদাভা' বা 'পদগুম'। খাঁচাওয়ালা আরেক জাত ব্যবহৃত হয় কাকিনাড়া আর মাসুলিপতনমের মাঝখানের উপকূল এলাকায়।

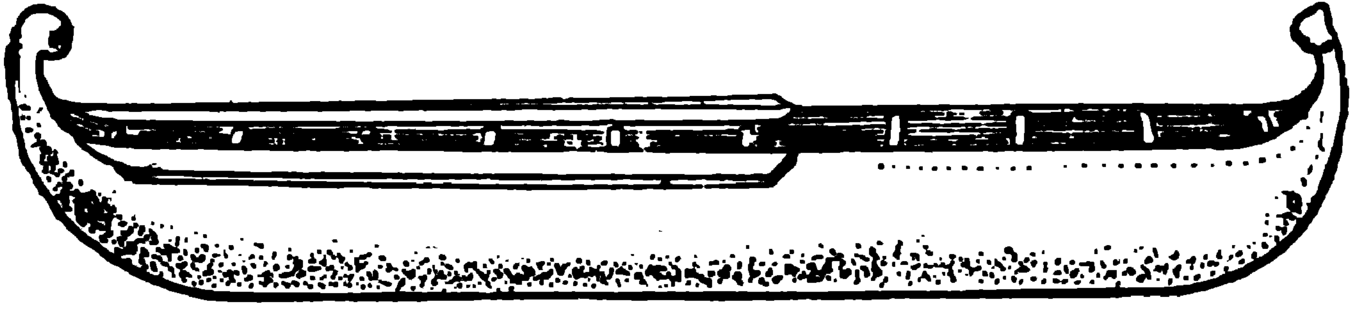
ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গের 'নৌকো' আর 'ডিঙি' গুঁড়ি-কুঁদে তৈরি। নৌকোগুলো সুগঠিত ও বড়— 13 মি X 3 মি X 2 মি।



চিত্র 22: তুতিকোরিন জাতের মাছ ধরা নৌকো (তামিলনাড়ু)

তুতিকোরিন নৌকোও গুঁড়ি কুঁদে বানানো, 11 মি x 2 মি x 1 মি, দেশের ভিতরের নদীতে চলাফেরা করতে পারে। মাছ ধরার চেয়ে বরং ঘাঁটিনৌকো আর মালবাহী নৌকো হিসাবেই বেশি ব্যবহৃত হয়।

পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রের চরিত্র আলাদা, তাই সেখানে গড়ে উঠেছে ভিন্ন ধরনের নৌকো। গুঁড়ি-কুঁদে-বানানো শালতি, তক্তা লাগানো শালতি, পাল-খাটানো শালতি এবং পুরোদস্তুর নৌকোর উল্লেখ করা যেতে পারে।

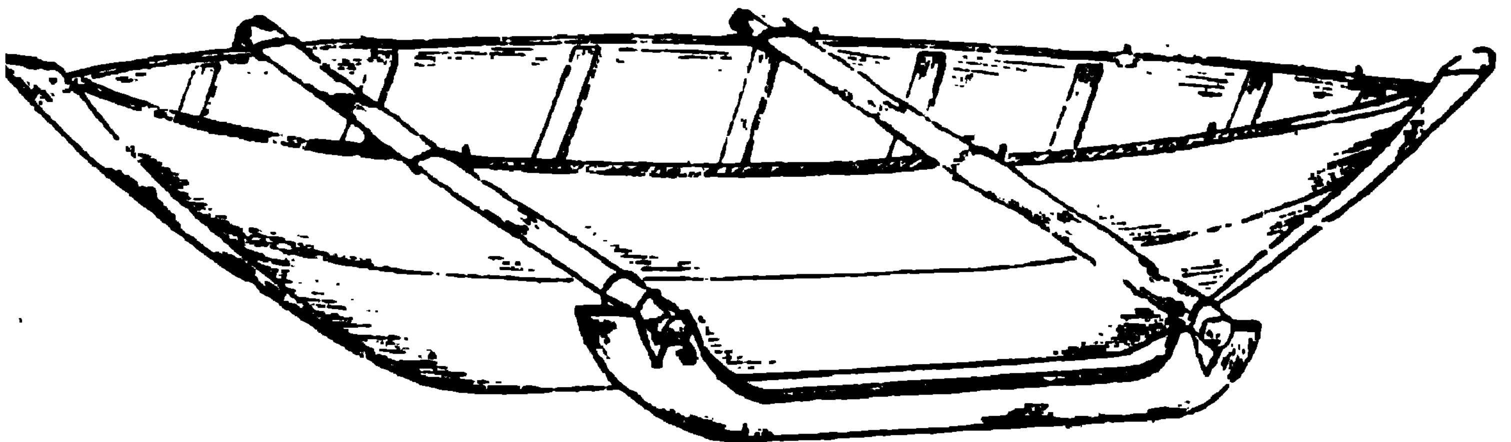


চিত্র 23: 'ওডাম'—মালাবারের একটি গুঁড়ি-কুঁদে-তৈরি শালতি

গুঁড়ি-কোঁদা শালতি তৈরি হয় বড় গাছের গুঁড়ির মাঝখানটা কুঁদে, এর তলাটা দুপাশের চেয়ে মোটা। কেরালা আর কোঙ্কন উপকূলে এগুলো খুব জনপ্রিয়। বড়গুলোর নাম 'ভাঁচি' বা 'ওডাম', লম্বায় 10-22 মি, অনেক রকম জাল ফেলা যায় এগুলো থেকে। ছোটগুলোর নাম 'থোনি', এগুলো টানা জাল বা বেড়াজালের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। পশ্চিম উপকূলের কোলাচল থেকে কাথিয়াওয়াড়ের মধ্যেও গুঁড়ি-কোঁদা শালতি দেখা যায়।

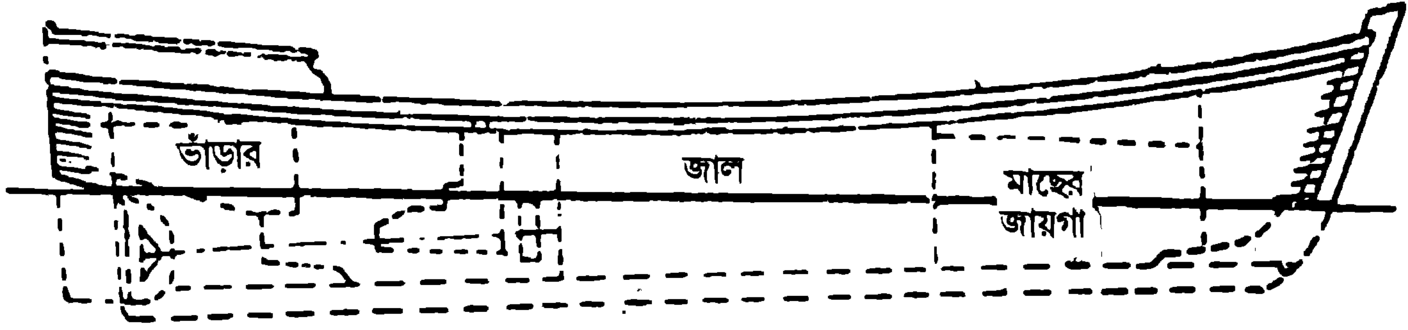
তক্তা লাগানো শালতিও গুঁড়ি কুঁদে তৈরি, দু পাশে তারপর তক্তা লাগানো হয়। কেরালায় এগুলো খুব দেখা যায়, টানাজাল ফেলতে ব্যবহৃত হয়। কাথিয়াওয়াড় এবং উত্তর বোম্বাইতেও এগুলো জনপ্রিয়।

কানাড়া আর কোঙ্কন উপকূলের পাল-খাটানো শালতির পাশের দিকে একটাই কাঠামো থাকে; এদের স্থানীয় নাম 'রাম্পানি', কারণ ম্যাকেরেল ধরার জন্য রাম্পানি জাল ফেলতে এদের ব্যবহার করা হয়। এগুলো রীতিমতো গড়ে-পিটে বানানো নৌকো, তক্তাগুলোও



চিত্র 24: কারওয়ারের রাম্পানি নৌকো

অনেক বেশি ছড়িয়ে বসানো। সাইজ সাধারণত 15 মি X 3 মি, তবে আরও ছোট শালতিও ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে ভাটকাল আর মাজালির মাঝে।



চিত্র 25: সৌরাষ্ট্রের মাছ-ধরা নৌকো মাচওয়া

মাছ ধরার দেশীয় যানগুলির মধ্যে তক্তা জুড়ে বানানো নৌকোই হল সবচেয়ে উন্নত পর্যায়। পশ্চিম উপকূলে, রত্নগিরির উত্তরে এবং বোম্বাই-ক্যাম্বে উপকূল বরাবর এরা চলে। স্থানভেদে সামান্য তফাত হয়। চওড়া কাঠামো, চোখা গলুই আর সোজা তলিওয়ালা 'মাচওয়া' বাসেইন-এ খুবই জনপ্রিয়। 'সৎপতি' বা 'গলবতি'-র গলুই মাঝারি রকম চোখা, প্রস্থ বড়, তলি সোজা এবং কানা উঁচু। যন্ত্রচালনার জন্য 'সৎপতি' একেবারে আদর্শ নৌকো, কারণ এর দেশি গড়নে কোনও পরিবর্তন ছাড়াই এতে মোটর লাগিয়ে নেওয়া যায়।

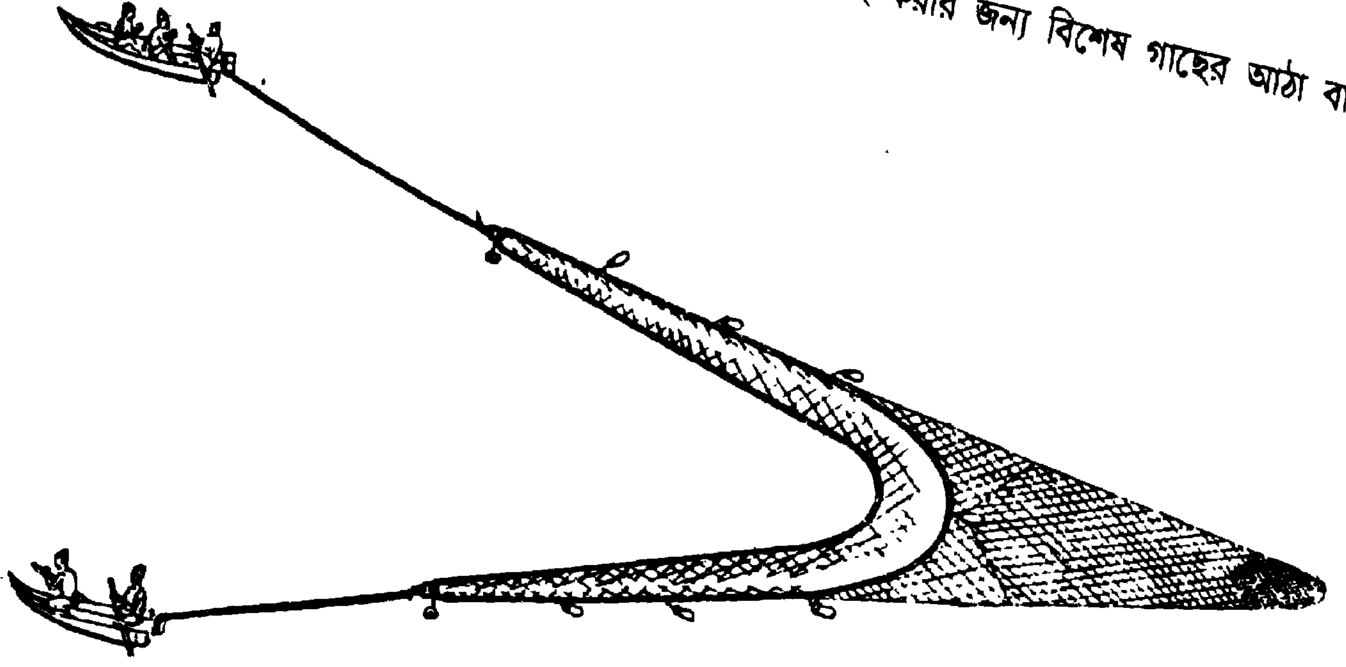
মৎস্য শিকারের সরঞ্জাম

সমুদ্রে মাছ ধরতে সরঞ্জাম লাগে প্রধানত নানা আকার ও গড়নের জাল। এ ছাড়া দূর-সমুদ্রের বড় মাছ ধরতে লাগে সুতো আর বঁড়শি। জালের প্রধান প্রকারগুলি হল: খাটানো জাল, ঝোলা জাল, টানা জাল, বেড়াজাল, ভাসা জাল ও ফেকা জাল।

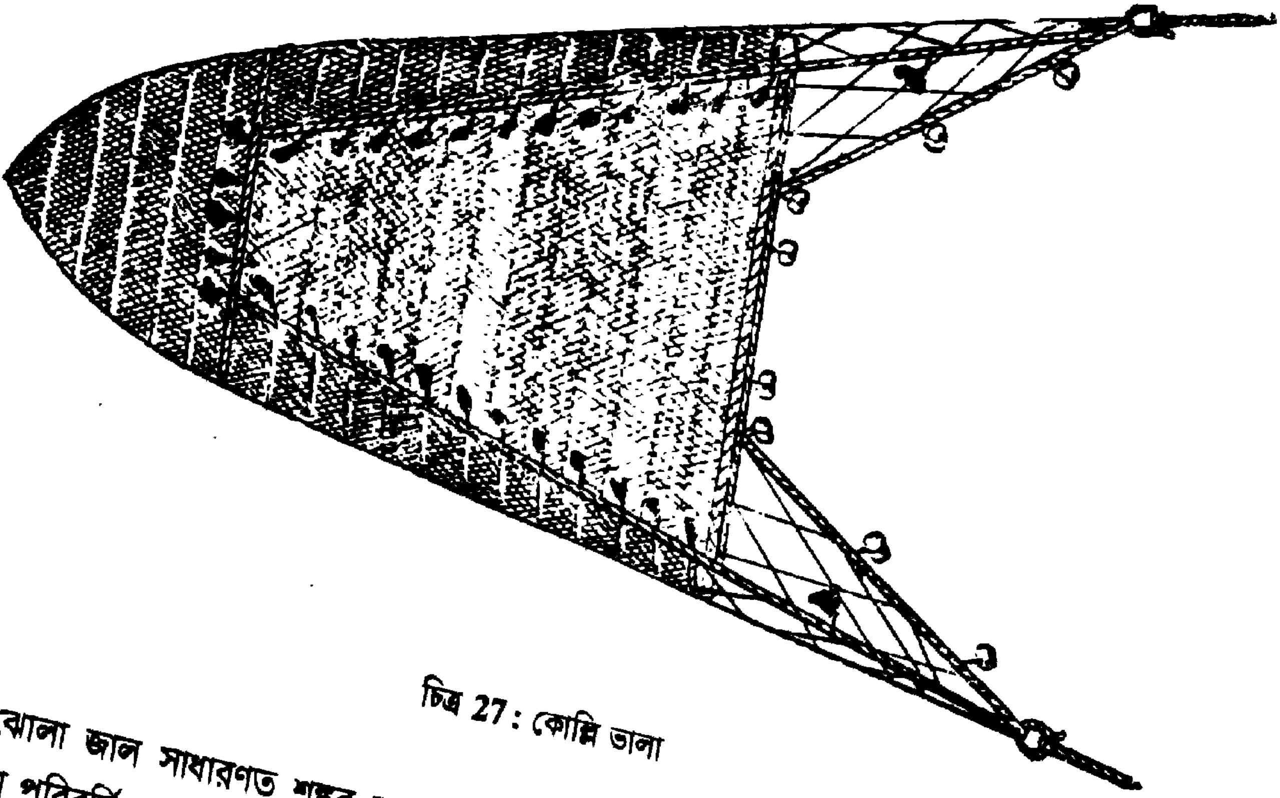
পূর্ব তীরের পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু করে দাক্ষিণাত্য হয়ে কর্নাটক, গুজরাত ও কাথিয়াওয়াড় পর্যন্ত সারা উপকূল জুড়ে খাটানো জাল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। নাম থেকেই বোঝা যাবে, এই জাল খাটানো হয় ভাঁটার সময় পাড়ের ভিতর ঢুকে-পড়া জলে। জালটাকে জায়গায় রাখবার জন্য কাঠের খুঁটি ও বয়া লাগানো থাকে। জাল সাধারণ চারকোনা বা শঙ্কুর আকারের হয়, সাইজ নানা রকম হতে পারে। জোয়ারের সময় মাছ জালের মধ্যে ঢোকে, ভাঁটার সময় জল সরে গেলে আটকা পড়ে। এক-এক রাজ্যে এ জালের এক-এক নাম, এক-এক রকম গড়ন।

পশ্চিমবঙ্গ আর ওড়িশায় শঙ্কুর আকারের খাটানো জালকে বলে 'পাঁচ', 'কাঠিয়াকুল জাল', 'পাঁচকাঠিয়া-বেড়জাল' এবং 'বেহুন্দি' বা 'ঘূর্ণি জাল'। চারকোনা খাটানো জালের নাম পশ্চিমবঙ্গে 'বাইদ' বা 'মাল জাল', উত্তর ওড়িশায় 'ব্রেন্দা জাল', তাঞ্জোরে 'কালাভালাই', মান্নার উপসাগর ও পক প্রণালীতে 'কালামকুট্টি ভালাই'; কানাড়া উপকূলে এর নাম 'কোণ্ডা ভালা', 'থোরকু ভালা', 'ওয়াঘল ভালা', 'বাংলা জাল', 'পাট্টা বালা', 'জাদি', বা 'ইন্তাগ জাল'; গুজরাত ও কাথিয়াওয়াড় উপকূলে 'জাদি' বা 'নিতা জাল'। এইসব জাল প্রধানত জেলেরা নিজেরাই নিজেদের ঘরে বানায়। ছোটগুলো সুতোয় তৈরি,

বড়গুলো শণ বা অন্য শক্ত কিছু পাকিয়ে। টেকসই করার জন্য বিশেষ গাছের আঠা বা আলকাতরা মাখানো হয়।



চিত্র 26 : থুরি ভালা



চিত্র 27 : কোল্লি ভালা

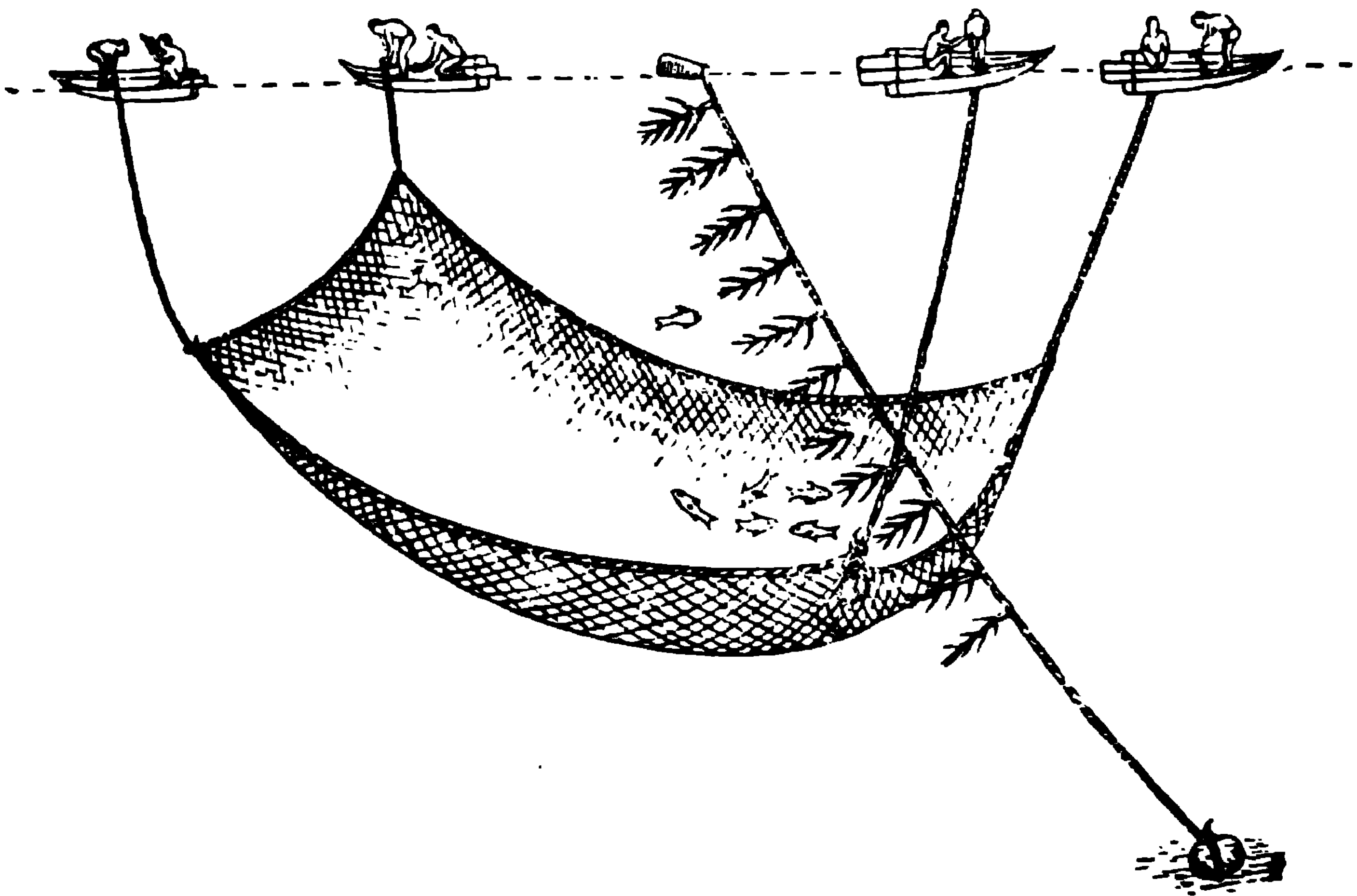
ঝোলা জাল সাধারণত শঙ্কুর আকারের, তার দু পাশে কোনও হাতা থাকে না। এরই একটা পরিবর্তিত রূপও প্রচলিত, তার দু পাশে থাকে দুটো লম্বা ও ক্রমশ-সরু হাতা। অন্ধ্র উপকূলের 'ইরাগা ভালাই', তামিলনাড়ুর 'থুরি-ভালা' ও কেরালার 'কোল্লি ভালা' এই শেষোক্ত জাতের। এইসব জাল ফেলা হয় দুটি নৌকো বা ক্যাটম্যারান থেকে। কেরালার

'মাতি-কোল্লি-ভালা' হল অয়েল সার্ডিন ধরার বিশেষ জাল। কেরালার আরেক রকম জাল হল 'পাইতু ভালা'— এটা নৌকো থেকে ফেলা বড় টানা জাল।

বোম্বাই আর গুজরাত উপকূলে 'ডোল' নামে একটি অতি মজাদার ঝোলা জাল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এ জালের আকার শঙ্কুর মতো, মুখ চওড়া। মুখটা বাঁশ বা কাঠের খুঁটি দিয়ে আটকানো, আগাটা লাগানো থাকে একটা নৌকোয়। যেখানে স্রোত খুব জোরালো, ফলে জাল সোজা হয়ে ফেঁপে থাকে ও তাই তাতে মাছ আটকা পড়তে পারে, সেখানেই এ জাল ব্যবহার করা যায়।

বেড়াজাল

এই জালের সবচেয়ে সাধারণ দৃষ্টান্তগুলি হল ওড়িশার 'বেড়জাল', অন্ধ্র উপকূলের 'পেড্ডা' বা 'আলিভি-ভালা', করমণ্ডল উপকূলের 'পেরিয়া ভালা' বা 'মাদা ভালাই' এবং মান্নার উপসাগরের 'কারা ভালাই'। এটি মূলত শঙ্কুর আকারের দুই হাতা-ওয়ালা একটি ঝোলা। কোঙ্কন ও মালাবার উপকূলে ম্যাকেরেল ধরার জন্য যে 'রাম্পানি' ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় সেটাই ভারতের সবচেয়ে বড় বেড়াজাল। জালের একটা দিক পাড়ে শক্ত খুঁটিতে বাঁধা থাকে। অন্য দিকটাকে একটা নৌকোয় করে সমুদ্রে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা অর্ধবৃত্তকার পথে ঘুরে আবার পাড়ে ফিরিয়ে আনা হয়। জাল মাছে বোঝাই হয়ে গেলে দু দল লোক তার দু দিক ধরে পাড়ে টেনে আনে।



চিত্র 28: 'মাদা ভালাই'—করমণ্ডল উপকূলের ঝোলা জাল (হর্নেলের অনুসরণে)

ভাসা জালের আকার দেওয়ালের মতো, তার সাইজ নানা রকমের হয়, খোপগুলিও নানা মাপের হতে পারে। এগুলো শণ পাকিয়ে তৈরি, খাড়া ও সোজা রাখার জন্য এগুলোতে ভারী ওজন ও বয়া লাগানো থাকে।

ফেকা জাল হল একজনের ছোট, জনপ্রিয় জাল। সাধারণত একটা রশি লাগানো থাকে। হাত ঘুরিয়ে এ জাল ফেলা হয় এবং ছড়িয়ে পড়লে তাতে মাছ আটকায়।

সুতো বা দড়ির আগায় লাগানো বঁড়শি তো মাছ ধরার এক অতি প্রাচীন উপায়। বঁড়শিতে টোপ দেওয়া থাকে। হাঙরের মতো বড় মাছ ধরতে সারি-বঁড়শি লাগে, দড়ি সমুদ্রে নিয়ে যেতে হয় নৌকোয় করে।

অন্তর্দেশীয় মৎস্য শিকারের যান ও সরঞ্জাম

মৎস্য শিকার যান

অন্তর্দেশীয় মৎস্যশিল্পে যে সব যান ব্যবহৃত হয় তাদের দু ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে : (১) ভেলা (২) নৌকো।

ভেলা

ভেলা হল সবচেয়ে আদিম ধরনের নৌকো। নানা স্থানীয় জিনিস দিয়ে ভেলা বানানো হয়। পশ্চিমবঙ্গে এবং তামিলনাড়ুর কোনও কোনও অংশে কলাগাছের কয়েকটা গুঁড়ি বেঁধে একটা ভাসমান মঞ্চ তৈরি করা হয়। বিহারের কোথাও কোথাও গঙ্গায় কিছু হাঁড়ি বেঁধে তার উপর চাপানো হয় বাঁশের একটা হালকা মঞ্চ। এই ধরনের ভেলা তিরুচিরাপল্লি ও তাঞ্জোর জেলায় কাবেরী নদীতেও দেখা যায়।

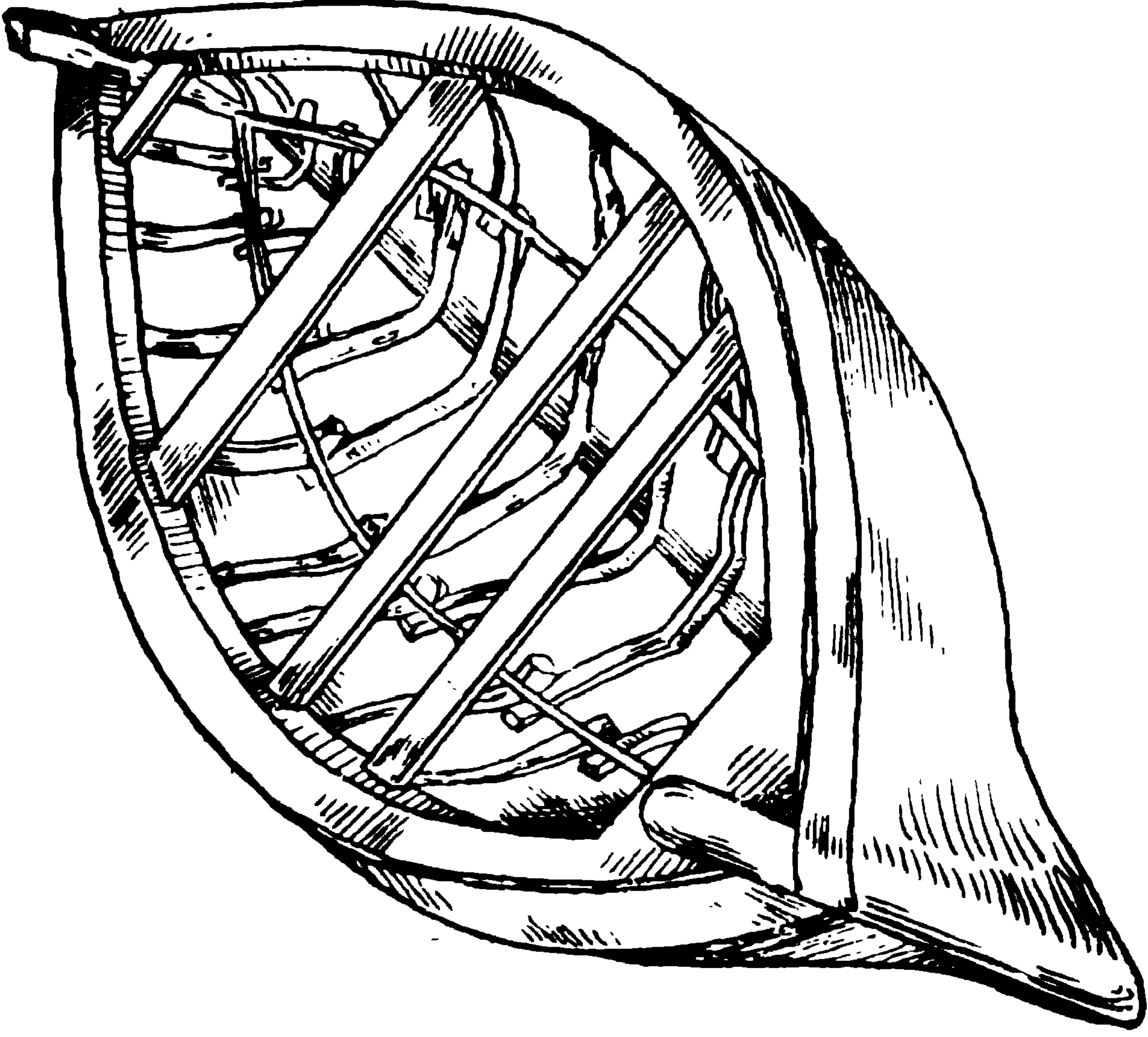
আদিম মানুষ পশুর চামড়া দিয়ে সরল ভেলা তৈরি করত। গঙ্গার উজানের দিকে মোষের চামড়া জুড়ে অমার্জিত এক রকম ভেলা বানানো হয়। কাবেরী ও তুঙ্গভদ্রা নদীতে জেলেরা গরুর চামড়ায় ঢাকা বেতের ভেলা ব্যবহার করে।

পশ্চিমবঙ্গের ডোঙা হল সরল ধরনের শালতি, তালগাছের গুঁড়ি কুঁদে তৈরি। ধানক্ষেত ও নিম্নভূমির অগভীর জলে ব্যবহৃত হয়।

নৌকো

নৌকো তৈরি হয় তক্তা দিয়ে এবং তা নানা রকমের হতে পারে। এগুলো মজবুত যান ; নদী, বড় হ্রদ, আর বিস্তীর্ণ বদ্ধজলের খরস্রোত ও জোয়ারের বেগ সহ্য করতে পারে। একটা সুপরিচিত দৃষ্টান্ত হল পশ্চিমবঙ্গের ডিঙি, যা ফেকা জাল আর খেপলা জালের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। ডিঙির তলি থাকে না ; একহারা আকার, দুই গলুইয়ের দিকে ক্রমশ

সরু হয়ে গেছে। জাল বড় হলে ডিঙিও বড় হতে হয়। আরেকটি হল চাঁদি নৌকো, 18মি লম্বা ও 3 মি চওড়া, এটা ভাসা জাল ফেলতে লাগে।



চিত্র 29: উত্তর ওড়িশার চৌকো

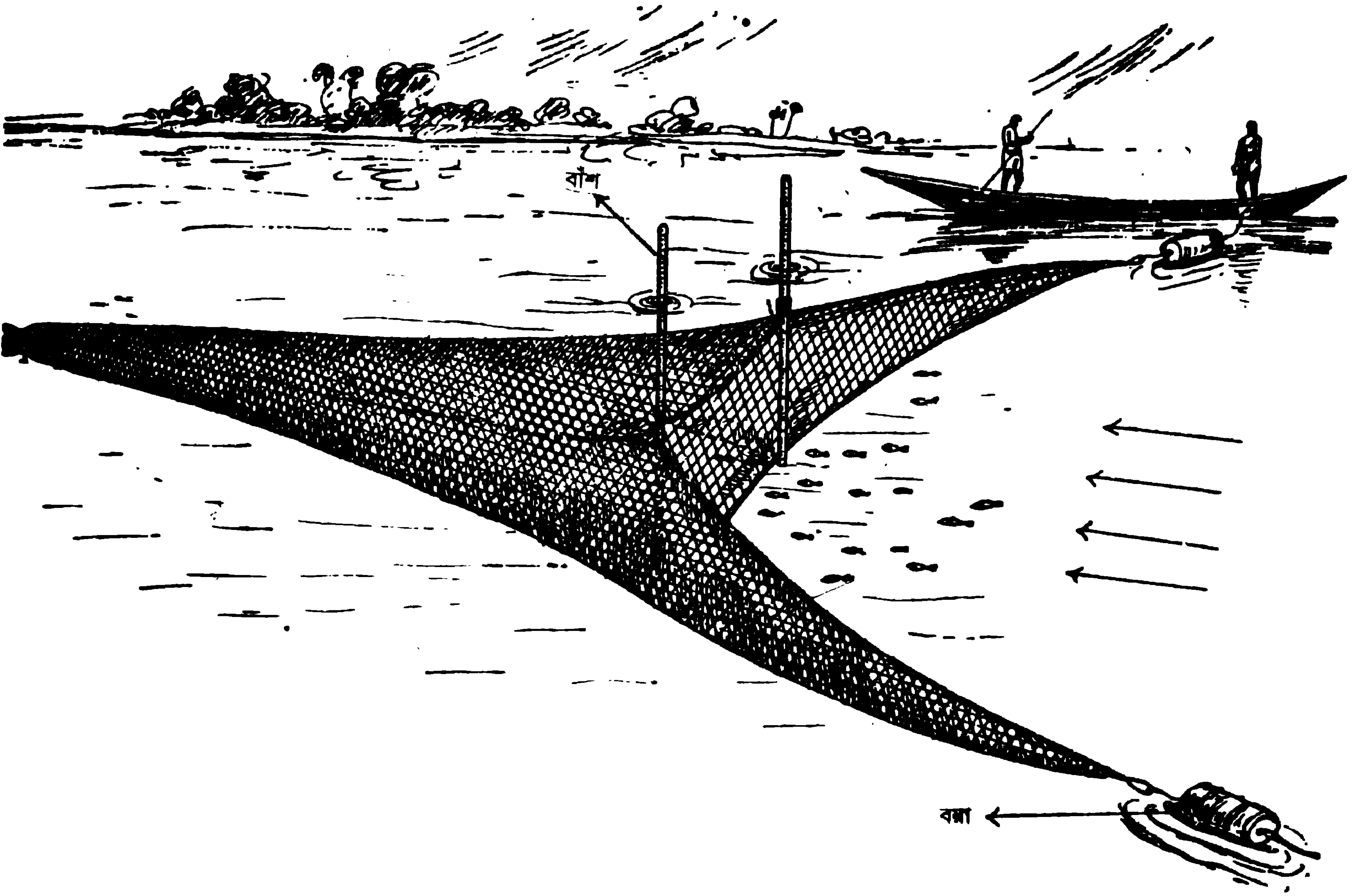
সরঞ্জাম

আমরা আগেই দেখেছি, ভারতের অন্তর্দেশীয় জলসম্পদের বৈচিত্র্য বিপুল, তাই জালের প্রকারও অনেক রকম। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধরনই কেবল এখানে আলোচনা করা হবে।

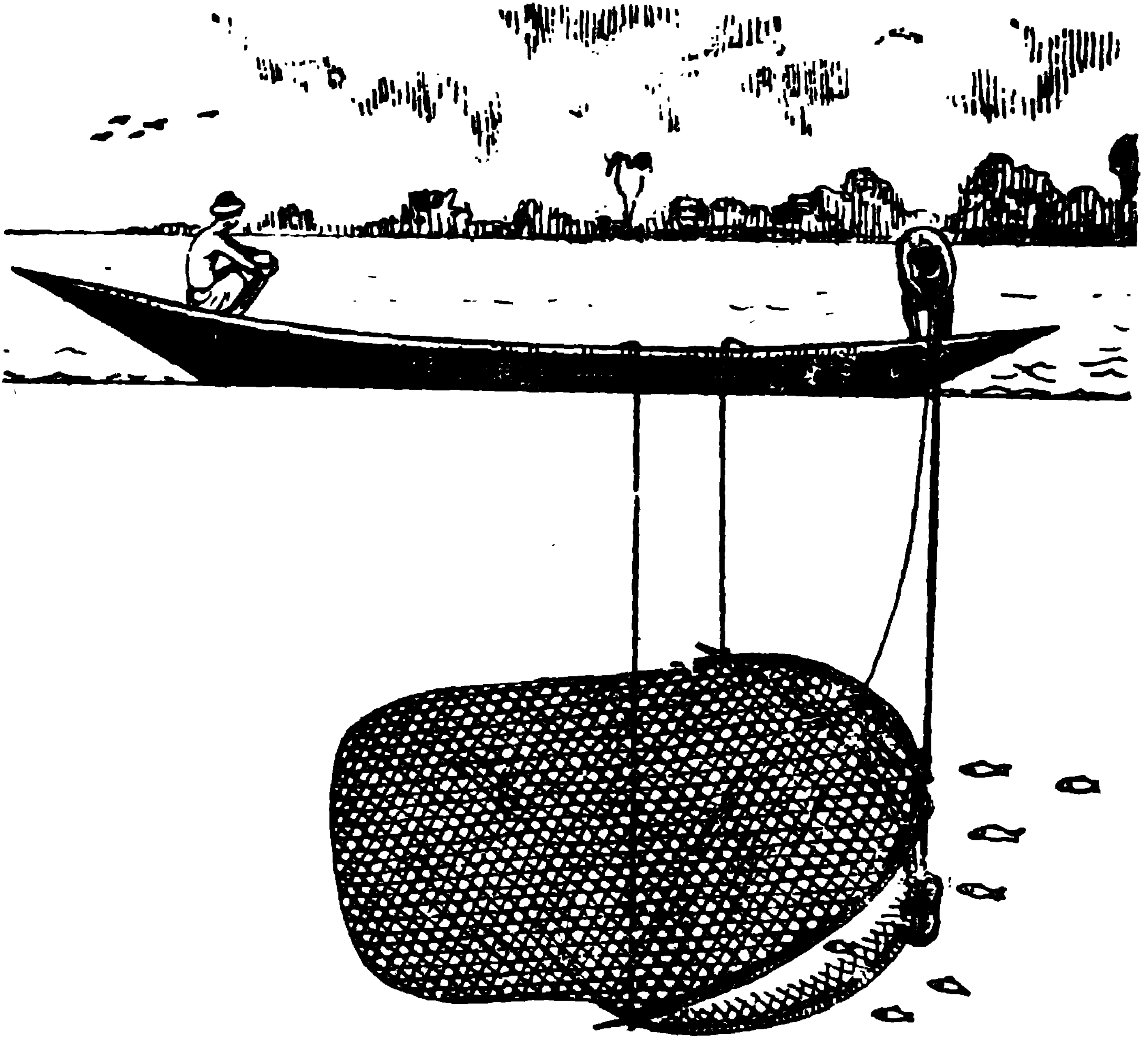
'বিন জাল' এক রকমের ঝোলা জাল, জোয়ারের উল্টো মুখে বসানো হয়। এটা খুঁটি বা বাঁশের লগির সঙ্গে বাঁধা থাকে, দু পাশের হাতায় লাগানো থাকে বয়া। পশ্চিমবঙ্গের নদীর বদ্বীপগুলিতে এ জাল দিয়ে ছোট জাতের মাছ ধরা হয়।

সুন্দরবনের 'খাল পাট্টা জাল', চিল্কা হ্রদের 'জানস' এবং কেরালার উপকূলীয় বদ্ধজলের 'থাত্তুভালা' মোহনায় মাছ ধরতে খুব কার্যকরী। কায়দা হল: প্রথমে উপহ্রদের এক-একটা অংশ প্রথমে বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘিরে ফেলে মাছগুলোকে ঘেরাওয়ের মধ্যে নিয়ে আসতে হয়, তারপর সে মাছ ধরা হয় ফেকা জাল বা খেপলা জাল দিয়ে অথবা ভাঁটার সময় জল বের করে দিয়ে।

মোহনায় উজানের দিকে 'শাংলো জাল' নামে এক রকম ফাঁস জাল ব্যবহার করা হয় শালতি থেকে।



চিত্র 30: বিন জাল

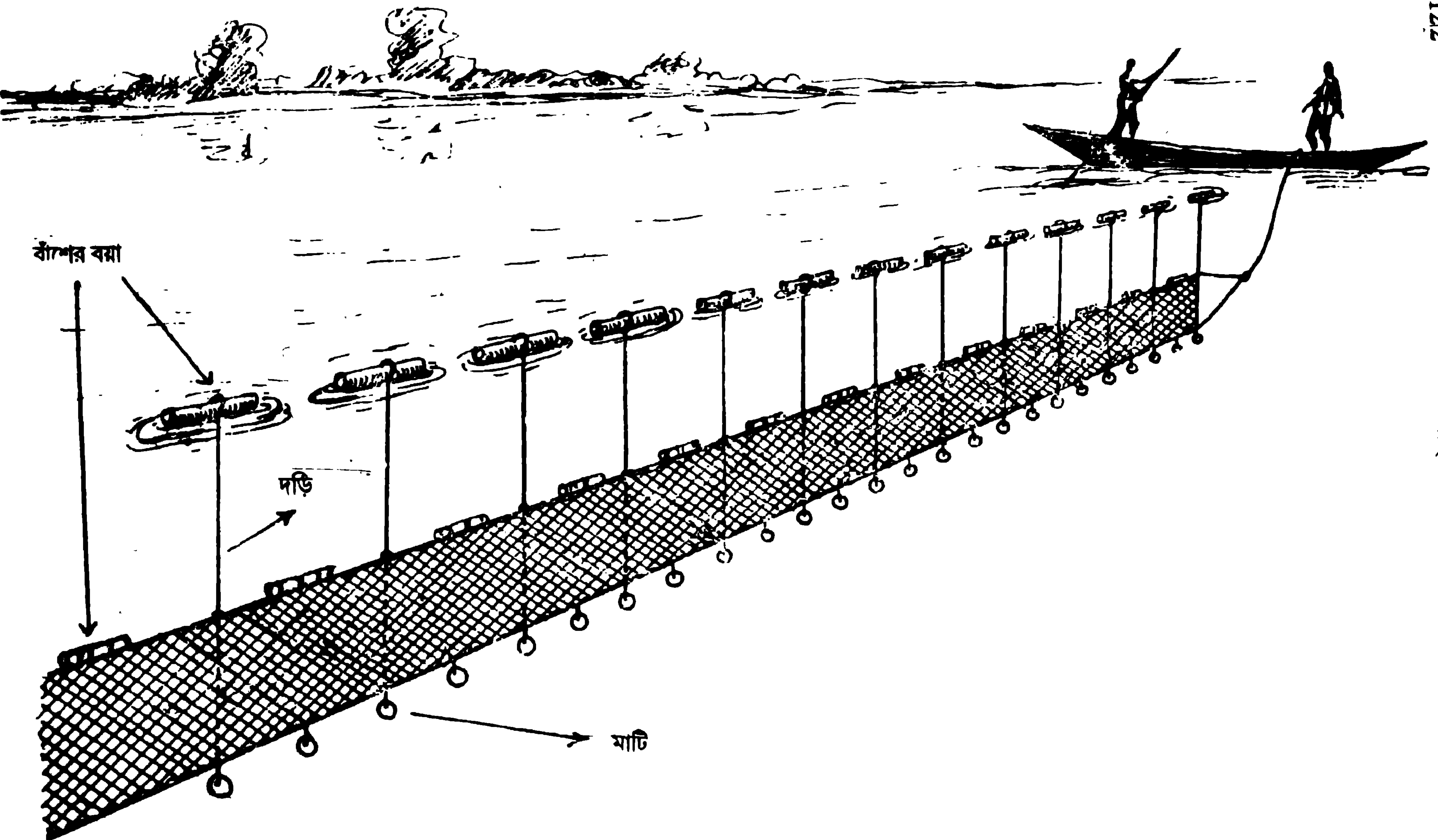


চিত্র 31 : শাংলো জাল

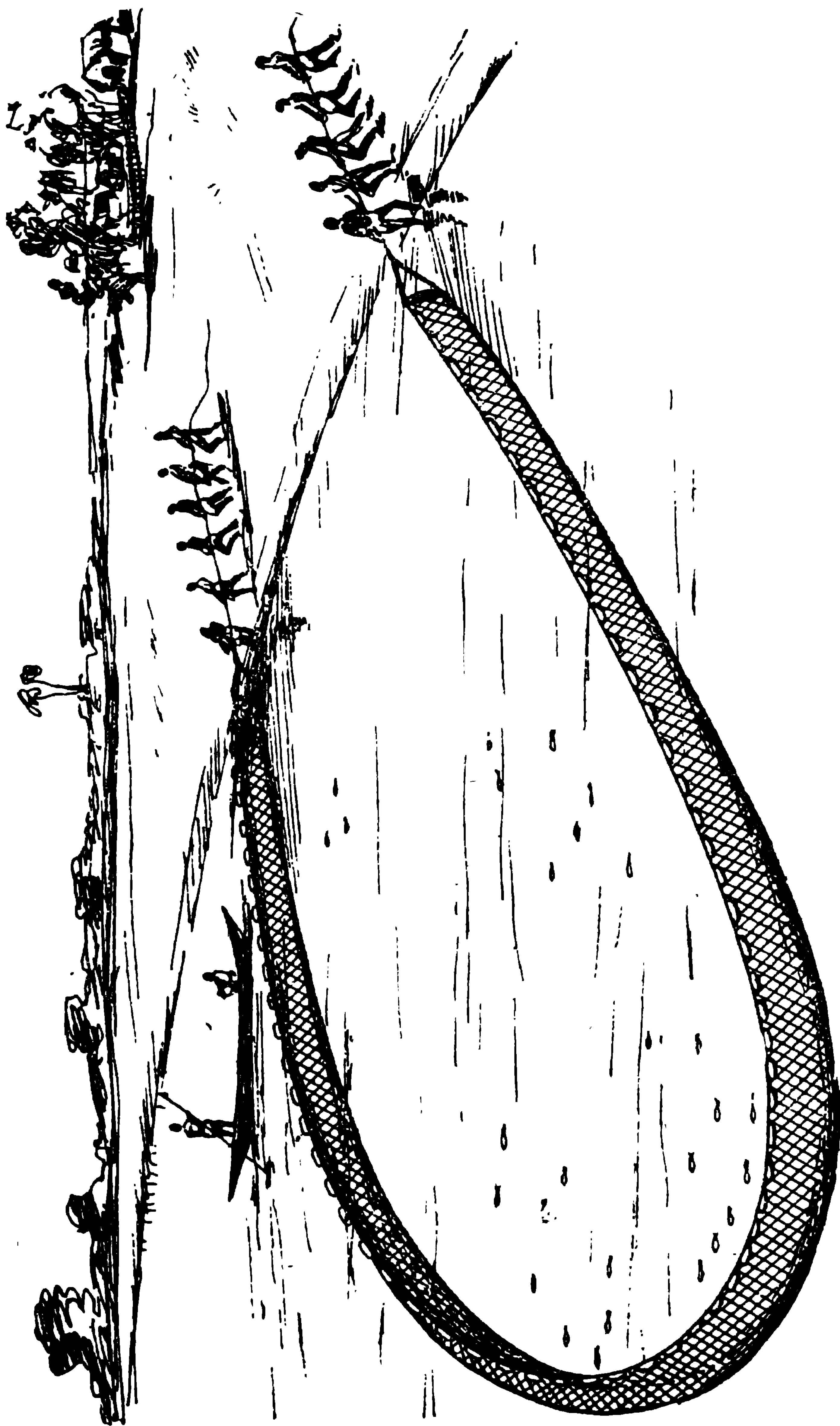
'ছাঁদি জাল' হল পশ্চিমবঙ্গের মোহনায় প্রচলিত এক রকম ভাসা জাল, ইলিশ ধরতে খুব কার্যকর। এক-একটা জাল 305 মি লম্বা, 3 মি চওড়া, খোপগুলো 7.5-10.2 সেমি।

গাঙ্গেয় এলাকার বিশাল 'বেড় জাল' বা 'বেড়া জাল' নৌকো থেকে কিংবা জলে নেমে ব্যবহার করা হয়।

'করাল' বা 'কাতলা জাল' মোটা সুতোয় তৈরি এক রকমের ভাসা জাল, খোপগুলো 13.7-15.2 সেমি। গোটা বারো বাঁশের বয়া দড়ি দিয়ে ঝোলানো থাকে, জাল ফেলা ও টানা হয় শালতি থেকে।



চিত্র 32: ছাঁদি জাল (মাটি, রশি)



চিত্র 33: বেড় জাল

যন্ত্রচালিত যান

উপরের বিবরণ থেকে বোঝা গেল, ভারতের জেলেরা শত শত বৎসর আগেকার যান এবং সরঞ্জামই ব্যবহার করে চলেছে। আধুনিক নৌকো আর জাল ব্যবহারের প্রথম চেষ্টা হয় এই শতকের গোড়ার দিকে, যখন বঙ্গোপসাগরে অনুসন্ধানে নামে 'ইনভেস্টিগেটর' জাহাজ। নরওয়ে, সুইডেন, গ্রেট ব্রিটেন ও সোভিয়েত রাশিয়ার মতো ইউরোপীয় দেশ এবং জাপান ও ফিলিপাইনের মতো প্রাচ্যদেশগুলি যখন পালতোলা জাহাজের জায়গায় মোটরবোট প্রবর্তন করে তাদের মৎস্যশিল্পকে আধুনিক করে তুলছে, ভারত তখনও তার আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই চমকপ্রদ কোনও নতুন পরিকল্পনায় হাত লাগাতে পারেনি। কেবল 1950-র কাছাকাছি এসে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও বেসরকারি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করল যন্ত্রায়ণ নিয়ে—অর্থাৎ যন্ত্রচালিত নৌকো এবং সরঞ্জাম নিয়ে।

যে সব প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই ওঠে সেগুলি হল : তা কি বাণিজ্যিক দিক দিয়ে সুবিধাজনক? দীর্ঘ মেয়াদে তা কি অর্থসাশ্রয়ী? ভারতের কি প্রয়োজনীয় লোকবল ও সম্পদ আছে? তার কি যন্ত্রচালিত মৎস্যশিল্পের আনুষঙ্গিক শর্তগুলি আছে—যেমন আধুনিক ঘাট ও পোতাশ্রয়, প্রচুর মাছ সংরক্ষণের জন্য হিমায়নের ব্যবস্থা এবং লরি ও ট্রেনের মতো দ্রুতগামী যান?

নতুন মোটরবোট বানিয়ে অসংখ্য দেশি নৌকো হঠিয়ে দেওয়া কোনও উন্নয়নশীল জাতির পক্ষে অর্থসাশ্রয়ী পথ নয়। তার বদলে চালু নৌকোগুলোতে মোটর লাগিয়ে সেগুলোকেই যন্ত্রচালিত করার চেষ্টা প্রথম করা হল। এ দিক থেকে, দেখা গেল, সৌরাষ্ট্রের 'মাচওয়া', কচ্ছের 'ধরও', 'সৎপতি', 'তুতিকোরিন' নৌকো এবং অন্ধ্রের 'নাওয়া' খুবই উপযোগী। বোম্বাইতে শ ছয়েক মোটরবোট আছে। অন্ধ্রে এক নতুন ধরনের যন্ত্রচালিত নৌকো উদ্ভাবিত হয়েছে, নাম 'নাওয়া'। পশ্চিমবঙ্গ পুরোদস্তুর মোটরবোট আমদানি করে নিয়েছে বিদেশ থেকে।

যন্ত্রচালিত মৎস্য শিকারের প্রসারের স্বার্থে ভারত সরকার সম্প্রতি দেশের নানা জাহাজ-কারখানায় 40টা ট্রলার বানানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে 20টা দেওয়া হবে বিভিন্ন উপকূলবর্তী রাজ্যকে, বাকি 20টা কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবহার করবে তার নিজস্ব নানা কাজে।

ওয়েস্ট কোস্ট কর্পোরেশন অব শিপবিল্ডার্স অব বম্বের তৈরি প্রথম ট্রলারটি এখন কাজ করছে। এটা 17.5 মি লম্বা, কির্লোস্কারের সামুদ্রিক ডিজেল ইঞ্জিন লাগানো। এতে আছে ফিশফাইন্ডার বা মৎস্য-সন্ধানী, অ্যাজডিক (asdic) বা শব্দতরঙ্গ প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র, রেডিও টেলিফোন, রেডার ও অন্যান্য সমুদ্রতাত্ত্বিক সরঞ্জাম ছাড়াও মাছের হিমায়ন ও সংরক্ষণের সকল ব্যবস্থা।

দেশীয় মালমশলা দিয়ে আধুনিক ট্রলার নির্মাণের পাশাপাশি মাছ ধরার নতুন নতুন এলাকা চিহ্নিত করতে হবে, মাছ ধরার সঠিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। নতুন যান ও সরঞ্জামের ব্যবহারে শিক্ষিত করে তুলতে হবে কর্মীদের।

মৎস্যশিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলি বর্তমানে হল বোম্বাই, কোচিন, তুতিকোরিন ও বিশাখাপতনম। আরও মাছ ধরার বন্দর গড়ে তোলার প্রস্তাব আছে কান্ডলা, গোয়া, মাদ্রাজ, পারাদীপ ও পোর্ট ব্লেয়ারে। ট্রলারের অভাবে ভেরাভাল ও ম্যাঙ্গালোর পরিত্যক্ত হয়েছিল, সেগুলো ফের চালু করা হবে।

অটার ট্রল (Otter trawl) ও বিম (Beam) ট্রলের মতো পুরোনো ধাঁচের জালের জায়গায় আসবে অন্যান্য দেশে গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ও অধিকতর কার্যকরী ফাঁস-বেড়াজাল।

অতএব দেখা যাচ্ছে যন্ত্রচালিত মৎস্যশিল্পে ভারত এখনও রয়েছে পরীক্ষানিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের স্তরে। আশা করা যায়, পুরো পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে বছরে আরো 25,000 টন মাছ পাওয়া যাবে, যা প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবার জোগাবে দেশের লোকের জন্য কিংবা রপ্তানি হবে বিদেশে।

এগারো

সংরক্ষণ ও অন্যান্য প্রক্রিয়া

প্রতিটি গৃহিণী জানেন যে মাছ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় এবং তা টাটকা খেতেই সবচেয়ে ভাল। ভারতে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ুতে সমস্যাটা আরও প্রকট, কারণ তাপ ও আর্দ্রতা নষ্ট হওয়ার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। মাছ ধরে ডাঙায় তোলার পর তাতে তিন রকম পরিবর্তন ঘটতে পারে— জীবাণুঘটিত, এনজাইম-ঘটিত ও জারণ ঘটিত (oxidative)। জল-হাওয়ার জীবাণু মাংসকে আক্রমণ করে, প্রথমে আস্তে আস্তে ও পরে তাড়াতাড়ি। রাসায়নিক পরিবর্তনে প্রোটিন ও অন্যান্য নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন সালফেট ও ইন্ডল-এর মতো পদার্থ তৈরি হয়। সমুদ্রের পূর্ণাস্থি মাছে সাধারণত অল্প ট্রাইমিথিলামিন অক্সাইড (trimethylamine oxide) থাকে, এটা ট্রাইমিথিলামিন নামে ক্ষারীয় (basic) যৌগে বিজারিত (reduced) হয় ও তা থেকেই বাসী বা পচা মাছের সেই বিশিষ্ট দুর্গন্ধটা বেরোয়।

মাছ অত্যন্ত পচনশীল বলেই তা সংরক্ষণের নানা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। সংরক্ষণের আগে মাছের শরীর থেকে লালা, রক্তের দাগ, কাদা আর বালি পরিষ্কার জলে ধুয়ে ফেলা হয়। বড় মাছের পেট চিরে ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ফেলে দিয়ে পেটটা ধুয়ে নেওয়া হয়।

সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো হল: শুকোনো, নুনে জারানো, ধোঁয়া-লাগানো, কৌটোবন্দি করা এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক কেতায় বরফে বা বৈদ্যুতিক রেফ্রিজারেটরে জমিয়ে ফেলা।

শুকোনো

শুকোনোর উদ্দেশ্য হল মাংস থেকে আর্দ্রতা দূর করা। এতে জীবাণুঘটিত ও এনজাইম-ঘটিত পচন ব্যাহত হয়। সবচেয়ে প্রাচীন প্রণালী হল রোদে শুকোনো। ভারতে মোট যত সামুদ্রিক মাছ ধরা হয় তার 35%-এরও বেশি রোদে শুকোনো হয়।

রিবন ফিশ, সিলভারবেলি ও বম্বে ডাক-এর মতো ছোট ছোট সামুদ্রিক মাছ সমুদ্রতীরের খোলা বালির উপর বিছিয়ে দেওয়া হয়। কখনও কখনও নারকেলের ছোবড়া বা তালপাতার চাটাই ফেলে তার উপরও মাছ বিছানো হয়ে থাকে। বম্বে ডাক-এর মতো মাছদের অনেক সময় বাঁশ বা কাঠের খুঁটিতে, কিংবা দুই খুঁটিতে দড়ি বেঁধে তা থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। বড় ও মাঝারি আকারের মাছ শুকোনোর আগে সাধারণত তাদের পেট সাফ করে নুন মাখিয়ে নেওয়া হয়।

রোদে শুকোনোটা সংরক্ষণের আদর্শ পন্থা নয়। এর কয়েকটি অসুবিধা আছে। পদ্ধতিটা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। তা ছাড়া পচে-ঝরে বেশ অপচয় হয় এবং শুকোনো মাছে একটা বিদঘুটে

গন্ধ জন্মায়। সাম্প্রতিক ঝোঁক তাই যান্ত্রিকভাবে শুকোনোর দিকে। এই প্রণালীতে উচ্চ মানের শুকোনো মাছ পাওয়া যায় এবং তার স্বাভাবিক স্বাদ ও পুষ্টিগুণ অক্ষুণ্ণ থাকে।

নুনে জারানো

নুনে জারানোর পদ্ধতি ভারতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়—কেবল মাছের জন্য নয়, সব ধরনের সবজি ও ফলের জন্যও। জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করে এবং এনজাইম অকেজো করে দিয়ে নুন সংরক্ষকের কাজ করে। মাছ নোনা করার দুটি কায়দা উদ্ভাবিত হয়েছে ভারতে—শুকনো-নোনা আর ভিজে-নোনা।

শুকনো-নোনা

মাছগুলোকে প্রথমে নুন মাখিয়ে গামলায় বা সিমেন্টের চৌবাচ্চায় বোঝাই করা হয়। মাছগুলো সাজানোর সময় দুই স্তরের মাঝখানে ছড়ানো হয় শুকনো নুন। স্থানীয় রীতি, জলবায়ু এবং মাছের জাত অনুযায়ী নুন ও মাছের অনুপাত 1:3 থেকে 1:8 পর্যন্ত হতে পারে। দেখা গেছে, তেলওয়ালা মাছের নুন বেশি লাগে। 10-20 ঘণ্টা পরে গামলা ও চৌবাচ্চা থেকে মাছগুলোকে তুলে তাদেরই নিজেদের নুন-জলে ধোয়া হয় এবং 2-3 দিন শুকোনো হয় রোদে।

ভিজে-নোনা

এই পদ্ধতি কোঙ্কন উপকূলে বেশি চলে। মাছগুলোকে সাফ করে, কড়া নুনজলে ভর্তি গামলায় ফেলে, জারানো ঠিকমতো শেষ হওয়া অবধি রোজ নাড়াচাড়া করা হয়। গুড়জালি, সিয়ারফিশ আর কালো পমফ্রেটের মতো বড় মাছের নাড়িভুঁড়ি আগে ফেলে দিয়ে পেট পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। গা লম্বালম্বিভাবে চিরেও দেওয়া হয়, যাতে নুন ভিতরে ঢুকতে পারে। 1:3 অনুপাতে নুন দেওয়া হয় পর পর তিন দফায়। প্রথম দিন লম্বালম্বি চিরগুলোয় অর্ধেক নুন রগড়ে দিয়ে মাছগুলোকে দাওয়ায় গাদা করে রাখা হয়। দ্বিতীয় দিন মাছগুলোকে উল্টে-পাল্টে দেওয়া হয়, যাতে তলার মাছগুলো উপরে উঠে আসে; বাকি নুন মাখিয়ে মাছগুলোকে ফের গাদা করা হয়। এইভাবে ফেলে রাখা হয় 7-10 দিন। মাছ থেকে যে নুন-জল চুঁইয়ে বেরোয় তা ফেলে দেওয়া হয়। ভিজে-নোনা মাছ না শুকিয়েই বিক্রি করা হয়। এ মাছ বেশি দিন টেকে না, তিনচার মাসের মধ্যেই তা খেয়ে ফেলা উচিত।

ধোঁয়া-লাগানো

নরওয়ে, সুইডেন ইত্যাদি পাশ্চাত্য দেশের মতো ভারতে কিন্তু ধোঁয়া-লাগানো মাছ তত জনপ্রিয় নয়—এর বিশেষ ধোঁয়াটে গন্ধটা ভারতের মাছ-খাইয়েরা পছন্দ করে না। তবু মাদ্রাজ আর ওড়িশায় বাড়তি মাছের একটা অল্প অংশে ধোঁয়া-লাগানো হয়। এর জন্য সার্ডিন, ম্যাকেরেল, সিয়ারফিশ, পমফ্রেট, জু ফিশ ও ইলিশ উপযোগী মাছ।

নাড়িভুঁড়ি ফেলে মাছগুলোকে প্রথমে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়, তারপর সেগুলোকে

ডুবিয়ে দেওয়া হয় নুন জলে। সেখান থেকে তুলে সেগুলোকে ধোঁয়া-ঘরে লাঠিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ধোঁয়ায় ফিনল-জাতীয় নানা উপাদান থাকার কারণে তার একটা সংরক্ষণ-ক্ষমতা আছে।

কৌটোবন্দি করা

এ প্রক্রিয়ার উদ্ভব ইউরোপে, সেখান থেকে তা এখন অন্য দেশে ছড়িয়েছে। মাছের স্বাভাবিক স্বাদগন্ধ এতে অটুট থাকে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট, গোয়া ও বোম্বাইতে সার্ডিন আর ম্যাকেরেল বেশি পরিমাণে পাওয়া গেলেই কৌটোবন্দি করা হয়। ভারতে এ শিল্প সাফল্য অর্জন করতে পারেনি নানা প্রতিকূল অবস্থার কারণে, যেমন মাছের অনিয়মিত জোগান, কৌটোবন্দি করার সময়ের সংক্ষিপ্ততা, কৌটো তৈরির জন্য টিন বা অন্য ভাল শস্তা কাঁচামালের অভাব।

চাটনি, আচার ইত্যাদি বানানো হয় প্রাচ্যের নিজস্ব কায়দায়।

চাটনি তৈরি হয় ঘরে, প্রধানত মালাবার উপকূলে। মাছগুলোকে টুকরো টুকরো করে নুন মাখিয়ে শুকানো হয়। তারপর সেগুলোকে ভিনিগার, শুকনো লঙ্কা, সরষে, রসুন, হলুদ ও তেঁতুল বাটা দিয়ে মেখে তেলে ডুবিয়ে রাখা হয়।

আচারের জন্য সাধারণত ম্যাকেরেল ও সার্ডিন ব্যবহৃত হয়। নাড়িভুঁড়ি ফেলে দিয়ে এগুলোকে ধুয়ে নুন মাখানো হয়। তারপর তাদের পেটে ঠাসা হয় মালাবারের নিজস্ব 'কোডাক্কা পুলি' (Garcinia cambogia) বা 'দেসর' (Desr) ফলের টক ও সংরক্ষক খোসা-শুকনো। মাছগুলোকে তারপর কাঠের পিপেয় ভরে রাখা হয় আরও নুন ও খোসা-শুকনোসহ। ওই বিশেষ ফল না পাওয়া গেলে তেঁতুলও ব্যবহার করা চলে।

হিমায়ন

হিমায়ন এবং জমিয়ে-ফেলা হল সংরক্ষণের সবচেয়ে আধুনিক কৌশল। এতে পচন ও নষ্ট হওয়া ঠেকানো যায়। জমানো মাছের পুষ্টিগুণ বজায় থাকে বহু দিন, এমনকি হয়তো এক বছর পর্যন্ত। বাজারে কিংবা চালানের উদ্দেশ্যে অল্পমেয়াদি সংরক্ষণের জন্য মাছ বরফ দিয়ে প্যাক করা হয়। দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণের জন্য বড় বৈদ্যুতিক রেফ্রিজারেটর বা ডিপ-ফ্রিজ ক্যাবিনেট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে—যেমন বোম্বাইয়ের স্যাসুন ডকে—ঘরকে-ঘর বৈদ্যুতিক উপায়ে ঠাণ্ডা করে বিপুল পরিমাণ মাছ মাসের পর মাস মজুত করে রাখা হয়। মাছ বেশি দিন টিকিয়ে রাখতে গেলে দ্রুত জমানোর পদ্ধতি গ্রহণীয়। 'ক্যারিয়ার এয়ার-প্লাস্ট' (Carrier air-plast) কায়দায় দ্রুত জমানোর পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় বোম্বাই, ম্যাঙ্গালোর, কালিকট, কোচিন আর ত্রিবান্দ্রমে।

ঠাণ্ডা গুদামে মাছ সংরক্ষণের রীতি ভারতে এখনও খুব ব্যাপক নয়। যে সব বড় বড় শহরে মৎস্যশিল্প খুব উন্নত, শুধু সেখানেই ঠাণ্ডা গুদামের সুবিধা সীমিত পরিমাণে মেলে। ব্যবসায়ীরা এখানে আগের দিন মাছ রেখে পরের দিন বিক্রি করে।

উপাদান ও বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহার

মাছের মাংসে জৈব ও অজৈব দু রকম যৌগই আছে— (১) জল 80% (২) প্রোটিন 15-25% (৩) খনিজ পদার্থ 1-2% (৪) অন্যান্য 1%।

প্রোটিন থাকে পেশিতে, এটাই মানুষের খাদ্যের সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান। মাছের প্রোটিন সহজে হজম হয় এবং ডিমের শ্বেতাংশ, গোমাংস ও দুধের কেসিন (casein)-এর চাইতে শ্রেষ্ঠ। তা মুরগির মাংসের প্রোটিনের সমতুল্য। খনিজ পদার্থ বলতে আছে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, সালফার ও ক্লোরিন— সবই অল্প মাত্রায়। লোহা, ক্যালসিয়াম আর ফসফরাস থাকে সহজলভ্য আকারে, বিশেষত হাড়ে।

মাছের ভিটামিনও উল্লেখযোগ্য। গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিনগুলো হল এ, সি, ডি এবং থায়ামিন, রিবোফ্ল্যাভিন ও নিকোটিনিক অ্যাসিডে গঠিত বি-কমপ্লেক্স। অনেক প্রজাতির যকৃৎ এ ও ডি ভিটামিনে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। মাছের ডিম ও যকৃৎ বি-কমপ্লেক্স ও সি ভিটামিনের খুব ভাল উৎস।

মাছের উপজাত দ্রব্য ও অন্যান্য উপযোগিতা

মানুষের খাদ্য ছাড়াও মাছ থেকে যে সব উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তেল। মাছের তেল দু রকম : (১) যকৃতের তেল (২) দেহের তেল।

যকৃতের তেল

মাছের যকৃৎ তেল গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় কারণ তা হল ভিটামিন এ-র একটি স্বাভাবিক উৎস, কিছু পরিমাণে ভিটামিন ডি এবং সি-রও। কড, হ্যালিবাট, টিউনা, হাঙর ও রে জাতীয় মাছ থেকেই এ তেল সবচেয়ে ভাল পাওয়া যায়। তেল ও ভিটামিনের অনুপাত এক-এক জাতে এক-এক রকম হতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে নরওয়ে আর সুইডেন ছিল এই তেলের ব্যবসায়ে অগ্রণী দেশ। নর্থ সি-তে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়ানো কড আর হ্যালিবাট থেকে প্রচুর তেল বের করে এরা রফতানি করত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর দিনগুলিতে জাহাজ চলাচল বিঘ্নিত হয়ে যকৃৎ-তেলের জোগান বন্ধ হয়ে গেল। ভারত সরকার ও বিজ্ঞানীরা তৎক্ষণাৎ লেগে গেলেন এই তেলের দেশি উৎসের খোঁজে। তারই ফলে জানা গেল, ভারতের হাঙর আর রে-রা এই তেলের মহামূল্যবান উৎস—পরিমাণ ও গুণ দু দিক দিয়েই।

ফ্যাটি অ্যাসিড এস্টারের আকারে ভিটামিন এ থাকে দুটি রূপে—ভিটামিন $এ_১$ ও $এ_২$, দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় 40% সক্রিয়। ভিটামিন ডি-সমৃদ্ধ মাছেদের মধ্যে টিউনা, হ্যালিবাট ও কড উল্লেখযোগ্য। ভিটামিন ডি-র পরিমাণ এ-র পরিমাণের উপর নির্ভরশীল নয়। ভিটামিন ই-ও মাছের যকৃৎ তেলের একটি উপাদান। ভিটামিন এ যথাযথ দৃষ্টিশক্তির জন্য এবং ভিটামিন

ডি সুস্থ হাড়ের জন্য অপরিহার্য। দুটোই শিশুর বৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত ভারতে, যেখানে অপুষ্টি এত ব্যাপক। পশুপাখি পালনেও এই দুই ভিটামিনের মূল্য আছে, পশুপাখির খাবারে মাছের তেল মিশিয়ে দেওয়া যায়।

যকৃৎ থেকে তেল বের করার নানা পদ্ধতি আছে। ধরা মাছ থেকে থোকা-থোকা যকৃৎ বের করে সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো নুন বা মৃদু ফর্মালিনে (অর্থাৎ জল-মেশানো ফর্মালডিহাইডে) সংরক্ষিত করা হয়। আরও আধুনিক পদ্ধতি হল যকৃৎগুলোকে রেফ্রিজারেটরে ঠাণ্ডা করে জমিয়ে রাখা। বাসী বা রুগ্ণ যকৃৎ ব্যবহৃত হয় না, ভেষজ নির্যাসের জন্য ভাল ও সুস্থ বাছাই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তেল নিষ্কাশনেব চারটি সুপরিচিত পদ্ধতি আছে:

1. **ভাপানো**

যকৃৎগুলোকে কিমা করে বড় বড় গামলায় 85-90° C তাপে জ্বাল দেওয়া হয়। সেগুলো গলে গিয়ে তেল ভেসে উঠলে তা উপর থেকে তুলে পাত্রে জমানো হয়। কড ও অয়েল সার্ডিনের মতো যে সব মাছের তেল খুব বেশি তাদের বেলায় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

2. **ভাসানো**

টাটকা যকৃতের থোকাগুলো অ্যাকুয়াসিড (Aquacide–প্যারালডিহাইড ও সোডিয়াম বাইকার্বনেটের মিশ্রণ) নামে এক রাসায়নিক পদার্থে ডুবিয়ে রাখা হয় এবং কয়েক দিনের মধ্যে যকৃতের প্রোটিন রূপান্তরিত হয় একটি তরল-মিশ্রিত মণ্ডে। মণ্ডটা আলাদা করে নিয়ে যাওয়া হয় পরপর কয়েকটি আধারের মধ্য দিয়ে; সেই সব আধারে গরম জল ঢোকানো হয় পাইপে করে। এতে তেল বেরিয়ে উপরে ভেসে ওঠে। পাশ্চাত্যে কড-তেলের শিল্পে এই পদ্ধতি সফল হয়েছে।

3. **ক্ষার-এনজাইম পদ্ধতি**

যকৃত পেষাই করে কস্টিক সোডা (ওজনের 1-2%) বা সোডিয়াম কার্বনেট (ওজনের 2-5%) মিশিয়ে ঘণ্টাখানেক অনবরত নাড়তে হয়। মণ্ডটাকে তারপর একটা দ্রুত-ফেরা সেন্ট্রিফিউগাল যন্ত্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলে তেল আলাদা হয়ে যায়।

4. উপরের পদ্ধতির একটি প্রকারভেদ হল, কিমা-করা যকৃতের সঙ্গে সমপরিমাণ জল মিশিয়ে তাতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও পেপসিন (যকৃতের ওজনের 0.5%) যোগ করা। তাপমাত্রা 43-49°C-এ বজায় রাখা হয় এবং p^H 1.2-1.5-এ এনে নিষ্কাশন শুরু করা হয়। পরে সোডিয়াম কার্বনেট যোগ করে p^H 9.0-তে তোলা হয়। তাপমাত্রা ধীরে ধীরে 80°C-এ উঠিয়ে আরও এক ঘণ্টা ভাপানো চলে। তখন তেল ভেসে ওঠে এবং সেই তেল তুলে, ছেঁকে জমিয়ে রাখা হয়।

উপরে যে কোনও এক পদ্ধতিতে যে অপরিশোধিত তেল পাওয়া যায় তাকে প্রথমে কয়েকদিন থিতোতে দেওয়া হয়। জল আর মাংসের কুচি তলায় পড়ে গেলে পরিষ্কার তেল উপর থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়। তেল যদি ভেষজ ব্যবহারের জন্য দরকার হয় তবে তা আবার ছাঁকতে হয়। সেন্ট্রিফিউগাল যন্ত্রে ঘোরাতে হয় কিংবা ফুলারস আর্থ (Fuller's earth) দিয়ে শোধন করতে হয়। তা থেকে যে তেল পাওয়া যায় তাতে তখনও স্টিয়ারিন থাকে; তেল ঠাণ্ডায় (0-10°C) জমিয়ে রাখলে সেই স্টিয়ারিনের তলানি পড়ে। ঠাণ্ডা ঘরে বিশুদ্ধ তেল ছেঁকে নেওয়া হয়।

ভারতে যকৃৎ তেলের শিল্প

যকৃৎ তেলের শিল্পে যে সব হাঙর গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হল: গ্যালেওসের্ডো টাইগ্রিনাস (Galeocerdo tigrinus), ক্যার্কারাইনাস মেলানপটেরাস (Carcharhinus melanopterus), গ্যাঞ্জেটিকাস (C. gangeticus), লিম্বেটাস (C. limbatus), মেনিসোরা (C. menisorrah), স্ফিরনা ব্লকাই (Sphyrna blochi), স্কোলিওডন প্যালাসোরা (Scoliodon palasorrah)। ওয়ালবিমি (S. walbeehmi); আর গুরুত্বপূর্ণ রে-রা হল প্রিস্টিস কাস্পিডেটাস (Pristis cuspidatus) ও প্রিস্টিস মাইক্রোডন (Pristis microdon)।

কেরালা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে রাজ্য সরকারগুলির মৎস্য বিভাগ হাঙরের যকৃৎ-তেল বের করে বিক্রি করে থাকে। অশোধিত তেল শোধন করে তার সঙ্গে গন্ধমুক্ত বাদাম তেল মিশিয়ে ভিটামিন এ-কে প্রয়োজনীয় মাত্রায় আনা হয় এবং কৃত্রিম ভিটামিন ডি যোগ করা হয়। বার্ষিক উৎপাদন প্রায় 70,000 গ্যালন। হাঙরের যকৃৎ তেল রফতানি হয় না, দেশের বাজারেই বিক্রি হয়। এ তেল নানা বাণিজ্যিক নামে পরিচিত যেমন শার্কো-ভিট (Sharko-Vit), ইল্যাজমিন লিকুইড (Elasmin liquid), ইল্যাজমিন পার্ল এম জি বি (Elasmin pearl MGB), স্টেফিট (Stayfit), অ্যাডামিন (Adamin), ইত্যাদি।

দেহের তেল

সার্ডিন, হেরিং আর স্যামনের মতো তেল বা চর্বিওয়ালা মাছই এই তেল নিষ্কাশনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। মাছ-চারা (fish-meal) উৎপাদনের সময়েই দেহের তেল বের করা হয়। মাছগুলোকে পিষে মণ্ড করে ভাপে সেদ্ধ করা হয়। সেদ্ধ মাছ নিংড়ে তেল আর নিংড়ানো জলের (stick water) মিশ্রণকে হয় ট্যাংকে থিতোতে দেওয়া হয় কিংবা সেন্ট্রিফিউগাল যন্ত্রের সাহায্যে তেল আলাদা করে নেওয়া হয়। ছিবড়েটাকে শুকিয়ে গুঁড়ো করে নাম দেওয়া হয় মাছ-চারা।

মাছের বাজারে মাছ কেটে যে 'ছাঁট' বেরোয়—যেমন, লেজ, পাখনা, কাঁটা ইত্যাদি—তা থেকেও তেল বের করা হয়। যকৃৎ বের করে নেওয়ার পর আস্ত হাঙরও ব্যবহার করা হয়। সব কিছু পেষাই করে একটা পাত্রে রেখে অনবরত নাড়ানো হয় এবং পাত্রটাকে বাইরের থেকে বাষ্প দিয়ে গরম করে ভিতরের জিনিসটা সেদ্ধ করা হয়। তেল আলাদা

হয়ে গেলে তা নিংড়ে নেওয়া হয়। রাসায়নিক প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও দক্ষ নিষ্কাশনের জন্য আরও আধুনিক পদ্ধতিরও পরীক্ষা চলছে। তেল শোধনের জন্য হাইড্রোজেনেশন (hydrogenation) পদ্ধতি নেওয়া হয়। দেহের এই তেলের প্রধান উৎস ম্যাকেরেল আর অয়েল সার্ডিন; মালাবার উপকূলেই এ শিল্প প্রধানত গড়ে উঠেছে।

রান্নার তেল, মার্জারিন, শুয়োরের চর্বির বদলি-পদার্থ, সাবান, রং ও বার্নিশ উৎপাদনে মাছের তেল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

অন্যান্য উপজাত দ্রব্য

তেল ছাড়াও অর্থনৈতিকভাবে মূল্যবান নানা উপজাত দ্রব্য আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল: মাছ-চারা, মাছ-ময়দা, মৎস্য-প্রোটিন, মাছ-শিরিস, আইজিংগ্লাস ও মাছের চামড়া।

মাছ-চারা

মাছের বাজারের ছাঁট দিয়ে, কিংবা তেল নিষ্কাশনের কারখানায় অথবা মাছের অতি-জোগানের সময় বাড়তি মাছ থেকে মাছ-চারা তৈরি হয়। মাছ-চারার গড়পড়তা উপাদান হল: 55-70% প্রোটিন, 2-15% চর্বি, 10-12% খনিজ পদার্থ, 6-12% জল, অল্প পরিমাণে লোহা, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস এবং সামান্য ভিটামিন এ, ডি, বি ও কে। অর্থাৎ একটি মূল্যবান খাদ্যবস্তু এই মাছ-চারা।

তেল বের করার যে সব পদ্ধতি আগে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর যে-কোনওটা দিয়েই মাছ-চারা তৈরি করা যায়। মাছ-চারা শুকোনো হয় রোদে বা আগুনের তাপে, তবে আরও সচরাচর বাষ্প দিয়ে গরম করা পিপেয়, আংশিক বায়ুশূন্য অবস্থায়—এতে আরও সরেস মাল পাওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট মাছ-চারা পশুপালনে ব্যবহৃত হয় দৈনিক খাদ্যের অংশ হিসাবে, আর নিচু মানের মাছ-চারা সার হিসাবে কাজে লাগে কফি, চা আর তামাক চাষে। হিসাব মতো ভারতে বার্ষিক 1·5 লক্ষ মন মাছ-চারা তৈরি হয়। উৎপাদনের প্রধান এলাকা হল পশ্চিম উপকূলে কারওয়ার আর কন্যাকুমারীর মাঝখানে।

মাছ-ময়দা

মাছ-চারার এই উৎকৃষ্ট মিহি জাতটা মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এটা তৈরি হয় দ্রাবক নিষ্কাশন (Solvent extraction) পদ্ধতিতে। এর প্রধান কাজ বাড়তি প্রোটিনের জোগান দেওয়া। গম বা ভুট্টার আটার সঙ্গে এটা মিশিয়ে নেওয়া যায়। বিস্কুট, কেক, মিঠাই, সুপ ও খিচুড়ি-লপসিতে পুষ্টিবর্ধক উপাদান হিসাবে এর ব্যবহার আছে। সঠিক অনুপাত মোটে 10%-এর কাছাকাছি।

মৎস্য-প্রোটিন

হালকা কস্টিক সোডা দ্রবণের সাহায্যে চর্বি বের করে নিয়ে শুদ্ধতম অবস্থায় প্রোটিন নিষ্কাশন করা হয়। পদার্থটি প্রশমিত (neutralised) করার পর স্প্রে করে শুকোনো হয়। যে মিহি গুঁড়ো পাওয়া যায় তার রং সাদা, তাতে থাকে 80-90% দ্রাব্য প্রোটিন এবং তা আঁশটে গন্ধ থেকে মুক্ত। কেক তৈরিতে ডিমের শ্বেতাংশের বিকল্প হিসাবে এবং আইস-ক্রিম উৎপাদনে শোধিত মৎস্য-প্রোটিন ব্যবহার করা চলে। তা কোনও কোনও ওষুধের মূল্যবান উপাদান।

মাছ-শিরিস

মাছ-শিরিস তৈরি হয় চামড়া, পাখনা আর কাঁটা থেকে। কাঁচামালটাকে ধুয়ে পিষে বাষ্পতপ্ত আধারে খানিকটা অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সঙ্গে 6-10 ঘণ্টা সেদ্ধ করা হয়। তরল অংশটাকে তারপর আলাদা করে ঘন করা হয়। বই-বাঁধাই, লেবেল-লাগানো, কাগজের বাক্স তৈরি এবং আসবাব বানানোতে মাছ-শিরিস কাজে লাগে।

আইজিংগ্লাস

আইজিংগ্লাস হল এক রকম উচ্চমানের কোলাজেন। তৈরি হয় কোনও কোনও জাতের মাছের—বিশেষত ক্যাটফিশ, পার্চ, সায়িনিড ও পলিনেমিড মাছের—বায়ুস্থলী থেকে। বায়ুস্থলীগুলো ধুয়ে রক্ত ইত্যাদি পরিষ্কার করে ফেলা হয় এবং তারপর তুলে ফেলা হয় তাদের উপরের আস্তরণ। ভিতরের আস্তরণটাই শুকিয়ে বিক্রি করা হয় আইজিংগ্লাস হিসাবে। সুরা, বিয়ার ও ভিনিগার শোধনে এবং প্লাস্টার ও নানা বিশেষ সিমেন্ট তৈরিতে তা কাজে লাগে।

মাছের চামড়া

হাঙর ও রে-র মতো বড় জাতের মাছের চামড়া পাকা (tan) করে শৌখিন চামড়া হিসাবে বিক্রি করা হয়। পাকা করার যে পদ্ধতি বিদেশে ব্যবহৃত হয় তা এই রকম: চামড়াটাকে মাংসপেশি থেকে আলাদা করে একদিন নুনজলে ডুবিয়ে রাখা হয়, তারপর তা তুলে তা থেকে সব নুলজল ঝরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর আবার তা ডোবানো হয় 10% হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মেশানো নুনজলে। আবার তা ঝরিয়ে নিয়ে চামড়া থেকে সব আঁশ ইত্যাদি ঘষে তুলে ফেলা হয়। তারপর তাতে চুন মাখিয়ে অন্য চামড়ার মতোই পাকা করা হয়।

এই রকমের পাকা-করা মাছের চামড়া দিয়ে জুতো, হাতব্যাগ, মানিব্যাগ, তামাকের থলে ও গয়নার বাক্স বানানো যায়। হাঙরের চামড়া কোমল ও নমনীয়, তা ছাড়া তাতে থাকে এক বিশেষ ধরনের বুটি, ফলে জিনিসপত্রের উপযোগিতা ও সৌন্দর্য দুই-ই বাড়ে।

বারো

আজকের মৎস্যশিল্প—বৃদ্ধি, প্রসার ও বাণিজ্য

ঐতিহাসিক পটভূমি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ অর্থাৎ 1945 পর্যন্ত ভারতে মাছ ধরা চলছিল উপকূলরেখার সীমিত পরিসরে, দেশি নৌকো আর সরঞ্জাম দিয়ে, সাবেকি কায়দায়। স্থানীয়ভাবেই বিক্রি হতো ধরা মাছের বেশিরভাগ। একটা ক্ষুদ্র অংশ শুকিয়ে বা নুনে জারিয়ে রফতানি হত আশেপাশের দেশগুলোতে। জেলেরা জীবনধারণ করত কোনও রকমে।

1946 থেকে গভীর ও অগভীর সমুদ্রের জরিপ শুরু হয়। বোম্বাইতে গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকারের একটি পরীক্ষামূলক ঘাঁটি এবং তারপর উপকূলবর্তী কোনও কোনও রাজ্য, সমুদ্রে মৎস্য শিকারের নতুন ক্ষেত্র খুঁজতে থাকে। এইসব অনুসন্ধানের ফলে ধরা মাছের পরিমাণ বাড়ল, ব্যবসারও আস্তে আস্তে উন্নতি হতে লাগল। রফতানির জন্য উদ্বৃত্ত মাছ হিমায়িত ও কৌটোবন্দি করার পরীক্ষানিরীক্ষা হয় 1950 নাগাদ—এটাই আন্তর্জাতিক মৎস্য ব্যবসায়ের সূচনা।

গত 35 বছরে একটানা বৃদ্ধি ও প্রসারের দৌলতে দুনিয়ার মৎস্য ব্যবসায়ে ভারত এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। ভারতের সাধারণ মাছ সংক্রান্ত অষ্টম অধ্যায়ে যে সব সামুদ্রিক মাছের বর্ণনা করা হয়েছে, মৎস্যশিল্পে তাদের বেশিরভাগেরই অবদান বিপুল। এরা ছাড়া আরও দুটি সামুদ্রিক প্রাণীর গোষ্ঠীও আমাদের সম্পদের মধ্যে পড়ে। প্রথমটি হল সন্ধিপদ (Arthropoda) নামক অমেরুদণ্ডী পর্বের অন্তর্গত কবচী (Crustacean) শ্রেণীভুক্ত কাঁকড়া, গলদা-চিংড়ি, চিংড়ি ও কুচো-চিংড়ি। লক্ষ করা যেতে পারে, পরিমাণ ও বিদেশি মুদ্রা আহরণের দিক থেকে রফতানি বাণিজ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে চিংড়ি আর কুচো চিংড়ি। দ্বিতীয় গোষ্ঠীতে রয়েছে শামুক, ঝিনুক, স্কুইড, কাটলফিশ ইত্যাদি কম্বোজ পর্বভুক্ত প্রাণীরা। প্রাণিতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগের দিক থেকে গোষ্ঠী দুটি মাছ নয় বটে, তবে সামুদ্রিক পণ্য ও তাদের রফতানির বিবরণে সুবিধার খাতিরে এদের মাছের কাতারেই ফেলা হয়।

পরীক্ষামূলক পর্যায়

ভারতের মতো বিশাল দেশে মৎস্য সম্পদের বিভিন্ন দিকের রক্ষণাবেক্ষণ কীভাবে চলছে? আমাদের মাছ ধরার যান ও সরঞ্জামের সমীক্ষা (নবম অধ্যায়) থেকে বেরিয়ে আসে প্রাচীন ইতিহাসের একটি ছবি। তামিলনাড়ুর ক্যাটাম্যারান নামের আদিম ভেলা থেকে শুরু করে সৌরাষ্ট্রের 'মাচওয়া' নামের তক্তা-জোড়া নৌকো পর্যন্ত সবই আমাদের দেশের জেলেদের

ব্যবহৃত ও স্থানীয়ভাবে তৈরি হাল-পাল-বিহীন জলযান। জালও খুবই সরল সরঞ্জাম ; তুলো, নারকেলের ছোবড়া বা অন্য কোনও স্থানীয় গাছের আঁশ দিয়ে তৈরি। এ সব নৌকো, জাল দুইয়েরই মাছ-ধরার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, খুব গভীরে বা দূরে ব্যবহারযোগ্য নয় এগুলো।

1950 থেকে শুরু হল ভারতীয় মৎস্যশিল্পের আধুনিকীকরণ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার পর্যায়—এল যন্ত্রচালিত নৌকো ও ট্রলার এবং ফাঁস-বেড়াজালের মতো আরও দক্ষ জাল ; আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে চিহ্নিত হল মাছ ধরার নতুন নতুন জায়গা। 1970-এর অভিযান থেকে মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক খাদ্যের একটা মোটামুটি হিসাব মিলল—12-15 মিলিয়ন টন—যদিও অনেক মৎস্যবিদদের মতে এ হিসাব আসলের চেয়ে কম। সমুদ্রের বিপুল সম্পদের আরও সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ভারতের মৎস্যশিল্প সমীক্ষা (Fisheries Survey of India) একটি দশ বৎসরব্যাপী (1971-80) সমীক্ষার আয়োজন করেছিল। সমীক্ষা শুরু হয়েছিল উপমহাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে তুতিকোরিনের অদূরে মান্নার উপসাগর থেকে। সংগৃহীত তথ্য মৎস্য ব্যবসায়ক্ষেত্রে সরবরাহ করা হয়েছিল।

জনসংখ্যা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মাছের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে সত্তর দশকের গোড়ার দিকে আরও গভীর ও সুশৃঙ্খল সমীক্ষা অপরিহার্য হয়ে পড়ল। নিয়োগ করা হল 17·5 মিটার লম্বা ট্রলারের একটি বহর। মান্নার উপসাগরে 75 মি গভীরতা পর্যন্ত নানা মৎস্য-শিকারক্ষেত্র পরীক্ষা করে দেখতে লাগল ওগুলো। এই ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে 'মীন সওদাগর' এবং 'মীন নির্যন্তক' ট্রলার দুটির নাম উল্লেখযোগ্য। মৎস্যশিল্প সমীক্ষায় লক্ষ্য ছিল ভারতের সারা উপকূল জুড়েই অনুসন্ধান চালানো—তাই 1972 সালে নামল আধুনিক ভারতের বৃহত্তম ও উন্নততম ট্রলার 'মৎস্য নিরীক্ষণী'। এতে আছে একো সাউন্ডার (echo-sounder), সোনার স্ক্যনার (sonar scanner) এবং ইলেকট্রনিক লেংথ-ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালাইজার (electronic length frequency analyser)। সমুদ্রের 500 মিটার গভীরতা পর্যন্ত এর নাগাল। নানা মৎস্য-শিকারক্ষেত্র এবং গভীর জলের নানা মাছ সম্বন্ধে খবরাখবর জোগাড় হয়েছে এর দ্বারা। ট্রলারের ব্যবসায়ী মালিকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই খবর। ফলে আমাদের মৎস্যশিল্পে এসেছে নতুন উদ্দীপনা।

1972-73 থেকে ভারতের সামুদ্রিক খাদ্য শিল্প (Indian Sea-Food Industry) সাফল্যের সঙ্গে উঠে এসেছে বিশ্বের সপ্তম স্থানে। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী আমাদের সমুদ্রজল থেকে মোট বার্ষিক সংগ্রহের পরিমাণ 92,000 টন, তা থেকে বিদেশি মুদ্রা পাওয়া যায় প্রায় 373 কোটি টাকার।

বর্তমান অবস্থা

একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী বছর দশেক আগে ভারতে ছিল 20,000-এর বেশি যান্ত্রিক জলযান, 1,40,000 দেশি নৌকো, আর তার দীর্ঘ উপকূলে মাছ নামানোর সুযোগসুবিধাসহ 1800 অবতরণ স্থান। এই সব সুযোগসুবিধার মধ্যে বলা হয়েছিল, পোতাশ্রয়, মাল-নামানো, নৌকো সাজানো ও নৌকো বাঁধার ঘাট, নৌকো মেরামতের জায়গা, প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ও জলের সরবরাহ, মাছ সংরক্ষণের জন্য হিমঘর, এমনকি নিকটবর্তী শহর ও রেলস্টেশন

অবধি রাস্তা। ভারতীয় মৎস্যশিল্পে তখন 40 লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল—জেলেরা ও তাদের পরিবার, প্রকৌশলী, নানা মৎস্য-প্রক্রিয়া-ব্যবসায়ী, মৎস্যতত্ত্ববিদ ও রফতানিকারীরা। এখন সে সংখ্যা বরং বেড়েছে।

প্রধানত যে সব দেশে ভারত মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক খাদ্য রফতানি করে সেগুলো হল: অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্স, হংকং, ইটালি, জাপান, কুয়েইত, মরিশাস, নেদারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ভেঙে যাওয়া যুগোস্লাভিয়া, জাম্বিয়া, শ্রীলঙ্কা, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। তবে প্রধান বাজার জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপ।

ভারতের সব কটি উপকূলবর্তী রাজ্য মৎস্য ব্যবসায়ে নিয়োজিত, রফতানিকারী গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলির তালিকা থেকেই তা বোঝা যায়— পোরবন্দর, ভেরাভাল (গুজরাত); বম্বে, রত্নগিরি (মহারাষ্ট্র); গোয়া, ম্যাঙ্গালোর (কর্নাটক); কালিকট, কোচিন (কেরালা); তুতিকোরিন, নাগপতনম, কুড্ডালোর, মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু); কাকিনাড়া, বিশাখাপতনম (অন্ধ্র); কলকাতা, পরাদীপ (পশ্চিমবঙ্গ) এবং পোর্ট ব্লেয়ার (আন্দামান)।

মাছের বাজারের প্রসার, উৎপাদন ও রফতানির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারকে সম্মুখীন হতে হল নানা সমস্যার—বিভিন্ন সম্পদ ও সেগুলোর গুণমান, মাছ ও মাছের ব্যবসা বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা, সামুদ্রিক খাদ্য শিল্পের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি। মৎস্যশিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রের নানা দিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের জন্য সরকার কত রকমের সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন তা নীচের তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে:

1. সেন্ট্রাল মেরিন ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (কোচিন, কেরালা) সামুদ্রিক মাছ ও মৎস্যশিল্পের সর্ব বিষয়ে গবেষণা চালায়।

2. ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ব্যারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গবেষণা করে নদী, মোহনা ও হ্রদের মাছ ও মৎস্যশিল্প নিয়ে।

3. ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফিশারিজ টেকনোলজি (কোচিন, কেরালা) গবেষণা করে আদর্শ জলযান এবং শিকার-পরবর্তী প্রযুক্তি বিষয়ে।

4. ইনস্টিটিউট অব নটিকাল এঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেনিং (কোচিন, কেরালা) মাছ ধরার যান ও উপকরণ চালনায় প্রশিক্ষণ দেয়।

5. ইন্টিগ্রেটেড ফিশারিজ প্রজেক্ট অব ইন্ডিয়া (বোম্বাই, মহারাষ্ট্র) তার উদ্যম নিবদ্ধ করেছে মাছ, মাছের জীববিদ্যা এবং মৎস্য শিকারক্ষেত্রের অনুসন্ধানে।

6. ইনস্টিটিউট অব ফিশারিজ এডুকেশন (বোম্বাই, মহারাষ্ট্র) গঠিত হয়েছে মৎস্য সম্পদ, মৎস্য-শিকারক্ষেত্র, যান ও সরঞ্জাম, নৌকো ট্রলার ও উপকরণের আধুনিকীকরণ—মৎস্যশিল্পের ইত্যাকার সকল বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষণ ও গবেষণার জন্য।

7. মেরিন প্রডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (কোচিন, কেরালা) হল সামুদ্রিক খাদ্যশিল্পের রপ্তানি সংক্রান্ত সকল বিষয়ের সার্বিক বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

8. এক্সপোর্ট ইনস্পেকশন এজেন্সি (কোচিন, কেরালা), রপ্তানি কেন্দ্রগুলিতে মালের গুণ, স্বাস্থ্যকরতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে এবং কারখানা ও কৌটোবন্দি মালের তদারকি করে।

9. ফিশারি সার্ভে অব ইন্ডিয়া (এক্সপ্লোরেটরি ফিশারিজ প্রজেক্ট) [বোম্বাই, মহারাষ্ট্র] সমুদ্রের সুব্যবস্থিত সদ্ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় তালিম ও মূল্যবান খবরাখবরের জোগান দেয়।

উপরের সংস্থাগুলি বাদেও ভারতের নানা রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মৎস্য-জীববিদ্যা এবং মৎস্যশিল্প বিষয়ে পাঠক্রম চালু করা হয়েছে। বিশারদরা ডক্টরেট পর্যায়ে গবেষণা করছেন মাছের শ্রেণীবিভাগ, শারীরস্থান, শারীরবৃত্তি, ভ্রূণতত্ত্ব, হর্মোনতত্ত্ব, সামুদ্রিক ও অন্তর্দেশীয় মৎস্যশিল্প, বারিতত্ত্ব, জল-দূষণ ইত্যাদি নিয়ে।

ভারতের প্রাণিতাত্ত্বিক সমীক্ষার (Zoological Survey of India) অবদানের উল্লেখ করতে হয়। এই সংস্থা কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে নানা প্রজাতির ভারতীয় মাছের একটি নির্দেশক প্রতিভূ-সংগ্রহ রেখেছে এবং হিমালয়ের ঝরনাধারা থেকে গভীর সমুদ্র পর্যন্ত সব জায়গার মাছের শ্রেণীবিভাগ ও ব্যাপ্তি নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে।

সমুদ্রের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে ভারত কীভাবে তার মৎস্যশিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়েছে, আগের পৃষ্ঠাগুলিতে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। গত চার দশকে এই শিল্প রফতানি বাণিজ্যে শীর্ষস্থানীয়দের দলে উঠে এসেছে। বিশ্বের সামুদ্রিক খাদ্য বাণিজ্যে চিংড়ি ও কুচো-চিংড়ি রফতানিতে ভারত রয়েছে প্রথম স্থানে, সামুদ্রিক মৎস্য-ব্যবসায়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে তার স্থান দ্বিতীয় এবং বিশ্বে সপ্তম। ষাটটিরও বেশি দেশ এখন ভারতের উপর নির্ভরশীল তার 200,000 বর্গ কিলোমিটার-ব্যাপী অপেক্ষাকৃত নির্মল ও দূষণমুক্ত সাগরজলের অঢেল সামুদ্রিক খাদ্যের জোগানের জন্য।

তা ছাড়া সমুদ্র খুলে দিয়েছে লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ। সবচেয়ে বড় কথা, হাজার হাজার জেলে ও জেলে-পরিবার মৎস্যশিল্পের দ্বারা উপকৃত হয়েছে—তাদের আয় বেড়েছে, উন্নতি হয়েছে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার। তাদের কল্যাণসাধন বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সংস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। প্রত্যেকটি সংস্থার পরিচালনায় রয়েছেন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত পেশাদার কর্মীরা, তাঁরা এই জটিল ও বহুমুখী শিল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন আরও উৎপাদনক্ষমতা, আরও উৎকর্ষের লক্ষ্যে।

তেরো

সমুদ্রের খুনে বা মানুষখেকোরা

আগের একটি অধ্যায়ে ভারতীয় সমুদ্রের প্রধান প্রধান হাঙর আর রে-দের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। জেলে, মাল্লা, স্নানার্থী সবাই এই জীবগুলোকে সাধারণভাবেই বিপজ্জনক শিকারি-স্বভাবের বলে মনে করেন—মানুষকে যারা নিজেদের তল্লাটে পেলেই আক্রমণ করে, হাত-পা-মাংস ছিঁড়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায়। হাঙর যে ভয়াবহ বিপদ ঘটাতে পারে তাকে পিটার ব্যাঞ্চলি সুকৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর Jaws বইয়ে, যা নিয়ে পরে ওই নামেই একটা বিখ্যাত ছায়াচিত্রও তৈরি হয়েছে।

হাঙর আর রে-রা স্বভাবে মাংসাশী, তারা শিকার করে মাছ, শামুক-ঝিনুকের মতো কম্বোজ (molluse) পর্বভুক্ত জীব, কাঁকড়া, চিংড়ি ইত্যাদি। সারা দুনিয়ার সমুদ্রে যে 250-300টি বিভিন্ন গণ দেখা যায় তাদের মধ্যে মোটে ডজন-দুয়েক জাতের হাঙর হল ওইসব আতঙ্ককর তথাকথিত 'মানুষখেকো' বা 'সাগরের খুনে'। এখানে তাদের মধ্যেকার সবচেয়ে পরিচিত পাঁচটির বর্ণনা দেওয়া হবে—হাতুড়ি-মাথা হাঙর, রাক্ষুসে নীল হাঙর, রাক্ষুসে সাদা হাঙর, বাঘা হাঙর ও ম্যাকো হাঙর।

হাতুড়ি-মাথা হাঙর (Hammer-head Shark)

এই হাঙর 3·6-4·5 মি লম্বা। রং মোটামুটি বাদামি-ধূসর, শুধু পিঠের দিকে একটু জলপাই রঙের ছোঁয়া আছে, পেটের দিকে ক্রমে ফিকে হয়ে এসেছে। বুকের পাখনাগুলো ছোট, প্রথম পিঠ-পাখনা বড়, লেজের পাখনা খুব বড় ও চোখে পড়ার মতো। মাথাটা দু পাশে চওড়া হয়ে হাতুড়ির আকার নেওয়াতে মাছটা দেখতে হয় বিদঘুটে ও ভয়ঙ্কর। দারুণ সাবলীল ও ক্ষিপ্র চলাফেরা। হাঙরদের মধ্যে একেই সবচেয়ে প্রাণচঞ্চল বলে ধরা হয়, চমৎকার খেলুড়ে মাছ। মহা পেটুক—চিংড়ি, কাঁকড়া, ঝিনুক, এমনকি হুলওয়ালা রে পর্যন্ত খেয়ে নেয়। এর যকৃতের তেল ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ। ভারত মহাসাগর ও অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায়।

রাক্ষুসে নীল হাঙর (Great Blue Shark)

দৈর্ঘ্যে 3-3·6 মি বা তারও বেশি। তাক লাগানোর মতো সুন্দর বর্ণোজ্জ্বল মাছ—দু পাশ ঝকঝকে নীল, তলাটা ধবধবে সাদা। ছিপছিপে শরীর, লম্বা বুকের পাখনা। এদের

ব্যাপ্তি বিশাল—সব নাতিশীতোষ্ণ, উষ্ণ ও কবোষ্ণমণ্ডলীয় সমুদ্রে এদের দেখা মেলে। খোলা জল পছন্দ করে, বড় ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায়। দেদার বংশবৃদ্ধির জন্য বিখ্যাত—এক-একবারে 28 থেকে 54টি বাচ্চা হয়। ক্যার্কারাইনিডি গোত্রভুক্ত।

রাক্ষুসে সাদা হাঙর (Great White Shark)

এটা বড় জাতের হাঙর। এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য জানা গেছে 11·5 মি, অবশ্য গড় দৈর্ঘ্য মোটে 3·6-3·9 মি। রং খুব কমই সাদা হয়—মোটামুটি মেটে-বাদামি বা সীসক-ধূসর, পিঠ প্রায় কালো, পেট ময়লা-সাদা। শক্তসমর্থ শরীর, বেঁটে মাথা, চোখা তুণ্ড। প্রত্যেক বুক-পাখনার গোড়ায় একটি বৈশিষ্ট্যসূচক কালো ছিট। ফুলকো-ছিদ্র স্পষ্ট-রকম লম্বা। হিংস্র, ক্ষিপ্র, পেটুক, মারমুখী ও বলশালী—উস্কানি ছাড়াও আক্রমণ করে বলে জানা আছে। স্বভাবে একাকী। সারা পৃথিবীর উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলীয় জলরাশিতে এরা ছড়িয়ে আছে। তীর থেকে দূরবর্তী গভীর সমুদ্রই পছন্দ করে, তবে কখনও-কখনও তীরের কাছেও চলে আসে। সব সময় খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়—এদের খাদ্য হল শুশুক, সিল, স্যামন, অন্য হাঙর আর কাছিম।

বাঘা হাঙর (Tiger Shark)

নামেই আন্দাজ হবে, এ হাঙর বাঘের মতো ডোরাকাটা। বাচ্চা অবস্থায় চামড়ায় কালো কালো ছোপ থাকে, বড় হলে সেগুলো জুড়ে চওড়া ডোরায় পরিণত হয়। বয়সের সঙ্গে আবার ডোরাগুলো ফিকে হয়ে আসে। পূর্ণবয়স্ক মাছের উপরটা ধূসর বা ধূসর-বাদামি, তলার দিকে ফিকে হয়ে এসেছে। 3·6-4·2 মি লম্বা হয়, কখনও কখনও এমনকি 30 মি। বেঁটে, ভোঁতা তুণ্ড, ছিপছিপে শরীর, মার্কামারা লম্বা লেজ, তার বিস্তৃত উপরাংশ।

এ মাছ প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিপাইন, ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, পশ্চিম ভারত ও অস্ট্রেলিয়ায়। ঝাঁক বেঁধে ঘোরে। এরা সবচেয়ে ভীতিকর হাঙরদের দলে পড়ে। মানুষকে, বিশেষত সমুদ্র স্নানার্থীদের, আক্রমণ ও হত্যা করার নজির আছে। এরাও দেদার বংশবৃদ্ধির জন্য বিখ্যাত, স্ত্রী-মাছের এক-এক মরসুমে 30-60টি বাচ্চা হয়।

ম্যাকো হাঙর (Mako Shark)

এই হাঙরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তার কোবাল্ট-নীল পিঠ আর ধবধবে সাদা পেট। ছিপছিপে গড়ন, চোখা তুণ্ড, সমপর্বী লেজের পাখনা এবং লম্বা ফুলকো-ছিদ্র। 1·8-3·6 মি বা কখনও কখনও তারও বেশি লম্বা হয়। প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ও অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এবং ভূমধ্যসাগরে এদের দেখা গেছে।

এই হাঙর মারমুখী, ক্ষিপ্রগতি এবং নির্ভীক যোদ্ধা। ম্যাকো হল উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বড় ছিপশিকারের মাছ, শিকারিদের প্রিয়। হুইল-সুতোয় সবচেয়ে ভারী অ্যাটলান্টিক ম্যাকো

(768 পাউন্ড) ধরার রেকর্ড 'দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি'র রচয়িতা বিখ্যাত লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের।

চলতি ইংরেজিতে ম্যাকোকে ব্লু পয়েন্টার, শার্পনোজড শার্ক, বোনিটো শার্ক এবং ম্যাকেরেল শার্কও বলে।

হাঙরের আক্রমণ ঠেকানোর উপায়

আদিকাল থেকেই মানুষ হাঙরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজছে। দ্বীপের অধিবাসী, জেলে, স্নানার্থী, নৌকো বা জাহাজের যাত্রী সবাইকেই হাঙরের কামড় খেতে হয়েছে। এই মাছগুলো তাদের ভারী ও শক্তিশালী দেহ এবং লেজের পাখনা দিয়ে নৌকো-জাহাজ আক্রমণ করে। উষ্ণমণ্ডলীয় দেশগুলো অধিবাসীরা শরীরে গাছগাছালি বা ফলের রস, আতর, নানা রকম তেল ও রাসায়নিক দ্রব্য মেখে হাঙর তাড়ানোর চেষ্টা করেছে। হাঙর খুবই গন্ধ-সচেতন, আন্দাজ করা হয়, এরা জলে কোটিভাগের এক ভাগ মানুষের রক্তের গন্ধও টের পায়।

একটা আধুনিক পদ্ধতি হল হাঙর-অধ্যুষিত সাগরে মানুষের স্নান বা নৌকো চালানোর জায়গা বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে এবং অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে মাছধরার জালের মতো তারের জালের দীর্ঘ বেড়া ব্যবহার করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা বেশ কার্যকর, তবে এর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বড় বেশি। আরেকটি পদ্ধতি হল বুদ্বুদের একটি দেওয়াল তৈরি করে দেওয়া। ফুটোওয়ালা পাইপ দিয়ে উচ্চ চাপে হাওয়া বের করে এই বুদ্বুদের বেড়া বানানো হয়। তবে এই পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রদ হয়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শত্রুর বোমা, মাইন বা টর্পেডোর আঘাতে অসংখ্য জাহাজ, প্লেন ও সাবমেরিন ঘায়েল ও ধ্বংস হচ্ছিল। সৈনিক, নাবিক ও প্লেনচালকেরা সমুদ্রে পড়ে শিকার হচ্ছিল হিংস্র হাঙরের। একটি কার্যকর হাঙর-বিতাড়কের (repellant) প্রয়োজন জরুরি হয়ে উঠেছিল।

প্রকৃতিজগতে অক্টোপাস, কাটল ফিশ ও তাদের জ্ঞাতিদের মতো জীবেরা দেহের ভিতরের একটি বিশেষ থলি থেকে কালির মতো একটা তরল পদার্থ বের করে নিজেদের চারপাশে একটা ধোঁয়াটে মেঘের সৃষ্টি করে ও তার আড়ালে গা-ঢাকা দেয়। বিজ্ঞানীরাও খুঁজতে লাগলেন একইভাবে গা ঢাকা দেওয়ার উপযোগী রাসায়নিক পদার্থ। সমুদ্রের জলে অ্যামোনিয়াম সালফেট গুলে দিলে তাতে খানিকটা কাজ দেয়, কপার অ্যাসিটেট খুবই কার্যকর। অ্যাসিটিক অ্যাসিডে কপার সালফেট দিয়ে তলানি ফেলে কপার অ্যাসিটেট তৈরি হয়। একে কোনও রঙের সঙ্গে মিশিয়ে নিলে তাতে আরও সুবিধাজনক হাঙর-বিতাড়ক হতে পারে। বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন 'নাইগ্রোসিন' (Nigrosine) নামক রং—তার চারভাগের সঙ্গে একভাগ কপার অ্যাসিটেট মিশিয়ে সাবানের ডেলার আকার দিয়ে ব্যবসায়িক নাম দেওয়া হল 'শার্ক চেজার' (Shark Chaser) বা 'হাঙর-তাড়ানে'। যে সব যোদ্ধাকে সমুদ্রে বা তার আশেপাশে যেতে হত তাদের সাজসজ্জার অঙ্গ হিসাবে থাকত ওরই একটা ডেলা।

হাঙরের বিপদ অবশ্য আজও আছে। তাই যুক্তরাষ্ট্রে 1958 সালে অ্যামেরিকান ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিকাল সায়েন্সেজ-এর সঙ্গে যুক্ত শার্ক রিসার্চ প্যানেল স্থাপন করা হল। তার লক্ষ্য তিনটি—

(1) হাঙরের প্রকারভেদ, স্বভাব, আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করা ;

(2) হাঙরের সাম্প্রতিকতম আক্রমণগুলি নথিবদ্ধ করা ;

(3) হাঙর-বিতাড়নের নানা পদ্ধতি ও তাদের ফলাফল নিয়ে গবেষণা করা।

ফরাসি আবিষ্কারক ও প্রকৃতিবিদ কোয়াস্তো*র কথায় উপসংহার টেনে বলা যায় : 'একটা হাঙরের প্রতিক্রিয়া যে কী হবে তা অনুমান করা অসম্ভব ; ওদের যত দেখা যায় ততই যেন কম জানা যায় আর ততই অবিশ্বাস করতে হয় ওদের।'

---

* Jacques and Coasteau, P., *The Sharks, the splendid Savage of the Sea, Cassell, London 1974.*

চোদ্দ

ঘরে মাছ পোষা

পাখির পরে মাছই সম্ভবত সবচেয়ে বর্ণময় প্রাণী। সুঠাম তাদের আকৃতি, দেহের গড়ন ও চালচলন। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তাদের ঠিক গাছ ও ফুলের মতো বাড়িতে বা বাড়ির আশেপাশে প্রতিপালন করার চিন্তা প্রথম চিনাদের মাথাতে খেলেছিল বলে বিশ্বাস। অ্যাকোয়ারিয়াম-প্রেমীদের মধ্যে যে হরেক রকমের গোল্ডফিশ এত জনপ্রিয় সেগুলো নাকি তারাই কার্প-জাতীয় মাছ থেকে উৎপাদন করেছিল। গোল্ডফিশরা কার্পদের আত্মীয়স্থানীয় ক্যারাসিয়স (Carassius) নামক মিঠে-জলের গণটিরই নানা প্রকারভেদ মাত্র।

বাড়িতে অ্যাকোয়ারিয়াম রাখা সারা পৃথিবীতেই একটা অতি জনপ্রিয় শখ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছেলেবুড়ো সবাইকেই এ শখ টানে, তাই সব বড় শহরেই এ নিয়ে বোলবোলাও ব্যবসা জমে উঠেছে। অ্যাকোয়ারিয়াম-প্রেমীদের নানা সমিতিও আছে, তাঁরা সেখানে মিলিত হয়ে শুধু ভাববিনিময় নয়, ডাকটিকিট-সংগ্রাহকদের মতো দুর্লভ মাছও বিনিময় করে থাকেন।

অ্যাকোয়ারিয়াম হতে পারে বসার-ঘরের টেবিলে রাখা একটি সাধারণ কাচের বয়েম, তাতে হয়তো একটিমাত্র গোল্ডফিশ, অথবা হতে পারে পুরোদস্তুর ধাতব কাঠামোর উপর তৈরি কাচের ঘর। হতে পারে বারান্দায় অথবা বড় অফিস বা সরকারি ভবনের অলিন্দে রাখা বড় ট্যাংক। মাছের সংখ্যাও হতে পারে এক বা একাধিক, এমনকি শতাধিক, তা নির্ভর করে ট্যাংক ও মাছের আকারের উপর।

অ্যাকোয়ারিয়াম সব সময়েই তৈরি অবস্থায় কেনা যায়। সতর্ক হলে তা বানিয়ে নেওয়া এবং মাছ জোগাড় করা খুব ব্যয়সাপেক্ষ না-ও হতে পারে। কাচ, অ্যাকোয়ারিয়াম, সিমেন্ট ইত্যাদি কাঁচামাল কিনে এনে সবই জুড়ে নেওয়া যায়। ছোট ছোট মাছ ধরে আনা যায় পুকুর বা ঝরনা থেকে। আরেকটু শৌখিন মাছ বাজার থেকে কিনে আনা যায় কয়েকটি টাকার বিনিময়ে।

অ্যাকোয়ারিয়ামের উদ্দেশ্য হল পোষা মাছদের স্বাভাবিক বাসস্থানের মত একটি বাসস্থান যথাসম্ভব জুগিয়ে দেওয়া। তা করতে গেলে কয়েকটা সহজ মূল নীতি মেনে চলতে হবে। সেগুলো হল: (1) ভৌত-রাসায়নিক শর্তাবলি; (2) জৈবিক শর্তাবলি; (3) আহার, পরিচ্ছন্নতা ও আপদবিপদ বিষয়ক।

ভৌত-রাসায়নিক শর্তাবলির মধ্যে যে কোনও জীবের প্রথম প্রয়োজন হল অক্সিজেন। অ্যাকোয়ারিয়ামের তাই পর্যাপ্ত অক্সিজেন জোগানোর ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মাছ কেবল জলে-গোলা অক্সিজেনেই শ্বাস নিতে পারে। ন্যূনতম প্রয়োজন হল প্রতি 6 বর্গ সেমি মাছের

জন্য জলের 50-75 বর্গ সেমি পরিমাণ উপরিতল ও 152-254 মিমি গভীরতা। অতিরিক্ত ভিড় যে কোনও মূল্যে এড়াতে হবে। দ্বিতীয় বিষয় হল আলো। মৃদু আলো দরকার, উত্তুরে আলো হলেই ভালো হয়; কড়া আলো একেবারে বাদ দিতে হবে। অ্যাকোয়ারিয়ামের গাছগাছালির সালোকসংশ্লেষের জন্যও আলো দরকার, ওই প্রক্রিয়ায় তারা বাতাস থেকে কার্বন ডায়ক্সাইড টেনে নিয়ে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। অ্যাকোয়ারিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণে তাপমাত্রাও গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গেছে, 75°F-এর কাছাকাছি তাপমাত্রাই সবচেয়ে উপযোগী। ঠাণ্ডা দেশে বা দারুণ শীতের সময় তাপ জোগানোর জন্য ভিতরে একটা বৈদ্যুতিক বালব রাখা বিধেয়।

মাছ অ্যাকোয়ারিয়ামে বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচতে পারে না। তারা সবচেয়ে ভাল বাড়ে অন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের সংস্রবে স্পষ্ট উপযুক্ত জৈবিক পরিবেশে।

স্বাভাবিক অবস্থায় মাছেরা বহুবিচিত্র জলচর প্রাণীর সঙ্গে সহাবস্থান করে। অ্যাকোয়ারিয়ামেও সতর্কতার সঙ্গে ছোট ছোট প্রাণী ঢোকানো উচিত। ড্যাফিনিয়া (Daphinia) ও সাইক্লোপস-এর (Cyclops) মতো কবচী জলমাছি (Crustacean water flea) ও কুচো-চিংড়ি বাঞ্ছনীয় কারণ তারা মাছেদের স্বাভাবিক ও পুষ্টিকর খাদ্য। ছোট শামুকও বিধেয়, কারণ এরা কাচের কিনারায় গজানো শ্যাওলা খেয়ে ধাঙড়ের কাজ করে দেয়।

গাছগাছালি অ্যাকোয়ারিয়ামের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সালোকসংশ্লেষ নামক বিশিষ্ট রাসায়নিক ক্ষমতার সাহায্যে দিনের বেলায় তারা মাছের নিশ্বাসের কার্বন ডায়ক্সাইডকে নিজেদের খাদ্যে রূপান্তরিত করে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। রাত্রিবেলায় অবশ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী দুইয়েরই শ্বাসের জন্য অক্সিজেন খরচ হয়। তাই মাছের জন্য পর্যাপ্ত অক্সিজেনের জোগান সুনিশ্চিত করতে গেলে গাছপালার অতিরিক্ত ভিড় এড়ানো উচিত। মোটামুটিভাবে অ্যাকোয়ারিয়ামের তলাটার প্রতি 26-52 বর্গ সেমি জায়গা পিছু একটা করে গাছ থাকলেই যথেষ্ট। গাছ বলতে 'এলোডেয়া' (Elodea) বা 'চ্যারা' (Chara) জাতীয় জলজ গুল্ম বা ছোট শাপলা কিংবা পুকুর-নদীর স্বাভাবিক ঝাঁঝি-দাম।

কতকগুলি প্রাকৃতিক বিঘ্নের বিরুদ্ধে সাবধানতা নিতে হবে। বিপজ্জনক পতঙ্গ ও তাদের শূক এড়িয়ে চলা উচিত, ওরা মাছকে আক্রমণ করতে পারে। হাইড্রা-র মতো ছোট সিলেন্টেরেট (coelenterate) প্রাণীও বাঞ্ছনীয় নয়—এরা দারুণ পেটুক এবং মাছেদের খাদ্য জলমাছি খেয়ে ফেলে। পরজীবী ও জীবাণুর প্রবেশও রোধ করা কর্তব্য, এরা নানা চর্মরোগ ঘটাতে পারে।

অ্যাকোয়ারিয়াম প্রস্তুত ও চালু করতে হয় কীভাবে

অ্যাকোয়ারিয়ামের সঠিক সাইজ বেছে নেওয়ার পর প্রথম কাজ হল তার তলায় বিছানোর বালি জোগাড় করা। সমুদ্র বা নদীর পাড় থেকে বালি নেওয়া যেতে পারে। বোম্বাই-মাদ্রাজের মতো জায়গায় অ্যাকোয়ারিয়ামের উপকরণের দোকানেই নানা রকমের বালি থাকে। বালি বার বার ধুয়ে সব ময়লা দূর করে একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার করে তুলতে হবে। ধোয়া বালি একটা অগভীর পাত্রে রেখে গরম করে নেওয়া ভাল, ভারতে তা রোদেও সেঁকে

নেওয়া চলে। এই দুই পদ্ধতির যে কোনও একটিতেই সব জীবাণু শেষ হয়ে যায়। বালি ঠাণ্ডা হলে তা অ্যাকোয়ারিয়ামের তলায় সমানভাবে 76 মিমি পুরু করে বিছিয়ে দিন। এই সব প্রস্তুতি যখন চলছে অন্য দিকে ততক্ষণে পুকুর বা নদী থেকে প্রয়োজনীয় জলজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করে ভালভাবে ধুয়ে এক বয়েম জলে ডুবিয়ে রাখা যেতে পারে।

অ্যাকোয়ারিয়ামটি একটা টেবিল বা অনুরূপ কিছুর উপর এমন জায়গায় রাখা উচিত যেখানে তা ঠিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ আলো পাবে। তারপর তার তিন-চতুর্থাংশ জলে ভর্তি করতে হবে। বৃষ্টির জল রাসায়নিক পদার্থ-মুক্ত হওয়ায় সেটাই ব্যবহার করা ভাল। তা না পাওয়া গেলে কলের জল তুলে কয়েকদিন রাখার পর ব্যবহার করা যায় (কয়েকদিন রাখা দরকার ক্লোরিন দূর করার জন্য)। এবার গাছগুলো নিয়ে বালিতে সযত্নে বসিয়ে দেওয়া যায়। কুচো-চিংড়ি, শামুক ও জলমাছির মতো ছোট প্রাণীও এবার ছেড়ে দেওয়া যায়।

সবচেয়ে ভাল ফল পেতে গেলে অ্যাকোয়ারিয়ামের তাপমাত্র 72°F বা ঘরের তাপমাত্রায় ধরে রাখা দরকার। শীতের দিনে জলের উপর একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বালিয়ে রাখাটা বেশ উপকারী।

অ্যাকোয়ারিয়াম এবার তৈরি। 10-15 দিন ওটাকে ওভাবেই রেখে দেওয়া ভাল—এই সময়ের মধ্যে গাছগুলোর শিকড় চারিয়ে যাওয়া উচিত, জলও থাকা চাই টলটলে। এগুলোই সুস্থিত অ্যাকোয়ারিয়ামের লক্ষণ। জল যদি ঘোলা হয়ে যায় কিংবা কিনারায় সবুজ ছোপ দেখা দেয়, তার অর্থ জল পরিষ্কার নয় এবং অবাঞ্ছিত জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। একশো ভাগ ভবিষ্যৎ তৃপ্তির স্বার্থে আবার কেঁচে গণ্ডুষ করাটাই ভাল।

তারপর আসে মাছ বাছাই। এটা পালকের শখের ব্যাপার। আনাড়ি অবস্থায় গ্যামবুসিয়া (Gambusia), বোটিয়া (Botia) বা নেমাচিলাস-এর (Nemachilus) মতো কিছু মজবুত জাত দিয়ে শুরু করে পরে গোল্ডফিশ, বেট্টা বা অ্যাঞ্জেল ফিশ-এর মতো শৌখিন মাছ পোষা যায়।

অ্যাকোয়ারিয়াম ও মাছের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যায়। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল খাওয়া। মাছকে বেশি না খাওয়ানোর নীতি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। বাড়তি খাবার স্বভাবতই পচবে এবং সুখী জীবগুলোর স্বাস্থ্যহানি ঘটাবে। দিনে দু-তিন বার খাবার দেওয়াই ভাল।

অনেকের ধারণা, অ্যাকোয়ারিয়ামের জল বুঝি অনবরত বদলাতে হয়। এ ধারণা ভুল। অ্যাকোয়ারিয়াম ঠিকমতো বসিয়ে ফেলার পর জল ঘোলা না হলে তা না বদলানোই উচিত। জল কমে গেলে বৃষ্টির জল বা ক্লোরিনমুক্ত কলের জল দিয়ে তা পূরণ করে দিলেই চলে।

সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ হল : অ্যাকোয়ারিয়ামটিকে যথাসম্ভব শান্তিতে থাকতে দিন। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরাবেন না, নাড়বেন না। □□

পরিশিষ্ট

মাছের নামকরণ বিষয়ে

এ বইয়ে সাধারণ ভারতীয় মাছেদের বেলায় Wealth of India সিরিজের মৎস্য-সংক্রান্ত অংশে দেওয়া নামকরণ অনুসরণ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব Day-র Fishes of India-তে দেওয়া নাম এবং স্থানীয় নামও দেওয়া হয়েছে। নামকরণের নিয়ম অনুযায়ী মাছের নামের (গণ ও প্রজাতি উভয়েরই) পরে দেওয়া হয়েছে সেই লেখকের নাম যিনি মাছটিকে প্রথম নথিভুক্ত বা বর্ণনা করেছিলেন কিংবা নাম দিয়েছিলেন।

সংক্ষিপ্ত সংকেতগুলি এই :

সংক্ষিপ্ত রূপ	সম্পূর্ণ রূপ
Linn	Linnaeus
Cuv and Val	Cuvier and Valencienne
Bl & Sch	Bloch and Schneider
Blkr	Bleeker
Val	Valencienne
Cuv	Cuvier
Lacep	Lacepede
Forsk	Forskal
M & H	Muller and Henle
V. Hass	Van Hassett

নির্ঘণ্ট

বই

Alcock, A., *A Naturalist in the Indian Seas,* John Murray, London, 1902.

Baini Prasad (Ed.), *The Wealth of India,* Vol IV, *Fish and Fisheries,* Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, 1962.

Berg, L. S., *Classification of Fishes, Both Recent and Fossil,* Edwards Bros., Michigan, U.S.A. 1947.

Brown, M. E. (Ed.), *Physiology of Fishes,* Vol. 1 & 2, Acad. Press, London & New York, 1957.

Budker, P., *The Life of Sharks,* Weidenfeld & Nicholson, London, 1971.

Coastean Jacques and Coqsteau, P., *The Sharks, the Cplended Savage of the Sea,* Tr. by P. Whikhead, Cassel, London, 1974.

Harmer, Herdmann, Bridge and Boulenger, Fishes and Ascidians, *Cambridge Natural History,* Vol 7, Macmillan, London, 1932.

Lanham, Url, *The Fishes,* Columbia University Press, New York, 1962.

Misra, K. S., "An Aid to the Classification of Fishes-1 Elasmobranchii and Holocephali", *Records of Indian museum,* Vol. XLIX, Calcutta, 1951.

Norman, J. R., *A History of Fishes,* Earnest Ben, London, 1947.

Richard Perry, *The Unknown Ocean,* David & Charles Ltd. U.K., 1972.

Romer, A. S., *Vertebrate Palaentology,* Universsity of Chicago Press, U.S.A., 1950.

Schultz, L. and E. M. Stem, *The Ways of Fishes,* Van Nostrand, New York, 1948.

Walter, H. E., *Biology of the Vertebrates,* Macmillan, New York, 1939.

Webster, David K., *Myths and Man Eaters, The Story of Shark,* Peter Davies, London, 1962.

সাময়িকী

Central Marine Fisheries Research Institute, *Bulletin 32 & 33,* Cochin, India, 1982.

Central Marine Fisheries Research Institute, Marine Information Service, *Technical & Extension Series,* Cochin, India, 1980-84.

The Marine Products Exports Development Authority, *Marine Product Export Review* 1982, Cochin, India, 1983.

নির্দেশিকা

Printed at Tarang Printers, Delhi